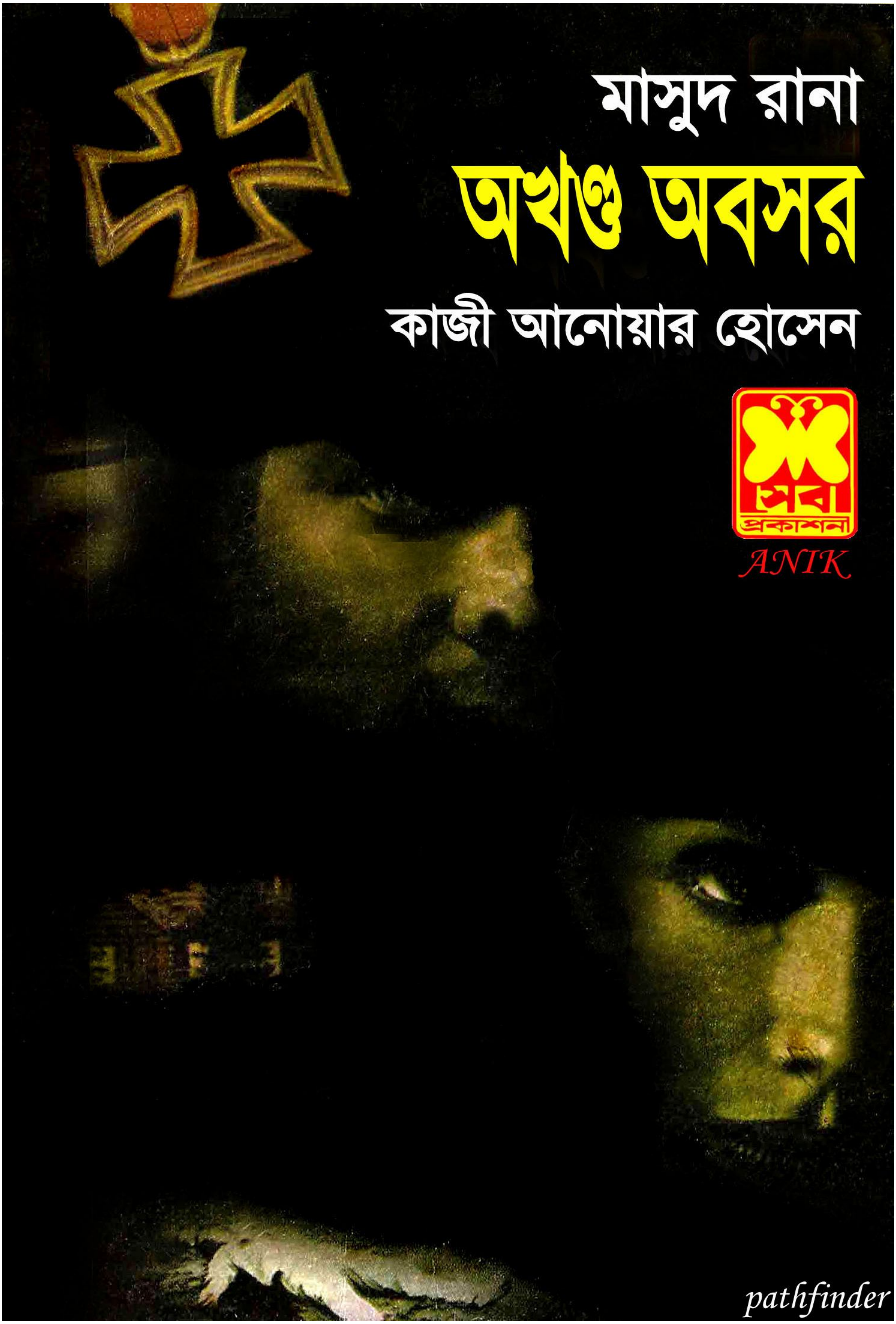
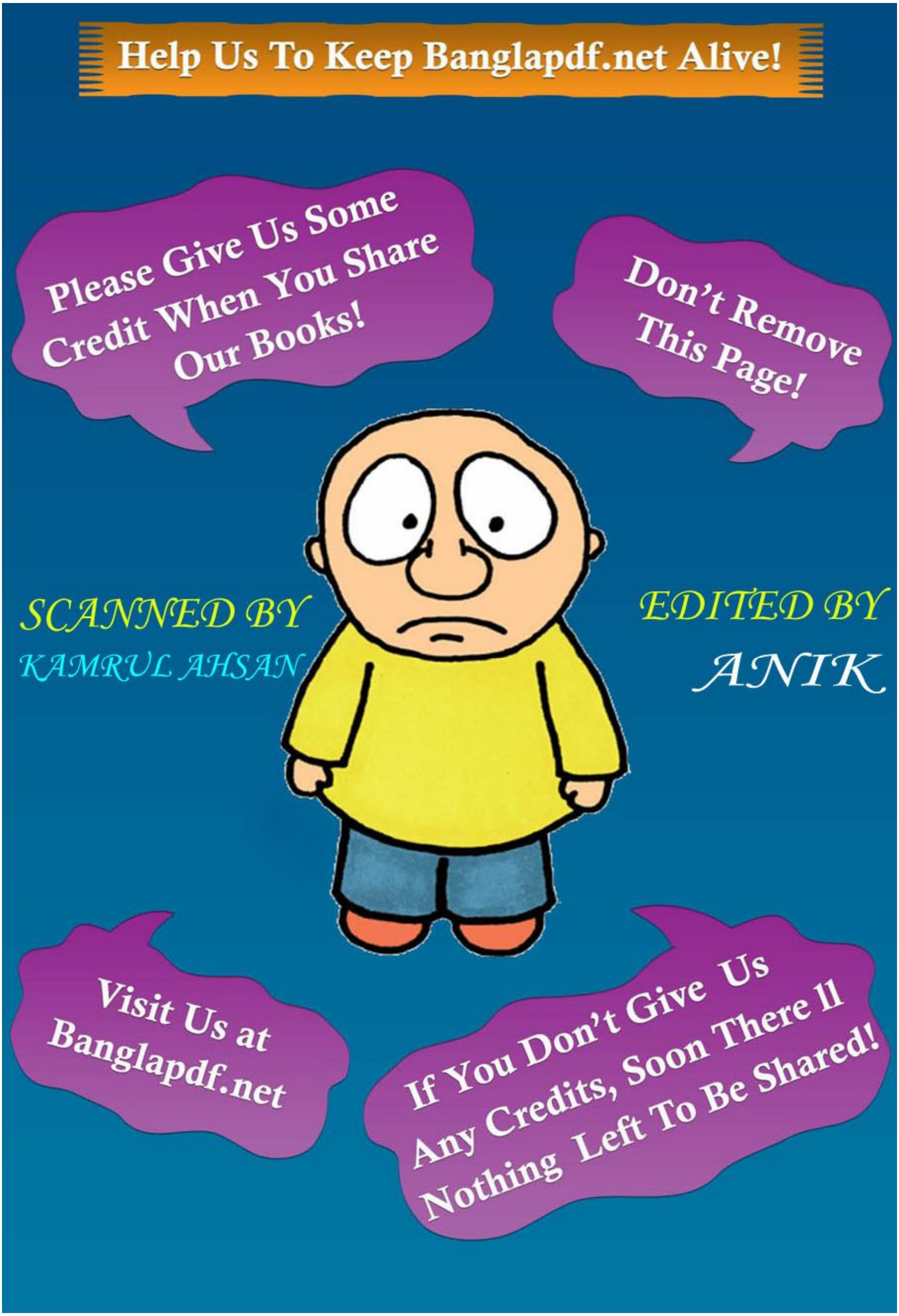

মাসুদ রানা
অখণ্ড অবসর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
pathfinder


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
KAMRUL AHSAN
EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

অখণ্ড অবসর

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সাবিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল *সর্পলতা*অমানুষ।

এক

জার্মানি। ১০ এপ্রিল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে প্রায়।

এয়ার রেইড সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে শেষরাতে কেঁপে উঠল প্রায়-অবরুদ্ধ, বিধ্বস্ত বার্লিন শহর। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল আতঙ্কিত নগরবাসী। বম্বারগুলো আসবার আগেই এয়ার রেইড শেল্টারে পৌঁছুতে হবে তাদের।

পনেরো মিনিট পর কাতর সুরে গোঙাতে গোঙাতে থামল ভুতুড়ে সাইরেন। নামল থমথমে নীরবতা। ততক্ষণে পেটভরা শতশত টন বোমা ফেলে শহর ছাড়িয়ে পশ্চিমে রওনা হয়ে গেছে অ্যালাইড বম্বারগুলো। দূরে মিলিয়ে গেল ওগুলোর ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। বাড়ি ফিরতে শুরু করল অসহায় সাধারণ মানুষ। জানে না, গিয়ে কী দেখবে।

সে-রাতের ভারী বোমা বর্ষণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলো লিখটারফেল্ড ডিসট্রিক্ট। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে রক্ষা পেল এসএস-এর অফিসগুলো।

সাইরেন থেমে যাবার পর এসএস ইকোনমিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেডকোয়ার্টার-এর পিছনের উঠানে এসে দাঁড়ালেন দু'জন উচ্চপদস্থ এসএস অফিসার, জেনারেল কার্ল শ্যুট ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ।

পেশীবহুল খাটো হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড়মোড়া

ভেঙে আড়ষ্ট শরীরের জড়তা ছাড়ালেন জেনারেল কার্ল শ্যুট। সারারাত অফিস করেছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ ও তিনি, শেষ করেছেন চূড়ান্ত মুহূর্তের সমস্ত প্রস্তুতি। বার্লিনে আজকেই তাঁদের শেষ দিন।

ভোরের হাওয়া বেশ শীতল মনে হলো তাঁদের কাছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও পড়ছে। সিগারেটের ধোঁয়া-ভরা অফিসের বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ও বৃষ্টি খারাপ লাগল না তাঁদের। শূন্যদৃষ্টিতে উঠানের দিকে তাকালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ, চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি। জেনারেল কার্ল শ্যুটের মতো আশাবাদী হতে পারছেন না, ভবিষ্যৎটা অন্ধকার মনে হচ্ছে তাঁর।

কিছুক্ষণ পর পাশে দাঁড়ানো জেনারেলের দিকে চেয়ে বিষণ্ন হাসলেন তিনি। গোটা জার্মানির সমস্ত অবকাঠামো হুড়মুড় করে ধসে পড়ছে, অথচ এই বোকা মানুষটা তা বুঝেও বুঝতে পারছেন না। যুদ্ধটা তাঁর কাছে যেন মজার কোনও পিকনিক। গোপনীয় কাগজ-পত্র পুড়িয়ে ছাই করবার সময় পাশের অফিস থেকে জেনারেল শ্যুটকে গুনগুন করে গান গাইতে শুনেছেন হাইনরিখ। ওই কাগজগুলো... হ্যাঁ, ওই টপ সিক্রেট কাগজগুলোর সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে হিটলারের প্রতি তাঁর আনুগত্যের তথ্য-প্রমাণ এবং গত বছরগুলোয় অর্জিত সমস্ত সম্মান।

চামড়ার কালো ওভারকোটের কলারটা উঁচু করলেন পল হাইনরিখ, কপালের আরও সামনে টেনে আনলেন ক্যাপের পিক। কম্পাউন্ডের পিছনে গ্যারাজ এরিয়ার দিকে চোখ চলে গেল তাঁর। জেনারেল শ্যুটকে ইশারা করে উঠান পার হতে শুরু করলেন দীর্ঘ পদক্ষেপে।

পদমর্যাদায় বড় বলে পল হাইনরিখের আগে থাকতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হলো জেনারেল কার্ল শ্যুটকে। ভিজা, চকচকে কোবলস্টোনের উঠানে ফাঁপা শোনাল তাঁর দ্রুত ছুটবার আওয়াজ।

গ্যারাজের খোলা দরজার দিকে চলেছেন তাঁরা। দরজার ওপাশে অপেক্ষা করে আছে দুটো ট্রাক। একটা আড়াই টনি, অন্যটা সাত টনি। ওগুলোর ইঞ্জিন ক্যাবের পিছনের অংশ ঢাকা রয়েছে তেরপল দিয়ে। সাধারণত ট্রুপ ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয় এগুলো, তবে আপাতত অন্য কাজে ব্যবহার করছেন তিন এসএস জেনারেল। আড়াই টনি ট্রাকটা নিয়ে যাবেন জেনারেল কার্ল শ্যুট। সাত টনিটার দায়িত্ব বর্তেছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের উপর।

বড় ট্রাকটা পল হাইনরিখ নিয়ে যাচ্ছেন বলে জেনারেল শ্যুট বেশ অসন্তুষ্ট। আরও একবার ভাবলেন তিনি, জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিং ভাল করেনি কাজটা।

গ্যারাজের দরজার কাছাকাছি গিয়ে জেনারেল শ্যুট বললেন, 'যখন মার্সিডিযের পেছনে চেপে বিজয়ীর বেশে প্যারিসের চওড়া রাস্তা ধরে ঢুকলাম, তখন কে ভাবতে পেরেছিল মাত্র কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে খোদ বার্লিন থেকে ট্রাক চালিয়ে পালাতে হবে, পল?' আফসোস করে মাথা নাড়লেন এসএস জেনারেল, তিক্ত হাসলেন। 'অবিশ্বাস্য, কি বলো?'

অবিশ্বাস্য, তবে শুধু চোখ বন্ধ করে রাখা কোনও নিরেট নির্বোধের জন্য, মনে মনে বললেন পল হাইনরিখ। দীর্ঘশ্বাস চেপে জেনারেল শ্যুটকে একবার দেখলেন তিনি।

গ্যারাজে ঢুকে পড়লেন দু'জন। ওভারকোটের উপরের ফ্ল্যাপ খুলে সিগারেট ও লাইটার বের করতে টিউনিকের ভিতরে হাত ভরলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাইনরিখ, সিগারেট বের করে ধরালেন। আরেকবার তাকালেন জেনারেল শ্যুটের দিকে। 'কোথায় যাচ্ছেন তা হলে, হের শ্যুট?'

'উত্তর-পশ্চিমে, সোজা কিয়েল-এ,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে

বললেন এসএস জেনারেল, 'ওখানে বন্ধুবান্ধব আছে আমার, দক্ষিণ-আমেরিকায় চলে যাবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদেই থাকব ওদের কাছে।' লেফটেন্যান্ট কর্নেলের চেহারায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজলেন জেনারেল। 'তুমি কোথায় যাবে ঠিক করেছ, পল?'

'জানি না এখনও,' মিথ্যে বললেন পল হাইনরিখ, 'তবে বাভ্যারিয়ার সীমান্তে কোনও একটা ভিলায় কয়েকদিন কাটাতে পারি।' পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে গেলেন না তিনি। সেটা ঠিক হবে না। ধরা পড়লে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মুখ খুলতে দেরি করবেন না জেনারেল শ্যুট।

ট্রাকে যা তোলা হয়েছে, সেগুলোর কারণে জেনারেল শ্যুটের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বটে, তবে সেটা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় মোটেই। লোকটা যত কম জানে, ততই মঙ্গল।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সাংগঠনিক বিভাগে গত তিনবছর একসঙ্গে কাজ করেছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ ও তিনি জেনারেল। যে-কারণে হাইনরিখ জানেন, ভয়ঙ্কর পরিণতির শিকার হতে হবে অ্যালাইড ফোর্সের হাতে ধরা পড়লে।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সঙ্গে জড়িত যে-কোনও অফিসারকে ধরতে পারলেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করা হবে। পরিণাম: গ্যাস চেম্বারে কষ্টদায়ক মৃত্যু, অথবা অন্ধকার কোনও জেল-কুঠুরিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

এসএস-এর অদূরদর্শী কিছু অফিসারের মতো এ ব্যাপারে কোনও অস্পষ্ট ধারণা নেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের।

বোকা কিছু অফিসার ভেবেছিল, পরবর্তী সত্যিকার যুদ্ধে, অর্থাৎ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বত সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি সহ আত্মসমর্পণ করলেই অ্যালাইড ফোর্সে ভিড়ে যেতে পারবে তারা। ভেবেছিল, শীঘ্রি আমেরিকান ও ব্রিটিশরা বুঝতে পারবে, যে-করে হোক ঠেকাতে হবে বলশেভিকদের।

স্বপ্ন। সব আকাশ-কুসুম কল্পনা, তিক্ত মনে ভাবলেন পল হাইনরিখ। বড় বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছিল দলত্যাগী ওই নির্বোধ এসএস অফিসারগুলো।

পল হাইনরিখ এখন নিশ্চিত, অন্যান্য এসএস অফিসারের মতো যুদ্ধাপরাধী হিসাবে খোঁজা হচ্ছে তাঁকেও। আর মরণ-শিবিরের সত্যিকার ভয়াবহতা যখন প্রকাশ পাবে, পাগলা কুকুরকে যেভাবে বিন্দুমাত্র মায়া না দেখিয়ে খুন করা হয়, সেইভাবে খুন করা হবে এসএস অফিসারদের। অমানবিক নৃশংসতায় সরাসরি জড়িত না থাকলেও বোধহয় রক্ষা পাবে না কেউ। আর... তা হলে রক্ষা পাবেন না তিনিও।

জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিং গা ঢাকা দিয়েছেন আগেই। তার আগে বিশ্বাস করে নিজেদের যা কিছু, সব তুলে দিয়ে গেছেন তাঁর জিম্মায়।

এর পরপরই চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী রওনা হবার দিন-ক্ষণ ঠিক করেছেন তিনি ও জেনারেল কার্ল শ্যুট। রাশান আর্মির কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে সরে পড়তে চাইছেন তাঁরা। দু'জনই জানেন, ধরা যদি পড়তেই হয়, তা হলে আমেরিকান বা ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হওয়াই বরং অপেক্ষাকৃত ভাল। রাশানদের উপর যেরকম অত্যাচার করেছে জার্মান আর্মি, তারপর কোনও দয়ামায়া দেখাবে না বলশেভিকরা।

যুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান চিহ্নিত করা হালনাগাদ মানচিত্র দেখে কোন্ পথে যাবেন সেটা ঠিক করেছেন দুই জার্মান সেনা অফিসার।

ব্রিটিশ ট্রুপ এখনও হ্যামবার্গে পৌঁছায়নি, কাজেই কিয়েল-এ যেতে কোনও সমস্যায় পড়বার কথা নয় জেনারেল কার্ল শ্যুটের। এল্‌ব্‌-এর দিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে যাওয়া কয়েকটা আর্মার্ড কলামের কথা বাদ দিলে আমেরিকানরা রাইন নদী পেরোতে শুরু করেছে মাত্র ওদিকে রাশান আর্মি এখনও ওডার-এর তীরে ঘাঁটি

গেড়ে আছে। শত্রুভাবাপন্ন দুই আর্মির মাঝখানে খোলা রয়ে গেছে প্রায় একশো মাইল চওড়া একটা করিডর, কাজেই নিরাপদে দক্ষিণে চলে যেতে পারা উচিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখেরও।

দ্রুত বাড়ছে ভোরের আলো। দিকচক্রবালে ফুটে উঠছে ধূসর একটা বাঁকা রেখা।

হঠাৎ দূরে, পুব থেকে ভেসে আসা যান্ত্রিক বজ্রগর্জনের ভারী, চাপা গুমগুম আওয়াজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বৃষ্টিভেজা ভোরের থমথমে পরিবেশ। যেন সতর্ক করে দেবার জন্যই গর্জাচ্ছে কামানগুলো। ওডার-এর পশ্চিম তীরে জার্মান আর্মির অবস্থানের উপর প্রতিদিনের মতোই গোলা-বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে রাশান গোলন্দাজ বাহিনী।

এক সময়ের মহা পরাক্রমশালী জার্মান সেনাবাহিনী এখন উপযুক্ত দক্ষ সৈনিকের অভাবে ধুঁকছে, সেইসঙ্গে ভেঙে পড়েছে নিয়মশৃঙ্খলা—বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে মনোবলহীন সেনাদলগুলো। সত্যি যখন বার্লিনে সর্বাত্মক আক্রমণ শানাতে নদী পেরোবে রাশান সেনাবাহিনী, তখন আর বাধা দেবার কোনও উপায় থাকবে না জার্মানদের।

শিউরে উঠলেন পল হাইনরিখ। যতটা না শীতে, তার চেয়ে বেশি বার্লিন শহরের আসন্ন নিশ্চিত বিপর্যয়ের কথা ভেবে। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ফেলে দিলেন তিনি জমে থাকা বৃষ্টির পানির একটা অগভীর ডোবায়, জ্বলন্ত ছাই নিভে যেতে দেখলেন মুহূর্তে। যদি এই যুদ্ধ, এই কষ্টও শেষ হয়ে যেত ওরকম চট করে! দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পল হাইনরিখের বুক চিরে। ভাল করেই জানেন তিনি, যা কিছু মূল্যবান এখনও আছে, বিজয়ের পর মহা উল্লাসে সমস্তই গ্রাস করবে শত্রুপক্ষ, তাদের দেশের মানুষের প্রতি জার্মানরা যা করেছে, তার শতগুণ বেশি অত্যাচার করতে দ্বিধা করবে না অক্ষশক্তি। করে না কেউ।

মন দিয়ে কামানের গর্জন শুনলেন জেনারেল শ্যুট, তাকালেন পুব দিগন্তের দিকে, তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'শেষের শুরু হয়ে গেছে, পল। আর বড়জোর কয়েকটা দিন।' শক্ত মুঠিতে জুনিয়র অফিসারের হাতটা ধরলেন তিনি, মনের তিক্ততা চেপে মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'শহরটা জেগে ওঠার আগেই রওনা হয়ে যাওয়া উচিত আমাদের। হয়তো আবার কখনও দেখা হবে দু'জনের। কে জানে, ঈশ্বর কী রেখেছেন আমাদের ভাগ্যে?' আড়াই টনি ট্রাকের দরজা খুলে ক্যাবে উঠে পড়লেন জেনারেল। 'যাও, পল, প্রার্থনা করি, যেন নিরাপদেই সরে পড়তে পারো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

জেনারেল কার্ল শ্যুটকে ট্রাক চালিয়ে চলে যেতে দেখে কী যেন হারানোর ব্যথায় বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগল পল হাইনরিখের। হৃদয়ের শূন্য অনুভূতিটা জেনারেল শ্যুট চলে গেলেন বলে নয়; লাখো-কোটি পরাজিত, অপমানিত জার্মানের মতো তাঁর মনটাও জানে, যে-পিতৃভূমিকে যেভাবে তিনি দেখেছেন, যেভাবে চিনেছেন, চিরতরে হারিয়ে যাবে সে-পিতৃভূমি।

ক্ষণিকের জন্য চোখের সামনে যেন গেরহার্যকে দেখতে পেলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাইনরিখ। স্টালিনগ্রাদে গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল গেরহার্য। ...গেরহার্য ও তিনি বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন কারফুরস্টেনডেম-এ, তাঁদের ইউনিফর্ম ও মাথার ক্যাপে করোটির ইনসিগনিয়া বলে দিচ্ছে সবাইকে, তাঁরা জার্মান বাহিনীতে সবচেয়ে অভিজাত সেনানী।

জার্মানি ছিল তখন অপ্রতিরোধ্য, জার্মান্ সেনাবাহিনীতে এসএস অফিসাররা ছিল ভবিষ্যতের রূপকার—হাজারো বছর পৃথিবী শাসন করবে যে রাইখ, সে-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ...এরকমটা ভেবেছেন তাঁরা কতদিন হলো? চার... পাঁচ বছর? ঈশ্বর! মনে হয় যেন এক জনম আগের কথা সেটা। নিথর দাঁড়িয়ে

থাকলেন পল হাইনরিখ, পুব দিগন্তে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আলোকরশ্মির পটভূমিতে ঋজু, সুঠামদেহী এক হতাশ, পরাজিত সৈনিক।

কামানের গোলা-বর্ষণের ধারাবাহিকতায় ছন্দপতন ঘটতেই বাস্তবে ফিরলেন তিনি। শত্রুপক্ষের আর্টিলারি শেল ছুঁড়বার আওয়াজ বেড়েছে আরও, সেই সঙ্গে কমেছে শেল ফাটবার বিরতি।

ট্রাকের পিছনে চলে গেলেন পল হাইনরিখ, ক্যানভাসের ফ্ল্যাপগুলো বাঁধলেন শক্ত করে।

ঘড়ঘড় আওয়াজ করে কোবল পাথরের রাস্তা ধরে এগোল ভারী ট্রাক, এসএস হেডকোয়ার্টারের গেটের দিকে চলল। গেট পাশ কাটানোর সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে দেখে বুক টানটান করে স্যাল্যুট করল এসএস-এর দুই চৌকশ সেন্ট্রি।

অস্বস্তি নিয়ে ভাবলেন পল হাইনরিখ, সেন্ট্রিরা যদি জানত তিনি চলে যাবার পর খালি বিল্ডিং পাহারা দিতে রয়ে যাচ্ছে তারা, তা হলে কেমন লাগত ওদের?

কম্পাউন্ডের বাইরে চলে এসে বামে, বার্লিনের দিকে মোড় নিলেন তিনি।

সামান্য সময়ের জন্য একবার থামবেন, তারপর... শিকারীদের সঙ্গে শিকার করেছেন তিনি এতদিন, এবার তিনি নিজেই শিকার—নতুন ওই শিকারীদের কাছ থেকে পালাতে হবে এবার তাঁকেই।

দুই

হাসপাতালের বেডে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা ওই যুবকটি খুব চেনা—যদিও নামটা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। কিন্তু ওর উপর ঝুঁকে থাকা সাদা অ্যাপ্রন পরা রক্তশূন্য পিশাচের মতো দেখতে এই লোকটা কে?

আস্তে আস্তে ঘুম-ঘুম চোখ মেলল যুবক। মরা মাছের চোখের মতো অস্বচ্ছ দুটো হলদেটে মণির উপর স্থির হলো তার নেশাতুর ঝাপসা দৃষ্টি। ফ্যাকাসে সাদা রঙের লম্বা গলাটা বাঁকা করে সরু দু'ঠোঁটে টিটকারির হাসি নিয়ে তাকেই দেখছে লোকটা। নাকটা যেন একেবারে টিয়া পাখির বাঁকানো ঠোঁট। চেহারা দেখলে মনে হয়, মানুষ তো নয়, ঠিক যেন গলা-ছেলা একটা ধেড়ে শকুন!

হাতটা সামনে আনল শকুন। সোনালী তরল ভরা একটা সিরিঞ্জ নাড়ল এপাশ-ওপাশ। হাসিটা আরও চওড়া হলো শকুনের। 'বলো তো এম আর নাইন, এটা কী?' জবাবটা নিজেই দিল, 'প্রথম ডোজ পি-সেভেন ভিএম দিচ্ছি তোমাকে। এটাই ভাইটাল, তবে এর পরে আরও দেব ফাইনাল দুটো ডোজ। চিরজীবনের জন্যে চমৎকার একটা দর্শনীয় যোম্বি হয়ে যাবে তুমি। তবে তার আগে একটু গল্প করা হবে তোমার সঙ্গে। কাজ শেষ হয়ে গেলে তোমাকে তুলে দেব আমরা বাংলাদেশ সরকারের হাতে।'

কথা বলতে গিয়ে যেন ব্যাঙ ডাকল বন্দি যুবকের গলার

ভিতর থেকে। 'কী... ওটা?'

'ব্রেন-ওয়াশ সিরাম বলতে পারো,' আরও সামনে ঝুঁকল শকুন। 'প্রথম ডোজে ষাট ভাগ ভালমানুষ হয়ে যাবে তুমি। পাঁচ ঘণ্টা পর অ্যাকশন শুরু। তারপর কিছুদিন নড়তে চড়তে পারবে না। জিজ্ঞেস করলেই যা জানো সব বলবে গড়গড় করে, তবেই তো কাজ হচ্ছে কি না সেটা টের পাব আমরা! আগামী কয়েকদিন এই খোলামেলা চমৎকার ঘরটাই হবে তোমার দুনিয়া। ...অন্য কোনও বিষয়ে চিন্তা না করলেও চলবে তোমার, শুধু ফাইনাল ডোজের মজাটা চিন্তা করো, শরীরটা তরতাজা এক যুবকের, অথচ মাথাটা হয়ে গেছে একশো বিশ বছরের কোনও বুড়োর মতো স্থবির—দারুণ না? কী চমৎকার কনট্রাস্ট! তবে মানুষের ওপর প্রথম প্রয়োগ করা হচ্ছে তো, বলা যায় না ঠিক কী ঘটবে এমনও হতে পারে, তুমি হয়ে উঠবে ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী—এমনকী আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি দরদি। হাহ্! হাহ্! হাহ!'

...আরেকটা হাসপাতাল মনে হচ্ছে কেন এটাকে? আরও দু'জন যুবক শুয়ে আছে দুটো বেডে। আহত। মন বলছে, তাদের খুব ভাল করেই চেনে ও। পাশে এসে ওকে দেখছে কেন ওই গম্ভীর চেহারার বুড়োটা? গভীর মায়াভরা, অথচ তীক্ষ্ণ দুটো অন্তর্ভেদী চোখ দেখলে বুড়োকে কেমন যেন শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে! গলার আওয়াজটাও যেন মেঘের ডাক—গম্ভীর!

'কোনও কাজই করছে না অ্যান্টি-সিরাম?'

'সরি, মেজর জেনারেল।' ন্যাড়া-মাথা চড়ুই পাখির মতো পলকা লোকটার গলা ওরকম বজ্রপাতের মতো হলে তো মুশকিল! ব্যাটা কি চেঁচিয়ে কান ফাটানোর মতলবে আছে নাকি?

'রিকভারি রেট, ডক্টর সন্দীপক?'

'যিরো, সার। নাথিং! ...টোটাল রেস্ট নিডেড। দেয়ার ইয

নো মেডিসিন অ্যাভেইলেবল টু আস টু ট্রিট ইট—পসিবিলিটি ইয, ইট উড ড্রেইন আউট অভ দ্য বডি... ইভেঞ্চুয়ালি।'

বলে কী দুই বুড়ো? কারা এরা?

সেই সিরিঞ্জওয়ালা গলা-ছেলা শকুনটাই বা গেল কোথায়?

...অতি পরিচিত সেই যুবক রাতের আঁধারে তিনতলার জানালা থেকে লাফ দিচ্ছে কেন? মরবে তো বোকাটা! আরে, ভয়ানক মারকুট্টে খুনি তো আসলে ব্যাটা! পিস্তল কেড়ে নিয়ে ওটারই আঘাতে মাথা থেঁতলে মেরে ফেলেছে টহলদার গার্ডকে! সর্বনাশ! কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ও? উঁচু দেয়াল। তার উপর হাজার হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎবাহী কাঁটাতারের বেড়া!

...না, জায়গাটা সত্যিই খুব চমৎকার। আসমান-ছোঁয়া নীলচে পাহাড়, গহীন সবুজ অরণ্যের চির অচেনা দুর্বোধ্য রহস্য, সুগভীর সুনীল হ্রদ, উন্মুক্ত আকাশ। তারাগুলো বড় উজ্জ্বল।

কাউকে দেখা গেল না, অথচ ভারী একটা কণ্ঠ নিচু স্বরে বলল, '...অসুবিধে হবার কথা নয়, সার। আশা করা যায়, নতুন জীবনে মানিয়ে নিতে পারবে সহজেই। ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে করবে, এক প্রয়াত বিরাট বড়লোকের একমাত্র ছেলে ও, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে বলে অবসর কাটাচ্ছে এখানে। ভাববে, এটাই ওর চিকিৎসা' কোনও কাজ করতে হবে না ওকে, বেশি ভাবনা-চিন্তার দরকার নেই। ...হিপনোটিক সাজেশনের বাইরে পড়ে এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে টেরও পাবে না অন্য কোনও পরিচয় ছিল বা আছে ওর।'

'কিন্তু টের পেলে?' খুব পরিচিত মনে হচ্ছে ওই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। সেই কাঁচাপাকা ভ্রূওয়ালা গম্ভীরদর্শন বুড়োটা বলছে নাকি? কে ওই বৃদ্ধ?

'ওর অতীত কী ছিল জানতে চেষ্টা করবে ও, সার। তবে তেমন কিছু মনে করতে পারবে না। যদি কিছু মনে পড়ে, তা হলে তো ভাল, বুঝতে হবে ওষুধের প্রভাব কাটছে। কিন্তু ওরকম হলে

ছাড়া-ছাড়া টুকরো স্মৃতির কারণে অসহায় লাগবে ওর নিজেকে। ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের ওই সিরাম তো স্মৃতি বলতে কিছু রাখেনি প্রায়। আর এখন হিপনোটিক সাজেশনের পর তো আমাদেরকেও চিনবে না ও।'

'হুঁ, বোর্ড অভ্ ডক্টর্স-এর রিপোর্টেও জানানো হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মগজটাকে বেশি না খাটানোই ভাল।'

...আবার সেই হাসপাতাল-ঘর। সিরিঞ্জ হাতে সেই শকুনটা গেল কই? স্প্রিঙের খাটিয়ায় শুয়ে আছে নাম-না-জানা সেই অতি পরিচিত যুবক, হাত-পা এখনও বাঁধা।

চরম অস্বস্তি থেকে রক্ষা পেতে ঘুমের ঘোরে চিত হলো মাসুদ রানা। ...ছিঁড়ে ফেলতে হবে হাতের বাঁধন। দড়ি ছিঁড়ল কী করে? আগেই ছিঁড়েছে? নাকি আছে এখনও, ছেঁড়েনি?

গায়ের জোরে দু'হাত দু'দিকে ঝটকা মারতেই ঘুমটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল মাসুদ রানার। টের পেল, ঘামে সপ্‌সপ্‌ করছে সারাশরীর। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্নটা দেখে ও। এই একই দুঃস্বপ্ন, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বারবার। অকারণে। এরকম কিছু ওর জীবনে ঘটেনি কখনও, তবুও।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। সকাল হয়ে গেছে, সোনালী রোদে ঝলমল করছে চারপাশ। সবসময় ভোরে ওঠে, কিন্তু আজকে দেরিতে ভেঙেছে ওর ঘুমটা।

পাশ থেকে নোটবুক টেনে নিল রানা। দুর্ঘটনার পর অতীত স্মৃতি হারিয়ে যাওয়ায় গত চারমাস ধরে প্রতিদিনের কাজ নোটবুকে লিখে রাখছে ও, যেন ভুলে না যায়।

কখনও কখনও হঠাৎ করেই নিজেকে সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ মনে হয় ওর, আবার কখনও বা কিছুতেই মনে আসে না অতি সাধারণ বিষয়ও।

ছোট শহর বলে অ্যাসপেনের প্রায় সবাই জানে, বিরাট

কোনও প্রয়াত ধনীর একমাত্র সন্তান ও, সুস্থতা ফিরে পাবার জন্য পাহাড়ি এই রিযোর্টের দূষণমুক্ত আবহাওয়ায় অখণ্ড অবসর কাটাচ্ছে—ফলে কেউ কখনও ঘাঁটায় না ওকে।

গত চারমাস প্রায় একাকীই থাকতে হয়েছে ওকে এই অ্যাসপেনে। বইয়ের দোকানের মালিক হের হেইঞ্জ ও প্রাক্তন স্কি রিযোর্ট ম্যানেজার হের হাইনরিখ—এই দুই জার্মান বৃদ্ধের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা সত্যি ভাল। তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন পরপর দেখা হয়। আরও আছে ইরাক যুদ্ধফেরত পাগলাটে সৈনিক চার্লস রবিনসন। তার সঙ্গেও খুব খাতির হয়ে গেছে ওর। মাঝে মাঝেই হাজির হয় রবিন। ওই পাগলাটে রবিনটাই তো ঋণী থাকতে রাজি নয় বলে নিজের জানের জান তিন মাস বয়সী রটওয়াইলার কুকুর-ছানাটাকে জোর করে উপহার হিসেবে দিয়ে দিয়েছিল ওকে, ঝলমলে চেহারায় বলেছিল, 'দোস্ত, এটা তোমাকে দিলাম; দেখবে, কীরকম ভালবাসে ও তোমাকে। প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবে ও তোমাকে।'

হের হেইঞ্জ, হের হাইনরিখ ও ছিটেল রবিন—এই তিনজন ছাড়া অ্যাসপেনে আর কারও সঙ্গে ওঠাবসা ওর নেই বললেই চলে। রবিনসন ছাড়া কেউ আসে না ওর বাংলোয়। অবশ্য বিখ্যাত বাংলাদেশি ব্রেইন স্পেশালিস্ট ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে চিঠি লেখেন, দেড় মাস পরপর দেখতে আসেন ওকে, কিছু ওষুধ উল্টেপাল্টে দেন, খানিক গল্প করে বিদায় নিয়ে চলে যান একসময়। তাঁর কাছেই ও শুনেছে, অতীত নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত হবে না ওর, তাতে অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে হঠাৎ। কিচ্ছু জানতে চেষ্টা করতে হবে না ওকে, একসময় দেখবে, সবই মনে পড়ছে। মানুষটা ভাল—তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে রানা, মনটাকে স্মৃতি হাতড়াতে দিচ্ছে না পারতপক্ষে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বুকের মাঝে খুব শূন্যতা জাগে ওর, ইচ্ছে

করে কোথায় যেন চলে যেতে। এমন কোথাও, যেখানে রয়েছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব; রয়েছে স্নেহ-মায়া-মমতার দৃঢ় বন্ধন। ডাক্তারের কাছে শুনেছে, বাবা ছাড়া একান্ত আপন আর কেউ ছিল না ওর পৃথিবীতে। সেই মানুষটাও চলে গেছেন পরপারে। কবে, সেটা মনে করতে পারে না ও। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওর বিশাল ব্যবসা দেখাশোনা করছে একটা ট্রাস্ট।

দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারল না রানা। মনটাকে অন্যদিকে সরাতে চোখ রাখল নোটবুকে।

** পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে সে এখন কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করা।*

** হান্টারকে নিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে বেড়ানো।*

অভ্যেস বশে ঘড়ি দেখল ও। সাড়ে ন'টা।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া দরকার। আড়মোড়া ভাঙল ও, বিড়বিড় করে বলল, 'কাজ আছে।'

নাস্তা সেরে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে হান্টারকে নিয়ে বাংলো থেকে বের হলো ও, ছাদ-খোলা পিকআপ নিয়ে চলে এলো পাহাড়ের কোলে গুটিসুটি মেরে থাকা অ্যাসপেন শহরের পুবদিকের হাইওয়েতে। পোস্ট অফিসের ছোট্ট দালানটার সামনে পৌঁছুতে লাগল মিনিট পনেরো।

হান্টারকে পিকআপের পিছনে বসিয়ে রেখে পোস্ট অফিসে ঢুকে পড়ল ও। পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে বেরিয়ে এলো আবার, হাতে একটা এনভেলপ। বেরিয়ে এসেও মনে পড়ে যাওয়ায় আবার ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে এলো, পোস্টমাস্টারের শরীরটা এখন আগের চেয়ে ভাল।

পোস্ট অফিস থেকে বের হয়ে কড়া রোদে চোখ কুঁচকে গেল ওর।

এনভেলপটা হালকা নীল রঙের, চারপাশে গাঢ় নীলের বর্ডার। কোনও বিল বা বিজ্ঞাপন হতে পারে না। ব্যক্তিগত

কোনও চিঠি? ...কার? হৃৎস্পন্দন বেতালা হয়ে গেছে, টের পেল রানা।

এনভেলপ খুলতে গিয়েও পার্ক করে রাখা পিকআপের দিকে চলে গেল ওর চোখ। কান দুটো খাড়া করে ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড়ে চাপা গর্জন ছাড়তে শুরু করেছে হান্টার, উঁচু হয়ে উঠেছে ঘাড়ের রোম, দাঁড়িয়ে পড়েছে রটওয়াইলারটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, বেরিয়ে এসেছে দাঁতগুলো, লালচে মাড়ি দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো যেন জমাট লাল রক্ত দিয়ে তৈরি। শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ক্ষিপ্ত রটওয়াইলার কুকুর যা করে, তা-ই করছে হান্টার।

'নো, হান্টার, সিট,' নরম সুরে বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল মরিচা-কালো রঙের প্রকাণ্ড রটওয়াইলার, তারপর আবার চোখ ফেরাল বারমুডা হাফপ্যান্ট ও হাওয়াই গেঞ্জি পরা ক্যামেরাওয়ালা আপত্তিকর লোকটার দিকে—বসল অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

'বিশ্রী কুকুর তো!' ভ্রূ কুঁচকে রাগ-রাগ চেহারায় রানার দিকে ফিরল বারমুডা হাফপ্যান্ট, গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা দেখাল। 'আমি একটা ছবি তুলতে চেয়েছিলাম।'

'বিশ্রী কুকুর নয় হান্টার, তবে নিজস্ব রুচি আছে ওর—যার-তার হাতে ছবি তোলে না।' পিকআপের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে ওর পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে আসীন হলো রটওয়াইলার।

প্রিয় কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা, মোলায়েম স্বরে বলল, 'গুড বয়, হান্টার।'

'কী কারণে অত গুড বয় হলো, শুনি?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল বিরক্ত টুরিস্ট। 'আরেকটু হলেই তো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শয়তানটা!'

বেঁটে, মোটা লোকটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা। ওর অন্তহীন গভীর কালো চোখ দুটো জেড পাথরের মতো দেখাল।

'গুড বয়, কারণ আমার কথা শুনেছে ও, বিরক্ত করার পরও এক কামড়ে আপনার গলার রগ ছিঁড়ে দেয়নি।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল অসন্তুষ্ট টুরিস্ট, তবে সেটা নিজের ঝাঁটার মতো গোঁফকে শুনিয়ে। তার মনে হয়েছে, ভয়ঙ্কর রটওয়াইলার কুকুরটার চেয়েও পিকআপে বসা চওড়া কাঁধের ওই কঠোর চেহারার যুবক অনেক বেশি বিপজ্জনক। আর একবারও পিকআপের দিকে না তাকিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল সে হনহন করে।

এনভেলপ থেকে চিঠি বের করে ভাঁজ খুলল রানা। মিষ্টি একটা মেয়েলি সুগন্ধ পেল ঝকঝকে সাদা অফসেট কাগজে।

'হাই, রানা,

জানি না তুমি খুব ব্যস্ত কি না। এটাও জানি না, আমাকে তুমি মনে রেখেছ কি না।

গত আগস্টে তুমি বলেছিলে হেমন্তে একসঙ্গে ক্যাম্পিং করতে পারি আমরা, আমন্ত্রণ দিয়েছিলে হেমন্ত-রাতে খোলা আকাশের নীচে ডিনারের।

মনে পড়ে আমাকে?

তুমি কি খুব ব্যস্ত? যদি হও, তো বিরক্ত করব না তোমাকে। রকি মাউন্টেন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে দোসরা অক্টোবর, দুপুর বারোটায় অ্যাসপেনে আসছি আমি।

আশা করি দেখা হবে। হান্টারের জন্য শুভকামনা রইল।

লিমা সোরেনসন

পুনশ্চ: অন্তত দশবার ফোন করেছি তোমাকে, পাইনি।

লিমা সোরেনসনকে মনে পড়ল না রানার। ...কে মেয়েটা? তারপর ওর চোখের সামনে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো দেখা দিয়ে গেল কমনীয় একটা মিষ্টি, নিষ্পাপ মুখ। হঠাৎ করেই লিমাকে মনে পড়ল ওর।

'চার মাস আগে জার্নালিস্টদের একটা কনভেনশনে এসেছিল

লিমা সোরেনসন। তখনই মাইকেলের রেস্টুরেন্টে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় ওর। অদ্ভুত অমোঘ আকর্ষণে ওকে যেন টানছিল অপরূপা সুন্দরী, প্রতিভাময়ী তরুণী লিমা।

রানার মনে হয়েছিল, জীবনে এই প্রথম এভাবে কাউকে ভাল লাগল ওর। দু'একটা কথা থেকে আলাপটা একসময় মোড় নিয়েছিল পারস্পরিক ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিকে। তারপর সম্পর্কটা নিবিড় হতে সময় নেয়নি খুব বেশি। কিন্তু সেটাই ছিল অ্যাসপেনে লিমার শেষ রাত। পরদিন সকালে ফিরে যাবে ও নিউ ইয়র্কে, নিজের কর্মক্ষেত্রে।

সে-রাতে ওর বাংলোয় লিমাকে দাওয়াত করেছিল রানা; নিজে রেঁধেছিল লিমার পছন্দের খাবারগুলো। একসঙ্গে স্বপ্নীল, মৃদু আলোয় ডিনার সেরেছিল দু'জন। ফায়ারপ্লেসের আগুনের সামনে বসে এটা ওটা গল্প করতে করতে ভোর হয়ে গিয়েছিল কখন, টের পায়নি দু'জনের কেউই।

গল্প করেছিল ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। কোথায় কী বাধা ছিল কে জানে, পরস্পরের কাছে আসা হয়নি ওদের শেষ পর্যন্ত। তবে রানা অস্বীকার করতে পারবে না, সে-রাতে নিজেকে সামলাতে বেগ পেতে হয়েছিল ওর। নিজেকে ওর মনে হয়েছিল চরম বঞ্চিত কোনও অসহায় পুরুষ। হৃদয় আকুল হয়ে চেয়েছিল, যদি আরও কয়েকদিন থাকত লিমা! যদি ঘনিষ্ঠতা বাড়ত আরও! কিছু বলতে পারেনি মুখ ফুটে।

লিমার তরফ থেকে সামান্যতম সাড়া ছিল না বলেই হয়তো কৃষ্ণকালো মেঘরাশির মতো ওই কুঞ্চিত সুবাসিত কেশ স্পর্শ করতে সাহস পায়নি ও, বুক ভরে টেনে নিতে পারেনি মাদকতা ভরা নারীর অনন্ত রহস্যময়, আদিম সুবাস। বুকে টেনে নিতে পারেনি লিমাকে। অন্তরের গভীরে দহন থাকলেও স্বীকার ওকে করতেই হবে, বুদ্ধিমতী চটপটে লিমা সোরেনসনের সঙ্গ সত্যিই খুব উপভোগ করেছিল ও।

দহনটা এসেছে ওর অক্ষমতা থেকে। নিজের হৃদয়কে চোখ ঠারেনি রানা। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন, সেটা তো ওর যোগ্যতা হতে পারে না। কী কাজ করে ও? অসুস্থ একজন বেকার যুবক—ঘোরে-ফেরে, খায়-দায়, টাকার দরকার হলে চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে খরচ করে। অথচ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে গেছে লিমা, বেশ নামও করেছে ফ্রিলান্স সাংবাদিকতা করে।

ওর মতো বিরাট বড়লোক হয়তো নয় লিমা সোরেনসন, তবু লিমার তুলনায় নিজেকে অযোগ্য মনে হয়েছে রানার। ধরেই নিয়েছিল, লিমা নামের অদ্ভুত আকর্ষণীয়া সেই মিষ্টি মেয়েটি আর কখনও ফিরে আসবে না ওর জীবনে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওর ধারণা ভুল, ওকে মনে রেখেছে লিমা।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল, আজই দোসরা অক্টোবর। চট্ করে এনভেলপের পোস্ট মার্কের দিকে তাকাল ও। চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে আটদিন আগে, নিউ ইয়র্ক থেকে। বোধহয় গত এক সপ্তাহ ধরেই এনভেলপটা পড়ে ছিল পোস্ট অফিসে, ওর বাক্সে। অসুস্থ পোস্ট-মাস্টারের পক্ষে ওকে জানানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সিদ্ধান্ত নিল রানা, এখন থেকে পোস্ট অফিসে ফোন করে নিয়মিত খোঁজ নেবে, ওর কোনও চিঠি এসেছে কি না। আরেকটা ব্যাপার, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও, এর পর থেকে বইয়ে বুঁদ হবার সময় ফোনের রিসিভার উঠিয়ে রাখা চলবে না।

'অতিথি আসছে, হান্টার,' বিশ্বস্ত রটওয়াইলারটাকে বলল ও। 'তোর পছন্দের মানুষ।'

প্রভুর গলা শুনে মাথা একদিকে কাত করে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল কৌতূহলী হান্টার, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু বেরিয়ে থাকল লাল টুকটুকে জিভের ডগা। হাস্যকর রকমের নিরীহ দেখাল একশো তিরিশ পাউন্ড ওজনের দানবীয় রটওয়াইলারকে দেখতে। হান্টারের এই ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে রানা, ও যখনই

কথা বলে, মনোযোগ দিয়ে শোনে হান্টার, সব শব্দের মানে বোঝে না, কিন্তু কী ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা ঠিকই বোঝে।

ঘড়ি দেখল রানা। লিমার ফ্লাইট পৌঁছুতে আর দু'ঘণ্টাও বাকি নেই। পিকআপ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও। পিঠ-সোজা করে বসল হান্টার, তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে। সামান্য আগুপিছু করে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখছে দক্ষতার সঙ্গে।

শহরের পুবদিকের হাইওয়েতে পড়ল পিকআপ, দ্রুত ছুটে চলল ইন্ডিপেন্ডেন্স পাস-এর দিকে। কয়েক মিনিট পর পিছনে পড়ে গেল ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ি শহরের ছড়ানো-ছিটানো ছোট-ছোট বাড়িগুলো।

মাইল দুয়েক হাইওয়ে ধরে পুবে গিয়ে বামে মোড় নিল রানা, নুড়িপাথর বিছানো তৃতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা একটা সরু, ঢালু পথ ধরে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল ছাদ-খোলা পিকআপ।

পথের শেষমাথায় জঙ্গলে ভরা নিচু টিলার সমতল চূড়ায় রানার বাংলো—ছোট, কিন্তু চমৎকার। বড় বড় জানালাগুলোয় দাঁড়ালে বেশ নীচে দেখা যায় ঢেউ খেলানো সবুজ উপত্যকা, সোজা তাকালে দূর থেকে ঘিরে রাখা আকাশ-ছোঁয়া নীলচে পর্বতমালা।

কবে ওর জন্য চার একর জমি সহ বাংলোটা কিনেছিলেন বাবা, মনে পড়ে না রানার। বোধহয় কোনও এক জন্মদিনে একমাত্র ছেলেকে দিয়েছিলেন সস্নেহ উপহার।

বাংলোর পিছনে ওর জমি যেখানে শেষ, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ন্যাশনাল ফরেস্ট সার্ভিসের এলাকা। সামনের দিকে হাইওয়ে পর্যন্ত সমস্ত জমিই ওর। হাইওয়ের ওপারে সরকারী এল্‌ক্ রিযার্ভেশন। আশপাশে প্রতিবেশী বলতে কেউ নেই। থাকলেও অবশ্য অসুবিধে ছিল না কোনও, টিলার চারপাশে অ্যাসপেন ও প্রুস-এর ঘন জঙ্গল ঘিরে রেখেছে বাংলোটাকে—প্রাইভেসি নষ্ট হতো না।

অ্যাটাচড্ বাথরুম সহ দুটো মাঝারী আকারের সাজানো-গোছানো বেডরুম, ঝকঝকে একটা কিচেন, মোটামুটি বড় লিভিংরুম—ব্যস, এই নিয়েই বাংলো। কিচেনের এক কোণে খাওয়ার টেবিলের পরিবর্তে ছোট একটা কার্ড টেবিল ও দুটো চেয়ার। লিভিংরুমের চার দেয়ালের তাক ভরে আছে দুনিয়ার সেরা সব ক্লাসিক বইয়ের ইংরেজি সংস্করণে। এক সেট সোফা, দুটো ইযিচেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাবপত্র নেই লিভিংরুমে।

নিঃসঙ্গ ব্যাচেলরের অবকাশ-যাপনের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে অ্যাসপেনের এই বাংলো।

গোছানো স্বভাবের মানুষ বলে রানার বাংলো পরিপাটি থাকে সবসময়, তবে আজকে কিচেনে এখনও পড়ে আছে না-ধোয়া প্লেট, বেডরুমে অগোছাল হয়ে আছে সকালে-ছাড়া পোশাক। লিভিংরুমের সোফা ও কার্পেটে ছড়িয়ে আছে হান্টারের লোম। আসরাবপত্রগুলোতেও মিহি ধুলোর আস্তরণ দেখতে পেল উদ্বিগ্ন রানা। লিমা আসবার আগে সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলতে হবে ভেবেই তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরেছে ও।

দরজা খুলতেই লাফ দিয়ে সোফায় উঠে বসেছে হান্টার, জুত করে বসে কৌতূহলী চোখে দেখছে মনিবের অস্বাভাবিক ব্যস্ততা।

কিচেনের বাসন-কোসন ধুয়ে ঝকঝকে করে ক্যাবিনেটে তুলে রাখল রানা, দেরি হলো না বেডরুম থেকে সকালে-ছাড়া পোশাক তুলে ওয়াশিং মেশিনে রেখে বিছানা পরিপাটি করতে। এরপর শুরু হলো কাপড় হাতে বইয়ের র‍্যাক, চেয়ার ঝাড়া। সবশেষে ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে সোফা ও কার্পেট থেকে পরিষ্কার করে ফেলল ও হান্টারের লোম।

তাতেও সন্তুষ্টি হলো না রানার, কিছু অগোছাল রয়ে গেল কি না খুঁজে দেখতে ঢুঁ মারতে শুরু করল এ-ঘরে ও-ঘরে।

লিভিংরুমে গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়েছে ও ফায়ারপ্লেসের পাশে, ওখানে এখনও রয়ে গেছে সিগারেটের

পোড়া টুকরো ও ছাই-ভরা অ্যাশট্রে। চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ওটা, এবার আবর্জনাসহ অ্যাশট্রে নিয়ে রওনা হলো ওয়েস্ট বাস্কেটের দিকে। কিন্তু জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া একঝলক বাতাসে উড়ে গেল অর্ধেক ছাই, ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। দ্বিতীয়বার ঝাড়তে হলো লিভিংরুমের সোফা ও ইযি চেয়ারগুলো।

চারপাশে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হলো রানা। দরজার কাছে চলে এসে বলল, 'এক্ষুনি আসছি, হান্টার। বসে থাক।' দরজা লক করে পিকআপের দিকে পা বাড়াল ও।

মনিবের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হবে বুঝে কুঁই-কুঁই করে মনের নিখাদ দুঃখ প্রকাশ করল প্রকাণ্ড রটওয়াইলার, তারপর যেন অভিমান ভরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল সোফার এক কোণে।

নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে অগ্রসরমান ডি হ্যাভিল্যান্ড অটার প্লেনটাকে দেখা গেল পরিষ্কার, সবুজ উপত্যকার বুক চিরে দেওয়া রানওয়ের দিকে নেমে আসছে দ্রুত। তারপর টাচডাউনের ঠিক আগে নাক সোজা করল ওটা।

ব্যাগেজ ক্লেইম এরিয়ায় দাঁড়িয়ে পেটমোটা নাদুস-নুদুস বিমানটাকে ট্যাক্সিইং করে টার্মিনালের দিকে এগোতে দেখল রানা।

বছরের এসময়ে স্কিইং রিযোর্ট বন্ধ বলে খুব কম মানুষই আসে অ্যাসপেনে, যে-কারণে যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। নামতে শুরু করল তারা। সুট পরা কয়েকজনকে দেখে মনে হলো ব্যবসায়ী; তরুণও আছে বেশ কয়েকজন, বোধহয় চাকরির খোঁজে এসেছে। অন্যান্যরা সাদামাটা পোশাক পরা অ্যাসপেন শহরেরই বাসিন্দা। হয় ডেনভার থেকে বেড়িয়ে এসেছে তারা, নয়তো বৃদ্ধ বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরছে এখন; অথবা... প্রতিহিংসাপরায়ণা লোভী প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে আইনী সমঝোতা শেষে হালকা পকেট নিয়ে ফেরত আসছে কোনও সর্বহারা ব্যথিত চিত্তে।

লাইনের শেষে লিমা সোরেনসনকে দেখে মৃদু হাসল রানা। সূর্যের রশ্মি পড়ে রং-বেরঙের আলোক-ছটা ঝিলিক দিচ্ছে লিমার কোমর ছাড়ানো চকচকে কালো কুঞ্চিত চুল থেকে। দূরত্বের কারণে ওর চোখ দুটোও কালো দেখাল, তবে রানার মনে পড়ল, ওগুলো অতল সাগরের মতো গভীর নীল, রহস্যময়।

কোনও মেকআপ নেয়নি মেয়েটা, গ্রিক দেবীদের মতো ঘি-রঙা মসৃণ ত্বক ওকে আলাদা করেছে অন্যদের থেকে। আঁটো কর্ডুরয় ট্রাউজার্স সগর্বে প্রকাশ করছে রমণীয়, সুডৌল, সুগঠিত দীর্ঘ ঊরু। ওই ট্রাউজার্স গোঁজা রয়েছে হাঁটু-সমান উঁচু বুটজুতোর ভিতরে। কাস্টম টেইলর্ড ব্লাউজের উপর ভেস্ট পরেছে লিমা। সরু কোমর ও ভরাট বুক ঢেকে রেখেছে ওগুলো, তবে আড়াল করছে না অদ্ভুত সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠবের আভাস।

সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে টারমাক ধরে ওকে হেঁটে আসতে দেখল রানা। গ্রীবা সোজা করে রেখেছে মেয়েটা, সামান্য ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো একপাশে নিল, অবাক করা ওই চমৎকার ভঙ্গিটা শুধু মেয়েদেরকেই মানায়।

ভুলে গিয়েছিল রানা, লিমা কতটা সুন্দর। কিংবা, হয়তো ভোলেনি, হৃদয় যেন ক্ষতবিক্ষত না হয়, সেজন্য অজান্তেই মন থেকে সরিয়ে রেখেছিল স্মৃতিটা। লিমাকে হেঁটে আসতে দেখে পাহাড়ি বাংলোয় সে-রাতে যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিল, সেরকমটা আবারও অনুভব করল ও। হঠাৎ মনে হলো, গলাটা শুকিয়ে গেছে, পানি খাওয়া দরকার। রহস্যময়ী, আকর্ষণীয়া ওই মেয়েটা কাছে টানে নিবিড় ভাবে, অথচ সহজ আচরণের ওপাশে তুলে রাখে দুর্লঙ্ঘ্য, অনতিক্রম্য প্রাচীর, আসতে দেয় না একান্ত কাছে।

লিমা সোরেনসন টার্মিনালে ঢুকতেই ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা, ক্ষণিকের জন্য বুঝতে পারল না আলাপটা কীভাবে শুরু করা উচিত।

ওর অস্বস্তি কাটিয়ে দিল লিমা মিষ্টি হেসে গালে চুমু দিয়ে। ঝর্নার কলধ্বনির মতো মিষ্টি, রিনিঝিনি ওর কণ্ঠ শুনে মনে হলো পৃথিবীতে নির্ভেজাল সুখ ছাড়া আর কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। ‘সত্যি বুঝতে পারছিলাম না তুমি আসবে কি না, রানা! এসেছ, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ।’

‘কেমন আছো তুমি, লিমা?’ লিমা সোরেনসনের ব্যাগ চলে এসেছে কনভেয়ার বেল্টে চেপে, মেয়েটা হাত বাড়াতেই চট্ করে ব্যাগটা তুলে নিল রানা। ‘...তা হলে ক্যাম্পিঙে যাচ্ছি তো আমরা?’

‘নিশ্চয়ই!’ ঝলমল করে উঠল লিমার চোখ-মুখ। ‘দেখতেই পাচ্ছ, ভাল আছি। আর, তুমি কেমন আছো তা জিজ্ঞেস করব না, প্রথমবার তাকিয়েই বুঝতে পেরেছি, ভাল আছো।’

থমকে গিয়ে লিমা সোরেনসনের দিকে চট্ করে একবার তাকাল রানা। মেয়েটার কণ্ঠের ঘুঙুর-কিঙ্কিণীর স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ওর। আর সবকিছুর মতোই গলার স্বরটাও যেন বিশেষ ভাবে লিমার জন্যই তৈরি করেছেন স্রষ্টা।

রানার বামহাতটা ধরে গ্রীবা কাত করে ইশারা করল লিমা। ‘চলো, যাওয়া যাক?’

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে বিস্মৃত রানার মনে হলো, ওরা সব সময় এরকম পাশাপাশিই ছিল, হাজার কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর বুকে হেঁটেছে হাত ধরাধরি করে। আপনমনে ম্লান হাসল রানা। আসলে তো কখনও ওর জীবনে এভাবে আসেইনি কোনও মেয়ে! ...নাকি এসেছিল? ওর অসুস্থতার কারণে চলে গেছে দূরে?

অ্যাসপেন শহরটা আগেও দু’বার দেখেছে লিমা, তবে তা এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাবার পথে। ছাদ-খোলা পিকআপে বসে হেমন্তের সাজে রূপবতী অ্যাসপেনকে মুগ্ধ হয়ে দেখল ও।

স্কিইঙের পাহাড়ি ঢালগুলোয় বরফ নেই এখন, মৃদু বাতাসে মাথা দোলানো ঘন সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে ঢেউ খেলানো পাহাড়।

সূর্যরশ্মিতে সোনালী আভা ছড়াচ্ছে অ্যাসপেন গাছের সারি; স্তব্ধ হয়ে আছে চিরহরিৎ নীরব স্প্রুস—অপেক্ষা করে আছে প্রথম তুষারপাতের, যখন তাদের কাছে দলে দলে ছুটে আসবে আনন্দ-পাগল স্কিয়ার।

চারপাশে সুনীল, উন্মুক্ত আকাশ, তার এখানে ওখানে খোঁচা মারছে কোন্ আইসক্রিমের মতো তুষারমোড়া সফেদ পর্বত চূড়া।

উপত্যকা ঘিরে রেখে যেন প্রতিরক্ষা পাঁচিল তুলেছে রকি মাউন্টেনের প্রকাণ্ড কালো কাঁধ।

অদ্ভুত সুন্দর পাহাড়ি এলাকাটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল লিমা। অনেক বেড়িয়েছে ও, কিন্তু এতো সুন্দর আর কোনও জায়গার কথা মনে করতে পারল না। উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে বলে ফেলল, 'ওহ্, রানা, কী অপূর্ব!'

মৃদু হাসল রানা। 'সব প্রশংসা শেষ করে ফেলো না, হাই কান্ট্রি এর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।'

'ক্যাম্পিঙে যাব কখন আমরা?' বাচ্চা মেয়েদের মতো খুশি হয়ে রানার দিকে তাকাল লিমা।

চট্ করে অ্যাসপেনের চেয়েও রূপসী পাশে বসা সঙ্গিনীকে একবার দেখে নিল রানা। 'আগামীকাল সকালে।'

'ভোরেই রেডি হয়ে যাব আমি,' উৎসাহের সঙ্গে জানাল লিমা। 'ক্যাম্পিঙের কয়েকটা জিনিস অবশ্য নেই আমার, তুমি দোকান দেখিয়ে দিলেই কিনে নেব। ...শহরেই পাওয়া যায় তো সব?'

'কিচ্ছু কিনতে হবে না,' পাহাড়ি রাস্তায় তীক্ষ্ণ বাঁক নিল রানা। 'আমার কাছে যা আছে, তা দিয়ে অনায়াসে ক্যাম্পিং করতে পারবে অন্তত দশজন।'

খানিকটা সামনে, ডানদিকের একটা লজ দেখাল লিমা। 'ওখানে রিযার্ভেশন আছে আমার। একটু থামবে ওই মোটেলে? লাগেজ রেখে মুখ-হাত ধুয়ে নিতাম?'

বড় একটা ধাক্কা খেল রানা লিমার কথা শুনে। হতাশার বোধটা এতোই তীব্র যে, নিজেকে ওর মনে হলো বাচ্চা কোনও অবুঝ ছেলে। যতটা সহজ ভাবে বলতে চেয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে বলা হয়ে গেল ওর, 'ওখানে থাকবে কেন তুমি!' ভুলটা বুঝতে দেরি হলো না, কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'আসলে... আমার বাংলোয় তো গেস্টরুম আছেই, তুমি ওখানে থাকলে খুব খুশি হবো আমি।'

পরিস্থিতির অস্বস্তিকর দিকটা উপলব্ধি করে আলতো হাত রাখল লিমা রানার বাহুতে, তারপর বলল, 'তা হলে তো খুবই ভাল হয়। সত্যি, অনেক ধন্যবাদ। রিযার্ভেশন ক্যানসেল করে তোমার বাংলোতেই উঠছি তা হলে।'

মনিব নির্দেশ দিয়ে যাওয়ায় সোফা ছেড়ে নড়েনি প্রভুভক্ত ট্রেইন্ড রটওয়াইলার। দরজা খুলে হান্টারকে সোফার উপরেই দেখতে পেল রানা। খাড়া কান দুটো সামনে এনে চোখ সরু করে অপরিচিতা আগন্তুককে যাচাই করছে হান্টার, অতি খাটো লেজটা উঁচু, স্থির।

সামনে ঝুঁকে মৃদু হাততালি দিল লিমা, 'হাই, হান্টার, জিজ্ঞেস করবি না কেমন আছি?'

একপাশে মাথা কাত করে লিমাকে দেখল হান্টার, তারপর আরেকপাশে কাত করল মাথাটা—এখনও ঠিক চিনতে পারেনি নবাগতাকে।

'হায়রে হান্টার, আমাকে মনে নেই?' দুঃখ-দুঃখ ভাব করে বলল লিমা। ডানহাত বাড়িয়ে দিল। 'খুব কষ্ট পেলাম মনে।'

কৌতূহল নিয়ে হান্টারের আচরণ দেখছে রানা। লিমাকে ভুলে যাওয়ার কথা নয় রটওয়াইলারের। সে-রাতে ফায়ারপ্লেসের আগুনের ধারে বসে ছোট্ট হান্টারের বুক-পেট চুলকে দিয়েছিল লিমা অনেকক্ষণ ধরে। স্মৃতি হাতড়ে আগন্তুকের পরিচয় বের

করতে চাইছে হান্টার এখন। ওর চিনবার মুহূর্তে, চেহারার পরিবর্তনটা স্পষ্ট দেখতে পেল রানা।

খাড়া কান দুটো নামিয়ে বোওলিং বল আকৃতির মাথার পিছনে নিয়ে গেল হান্টার, সরু চোখ দুটো হয়ে গেল বিস্ফারিত, অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ঘনঘন নড়তে শুরু করল ছোট্ট লেজ। রানা 'ওকে, হান্টার,' বলতেই সোফা ছেড়ে লাফ দিয়ে নেমে সামনের দু'পা তুলে দিল ও লিমার কাঁধে।

অত বড় কুকুরের ওজন সামলাতে না পেরে সোফার উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল লিমা, রক্ষা পেল না তাতে, ওর কোলের উপর উঠে পড়ল হান্টার, পালা করে হাত ও গাল চাটতে লাগল ব্যস্ত হয়ে। তারই ফাঁকে অদম্য আবেগে কুঁই-কুঁই আওয়াজ ছেড়ে বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। তাতেও ভালবাসার পরিমাণ বোঝাতে না পেরে শেষে চার হাত-পা শূন্যে তুলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল লিমার পাশে, বাতাসে খামচি মারতে মারতে গর্জন ছাড়ল ঘড়ঘড় করে। চাইছে লিমা ওর সঙ্গে নকল যুদ্ধে রত হোক।

ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিল লিমা, চুলকে দিল গলার নীচের চামড়া।

গেস্টরুমে লিমার লাগেজ নিয়ে রাখল রানা। রবিনসনের হারিয়ে যাওয়া একটা শর্টস দেখতে পেল খাটের কোণে, মেঝেতে। মুহূর্তে ওটা চলে গেল খাটের নীচে, চোখের আড়ালে। লিভিংরুম থেকে আসা আওয়াজ খানিকটা বিস্মিত করল ওকে। খুব কম মানুষকেই পছন্দ করে হান্টার, অথচ হঠাৎ করেই যেন আজ শৈশবে ফিরে গেছে হিংস্র, বদমেজাজি, অথচ অনুগত রটওয়াইলারটা।

হলওয়ে ধরে হান্টারকে ছুটে যেতে দেখল রানা, কিচেনের কোনা থেকে দু'ফুট লম্বা চামড়ার তৈরি কৃত্রিম হাড়টা কামড়ে তুলে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে আবার লিভিংরুমে ফিরল রটওয়াইলার। এবার ও টাগ-অভ-ওয়ার খেলতে চাইছে প্রিয় মানুষটার সঙ্গে।

লিমার সুরেলা, মিষ্টি হাসির আওয়াজে ভরে উঠল বাংলো।

দুপুরে মাইকেলের রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারল রানা ও লিমা। শান্ত, নীরব শহরের রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটল ওরা, তারপর আবার ফিরল বাংলোয়। ক্যাম্পিং গিয়ার বাছাই করে ব্যাকপ্যাক গোছাতে ব্যয় হলো বিকেলটা। নিজের ব্যাকপ্যাক ক্লযিট থেকে বের হতে দেখে মেঝেতে সামনের দু'পা ঠুকে বাংলো কাঁপিয়ে খুশিতে কয়েকবার ডাকাডাকি করল উত্তেজিত হান্টার।

'ওর খাবার ও-ই বইবে,' লিমাকে বলল রানা। 'এটাই নিয়ম—যার জিনিস তাকেই বইতে হবে।' রহস্যময় একটুকরো হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁট থেকে।

'আশা করি আমার সবকিছু আমিই বইতে পারব,' মায়াবী নীল চোখ দুটোয় অনিশ্চয়তা নিয়ে রানার দিকে তাকাল লিমা।

পাহাড়ি এলাকায় ক্যাম্পিঙের সমস্ত ইকুইপমেন্ট লিমার পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে না, সেটা জানে রানা, ফলে ভারী জিনিসগুলো চুপচাপ নিজের ব্যাকপ্যাকে ঢোকাল ও, লিমা জানলে ক্যাম্পিঙের আনন্দ নষ্ট হবে ভেবে টুঁ শব্দ করল না এ-বিষয়ে। ব্যাকপ্যাক গোছানো শেষে ম্যাপ বের করে লিমাকে দেখাল, কোথায় যাবে ওরা, কোন্ পথ ব্যবহার করবে।

অ্যাজাক্স পর্বতের সামনে দিয়ে উঠবে ওরা, তারপর নামতে শুরু করবে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পিকআপ চালিয়েই অবশ্য যাওয়া যাবে বেশিরভাগ পথ। গাড়ি চালানোর মতো পথ যেখানে শেষ, সেখান থেকে মাইল কয়েক হাঁটতে হবে ওদের, ব্যাকপ্যাক বয়ে নিয়ে উঠতে হবে দু'হাজার ফুট। ওখানে আছে চমৎকার নিরিবিলি, নীল পানির একটা পাহাড়ি হ্রদ, ক্যাম্প করবে ওরা ওই হ্রদের তীরে।

তিন

সকাল হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু পাহাড়-ঘেরা ঢেউ খেলানো উঁচু মাঠে সকালের সোনালী আলোর উপহার নিয়ে সূর্যটা পৌঁছুল অন্তত ঘণ্টাখানেক পর। হালকা হয়ে আসা ঘাসের সবুজ বনে আস্তে আস্তে থাবা বাড়াল পাহাড় টপকে আসা রোদ, দখল করে নিল রং-বেরঙের থোকা-থোকা বুনো হৈমন্তী ফুলের নিজস্ব রাজত্ব। গরম পেয়ে রাতের সামান্য তুষার গলে গিয়ে হালকা একটা বাষ্পের পর্দা ভেসে উঠল প্রশস্ত মাঠের চারপাশে। জঙ্গলের প্রান্ত স্পর্শ করে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা পাহাড়ি ঝর্না থেকে সাতরঙা বাষ্পের কণা উড়ল দক্ষিণ দিকে।

বৃদ্ধের ঘুম-ঘুম ভাবটা হঠাৎ করেই পুরোপুরি দূর হয়ে গেল ঝর্নার বরফ-শীতল পানির স্পর্শে। চামড়া কোঁচকানো ভেজা মুখটা তোয়ালেতে মুছলেন তিনি, দু'হাতের আঙুল দিয়ে আঁচড়ালেন রূপালী সুতোর মতো চুলগুলো। অষ্টাশি বছর বয়স তা মোটেই মনে হয় না বৃদ্ধকে দেখে, মনে হয় বড়জোর সত্তর। শরীরটা এখনও বেশ শক্তপোক্ত, ঋজু; কাঁধ দুটোও ঝুঁকে পড়েনি তাঁর। নিঃসন্দেহে কঠোর নিয়ম ধরে জীবনযাপনের ফল। মুখের গভীর রেখাগুলো নীরবে বলে দেয়, কর্তৃত্বপরায়ণ একজন নীতিবান মানুষ ছিলেন তিনি সারাজীবন।

যত্নের সঙ্গে তোয়ালে ভাঁজ করলেন বৃদ্ধ, কাঁধের উপর তোয়ালে ফেলে জঙ্গলের মাঝে কেবিনটার পথে পা বাড়ালেন।

ঠিক তখনই কিছু একটা নড়তে দেখলেন চোখের কোণে। থেমে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। অনড় পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন। যেখানে নড়াচড়া দেখেছেন, সেখান থেকে সামান্যতম নড়ল না সতর্ক শিকারীর অভ্যস্ত চোখ দুটো।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে খুব সাবধানে ঝর্নার ধারে এসে দাঁড়াল কয়েকশো পাউন্ড ওজনের মর্দা একটা এল্ক্। বৃদ্ধের সঙ্গে ওটার দূরত্ব বিশ ফুটের বেশি হবে না। মানুষের গন্ধ পেয়েছে এল্ক্, দেখে নিল বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। নেই। কান ঘোরাতে ঘোরাতে সাবধানে বিরাট শিংওয়ালা প্রকাণ্ড মাথা নামাল হরিণটা ঝর্নার পানিতে। তৃষ্ণা মেটানোর পর দেরি করল না, ঘুরেই দৌড় দিল জঙ্গলে হারিয়ে যেতে। অরণ্যে ঢুকবার পরেও উপর থেকে কাত হয়ে নেমে আসা সূর্যের সোনালী রশ্মিতে যতক্ষণ ওটাকে দেখা গেল, ততক্ষণ জন্তুটার মখমলের মতো চকচকে চামড়ায় রোদের আঁকিবুকি খেলা দেখলেন বৃদ্ধ।

পাহাড়ি এলাকায় শেষ হয়ে এসেছে বৃদ্ধের অবসর কাটানোর সময়। আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ, তারপর ভারী তুষারপাত শুরু হয়ে যাবার আগেই শহরে ফিরতে হবে তাঁকে। অ্যাসপেন স্কি কর্পোরেশন থেকে সতেরো বছর হলো অবসর নিয়েছেন তিনি, তার পর থেকেই হেমন্তগুলো কাটাচ্ছেন ফটোগ্রাফি করে, বুনো ফুল ও নানারকম ছত্রাকের ছবি তুলে ও তালিকা লিপিবদ্ধ করে।

গম্ভীর, হিসেবী বৃদ্ধের চরিত্রের সঙ্গে এ-ধরনের শখ যেন ঠিক খাপ খায় না, কিন্তু সময়টা চমৎকার কাটে বলে শখটাকে জিইয়ে রেখেছেন তিনি।

ন্যাশনাল ফরেস্ট সার্ভিসের জমিতে তৈরি খনি-মজুরদের পরিত্যক্ত কেবিনটা লিয নিয়েছে স্কি কম্পানি, রিটায়ার করবার পর থেকে ওটা এখন হেমন্ত মৌসুমে তাঁর পছন্দের আস্তানা। স্কি কম্পানির অনুমতি নিয়ে কেবিনটাকে ভিতরে-বাইরে ঢেলে

সাজিয়েছেন তিনি, করে তুলেছেন আরামদায়ক।

বড়সড় চামড়ার ব্যাগে সাবধানে ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট রাখলেন বৃদ্ধ, বিশেষ যত্ন নিলেন ফাঙ্গাসের ছবি তুলতে দরকারী ক্লোযআপ লেন্সগুলো রাখবার সময়। আজকের দিনটা হ্রদের চারপাশের পাথরের খাঁজে-ভাঁজে জন্মানো ছত্রাকের ছবি তুলে কাটাবেন, ঠিক করেছেন তিনি। সারাদিন বাইরে থাকবেন বলে কেবিন থেকে বেরোনোর আগে দুটো স্যান্ডউইচও নিয়েছেন ক্যামেরা-ব্যাগের সামনের পকেটে। ঝর্নার পাড়ে থেমেছিলেন আজকের দীর্ঘ পদযাত্রার আগে ক্যান্টিনে পানি ভরে নেবার জন্য।

মাঝ-দুপুরে হ্রদের তীরে পৌঁছে গেলেন বৃদ্ধ। এতটা পাহাড়ি পথ একটানা উঠে আসা কোনও পাহাড়ি যুবকের পক্ষেও কঠিন। পুরো পথ ছিল চড়াই। ওই আঁকাবাঁকা পথে নীচের মাঠ থেকে আঠারোশো ফুট উঠে এসেছেন তিনি। হেঁটেছেন অবশ্য ধীরে, তবে থামেননি একবারের জন্যও। ধীরে হাঁটলেও কষ্টকর ছিল পর্বতারোহণ।

হ্রদের তীরে যখন পৌঁছুলেন, ততক্ষণে দরদর করে ঘামছেন বৃদ্ধ, বুকের খাঁচায় যেন লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তাঁর। বরাবরের মতোই মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে চাইলেন তিনি, তবে আসলেই সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে ফেলেছে তাঁর শরীরটা।

ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে একটু পরেই, মনকে বুঝ দিলেন তিনি, হ্রদের তীরে পাথরগুলোর ধারেকাছে ছত্রাক আছে কি না দেখতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর এবারের শরীর খারাপ লাগাটা একটু যেন বেশিবেশি। একটা হলদেটে-সবুজ ছত্রাক দেখতে পেলেন তিনি বিরাট এক স্প্রুস গাছের ছায়ায়।

কাঁধ থেকে লেদার কেস নামিয়ে ক্যামেরা ও লাইট মিটার বের করে ক্যামেরায় ক্লোজআপ লেন্স জুড়লেন তিনি। সঠিক এক্সপোযার কত হবে সেটা দেখলেন সতর্কতার সঙ্গে। আগের

চেয়েও বেশি ঘামতে শুরু করেছেন ততক্ষণে। সেনসিটিভ লেন্সটা ছত্রাকের উপর তাক করতে গিয়ে বুঝলেন, কপাল বেয়ে নেমে আসা স্বেদবিন্দুর কারণে দেখতে পাচ্ছেন না স্পষ্ট।

তারপর এলো ব্যথাটা। হঠাৎ, তীব্র, মাত্রাছাড়া—যেন হাত ঘুরিয়ে মুগুরের বাড়ি দিচ্ছে কেউ তাঁর পাঁজরে। ব্যথাটা সামলাতে চেষ্টা করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন বৃদ্ধ, হাত থেকে খসে পড়ল ক্যামেরা। হাঁটু জোড়া আর দেহের ওজন ধরে রাখতে পারল না, কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। অবশ হয়ে গেল শরীর, পড়ে থাকলেন নিথর। শ্বাস নিলেন ঘনঘন, কাঁপা কাঁপা—বুকের ব্যথাটা অচিন্তনীয়, যেন বিকৃত আনন্দে ধীরে ধীরে মুটমুট করে ভাঙছে কেউ তাঁর পাঁজরগুলো। তবুও সামান্যতম কাতরোক্তি বের হলো না বৃদ্ধের মুখ দিয়ে। বিস্ফারিত চোখ দুটো নীরবে যেন বলতে চাইল অনেক কথা, তবে স্বর্গীয় কোনও সহানুভূতি খুঁজল না ওই ব্যথাতুর চোখের দৃষ্টি, খুঁজল নিজের ভিতর থেকে এমন কোনও প্রচণ্ড শক্তিকে, যে-শক্তি শেষ যুদ্ধে তার সেনাপতিকে বিজয়ী করবে। কিন্তু অন্তরের গহীন থেকে এলো না কোনও সাড়া, শুধু ব্যথা—তীক্ষ্ণ, তীব্র ব্যথা! তারপর আস্তে আস্তে কমতে শুরু করল ভয়ঙ্কর ব্যথাটা, কেমন যেন আরামদায়ক একটা প্রশান্তি দখল করে নিল যন্ত্রণাগুলোকে, পালকের মতো হালকা সুখের অনুভূতি যেন বয়ে আনল স্বাধীনতার বার্তা, চির মুক্তির আভাস। হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটো সামান্য বেঁকে গেল বৃদ্ধের, ভাবলেন সেই অদ্ভুত আকর্ষণীয় ছেলেটির কথা। ও যদি নিজের ছেলে হতো, তা হলে সত্যি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারতেন তিনি। কী, যেন নাম ওর? মা...মাসুদ রানা! চোখ বুজলেন বৃদ্ধ। আহা!

তুষার-মোড়া পর্বত-চূড়ার সফেদ-শীতল রাজ্যে, সুনীল আকাশের মোলায়েম চাদর গায়ে দিয়ে, কাঁচের মতো স্বচ্ছ হ্রদের তীরে, সুগন্ধী স্প্রুস গাছের প্রশান্তিময় ছায়ায় নীরবে পরিসমাপ্তি ঘটল সুদীর্ঘ একটি নিঃসঙ্গ যোদ্ধা জীবনের।

চার

খুশিমনে পিকআপের পিছনে বসে আছে হান্টার, যেন বুঝে গেছে, রওনা হচ্ছে ওরা শীঘ্রি। লিমা শপথ করে বলতে পারবে, সারারাত উদ্বিগ্ন রটওয়াইলারটাকে পায়চারি করতে শুনেছে ও।

শহরের মাঝখানে স্কি রান-এর পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়েছে অ্যাজাক্স পাহাড়ের সরু পথ, পাহাড় ঘিরে বড় চক্কর কেটে তারপর উঠে যেতে শুরু করেছে তীক্ষ্ণ বাঁকে বাঁকে।

দু'বছর আগে যখন এসেছিল, এই পাহাড়েই স্কি করেছে লিমা, ফলে বেশ কয়েকটা ঝুঁকিপূর্ণ স্কি-রান চিনতে পারল—ওগুলোতে স্কি করবার সময় অনিশ্চয়তা ও ভয় পেয়ে বসেছিল ওকে। এখন তুষারের নরম আস্তরণ না থাকায় আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক মনে হলো ওসব পাহাড়ি ঢাল।

পাহাড়ে বেশ খানিকটা উঠে যাবার পর নুড়িপাথরে ভরা সরু পথে যতবার তীক্ষ্ণ বাঁক নিল পিকআপ, ততবার পাশের গভীর খাদের দিকে চলে গেল লিমার ভীত দৃষ্টি। ওর ভয় আরও বাড়ল পথের খাড়াই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠায়। কখনও কখনও মনে হলো, পিকআপ ওরকম দেয়ালের মতো খাড়া পথ বেয়ে উঠতে পারবে না, পিছলা প্রাচীরের গা থেকে খসে পড়বে বিপর্যস্ত টিকটিকির মতো।

তবে শেষ পর্যন্ত পিকআপ যখন অ্যাজাক্সের চূড়ায় পৌঁছে গেল, তখন চার হাজার ফুট নীচের সাজানো-গোছানো ছোট্ট শহর

ও চারপাশের পাহাড়ী এলাকার শ্বাসরুদ্ধকর মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল হতবাক লিমা।

পাহাড়ের চূড়া পার হবার পর ওদিকের রাস্তাটাকে রাস্তা না বলে পাথুরে হাঁটাপথ বলাই ভাল। কোথাও কোথাও ওটা এতোই সরু যে, কোনওমতে চলতে পারবে একটা জিপ। দক্ষতার সঙ্গে পিকআপ চালাচ্ছে রানা ওই পথে, নিশ্চিন্ত ভাবটা দেখে মনে হয় এর চেয়ে অনেক বিপজ্জনক পথেও ড্রাইভ করবার অভিজ্ঞতা আছে ওর। কিছুক্ষণ উদ্বেগে ভুগেছিল লিমা, তারপর রানার উপর নির্ভরতা জন্মাল ওর, উপভোগ করতে শুরু করল এই অভিযান ও চারপাশের ছবির মতো সুন্দর মনোহরা প্রকৃতি।

ওই যে দেখা যায় রূপালী সুতোর মতো আঁকাবাঁকা সরু নদী, চলে গেছে কোথায়, কে জানে! ওই তো দাবার সবুজ চারকোনা ছকের মতো খেত-খামার, বাচ্চাদের তৈরি মাটির ঢিবির মতো সবুজ ঘাসের টিলা, ওই যে কোনও লক্ষ্মী মেয়ের সাজানো ছোট ছোট বাড়ি-ঘর—পুতুলখেলার সুনিপুণ আয়োজন।

কিছুক্ষণ পর দু'হাজার ফুট নীচে নেমে আসতেই আকাশ-ছোঁয়া অ্যালপাইন গাছে ভরা চওড়া একটা মাঠে ঢুকল পিকআপ। এখানে এসে প্রশস্ত ও সমতল হয়ে গেল রাস্তা।

'মাঠের শেষে পৌঁছে পিকআপ রেখে যেতে হবে,' লিমার দিকে চেয়ে হাসল রানা। 'বাকি পথ হেঁটে উঠতে হবে আমাদের।'

মাঠের প্রান্ত থেকে ক্রমে উঠে যাওয়া পাহাড়ি হাঁটা-পথের দিকে তাকাল লিমা, বুঝতে চেষ্টা করল মানচিত্রে রানা কোথায় দেখিয়েছিল, ক্যাম্প করবে ওরা । কতখানি উঠতে হবে ওই দুর্গম পথে, সেটা ভেবে দমেই গেল ও একটু। জিজ্ঞেস করল, 'ওই পাহাড়েই উঠতে হবে আমাদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যদি হ্রদের তীরে ক্যাম্প করতে চাও।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লিমার হাসিটা আগের মতো ঝলমলে দেখাল না। 'ম্যাপ দেখে মনে হয়েছিল ওপরে ওঠা খুব সহজ হবে।'

'খুব কঠিনও হবে না,' মৃদু স্বরে বলল রানা। 'তবে তুমি যেতে না চাইলে এদিকেই কোথাও ক্যাম্প করতে পারি আমরা।'

'না,' আপত্তি করল লিমা। 'যেখানে যাব ঠিক করেছি, সেখানেই যাব।'

নিজের প্রাণ-প্রাচুর্য দেখে নিজেই অবাক হলো লিমা। পাহাড়ি পথে হাঁটা বেশ কঠিন, তবে রানা যে-গতি বজায় রাখল, সে-গতিতে এগিয়ে চলা কখনোই অসম্ভব বলে মনে হলো না ওর। তার ওপর ব্যাকপ্যাক যেরকম ভারী ও বেকায়দা হবে মনে করেছিল, সেরকমটাও লাগল না মোটেই। লিমার মনে সন্দেহ জাগল, ওটাতে বোধহয় ইচ্ছে করেই ভারী মালপত্র ভরেনি রানা।

হান্টার চলেছে আপন আনন্দে বিভোর হয়ে, পথ দেখিয়ে আগে যেতে পেরে মহা গর্বিত। পিঠের ভারী প্যাক কোনও অসুবিধেই সৃষ্টি করছে না রটওয়াইলারের। মাঝে মাঝে অনেকখানি সামনে চলে যাচ্ছে ও, রানা-লিমা কোনও বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাচ্ছে ওকে কোনও পাথর কিংবা গাছের আড়াল থেকে উঁকি-মেরে অপেক্ষায় রয়েছে। যেই ও বুঝছে মনিব বা মনিবের বান্ধবী পথ হারায়নি, ওমনি এক ছুটে চলে যাচ্ছে আবার দৃষ্টির আড়ালে।

একটানা তিনঘণ্টা চড়াই ভাঙবার পর লিমার বিশ ফুট সামনে একটা পাথরের উপর থমকে দাঁড়াল রানা। ওখান থেকে ডাক দিল, 'এসে দেখো, লিমা!'

দূরত্বটা পেরিয়ে রানার পাশে দাঁড়াল লিমা সোরেনসন, তাকাল নীচের দিকে।

এবড়োখেবড়ো উঁচু দাঁতের মতো চূড়াগুলো ঘিরে রেখেছে একশো ফুট নীচের সবুজ ঘাসে ছাওয়া অগভীর বাটির মতো জায়গাটাকে। ওখানে পিরিচের বুকের মাঝখানে যেন বসে আছে গাঢ় নীল পানির ওই শান্ত হ্রদ। হ্রদের তীরে পড়ে আছে বড় বড় পাথর। ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে বিশাল সব স্প্রুস গাছ।

রানা ও লিমা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে হ্রদের তীর পর্যন্ত নেমে গেছে সামান্য ঢালু, সবুজ ঘাসে ছাওয়া উর্বর জমি।

শ্বাস আটকে লিমা বলল, 'অদ্ভুত, রানা! সত্যিই, অসাধারণ!'

হ্রদের তীরে পৌঁছে ক্যাম্প ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। রানা যখন তাঁবুর শেষ গজালটা মাটিতে গাঁথল, ততক্ষণে চুলোর চারপাশে পাথরের টুকরো দিয়ে দেয়াল তৈরির কাজ প্রায় শেষ করে আনল লিমা।

নিজের রাজত্বে কর্তৃত্ব দেখানোর ভঙ্গিতে পুরোটা সময় হ্রদের তীরে পায়চারি করল হান্টার। মাঝে মাঝে বিশেষ কোনও পাথর বা গাছের গায়ে প্রস্রাব করে অনুপস্থিত অনাহূত সারমেয়দের জানিয়ে দিল: সাবধান! এটা কিন্তু আমার এলাকা। কামড় খেতে না চাইলে ভুলেও এসো না এদিকে!

ক্যাম্প থেকে শ'খানেক গজ সরে যাবার পর কী যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করল হান্টারের। সতর্ক হয়ে উঠল রটওয়াইলার। থমকে দাঁড়াল ওখানেই, তারপর মনোযোগ দিয়ে তাকাল বিশাল একটা স্প্রুস গাছের গোড়ার দিকে। মাথাটা উঁচু হয়ে গেল ওটার, গলা লম্বা করে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে জিনিসটা কী বুঝে বুকফাটা করুণ বিলাপ করে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল বিষণ্ন আওয়াজটা।

মাত্র গজাল পুঁতে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, ঘুরে তাকাল হান্টারের দিকে। স্প্রুস গাছের দিকে সতর্কতার সঙ্গে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। ভাব দেখে মনে হলো, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

'দাঁড়া, হান্টার!' চিৎকার করে নিষেধ করল রানা। দ্রুত পা বাড়াল ও স্প্রুস গাছের দিকে। ওর পাশে চলে এলো লিমা সোরেনসন।

রানা ও লিমা পৌঁছানোর পর আবার এগোল হান্টার। প্রভুকে পাহারা দিয়ে সামান্য আগে আগে চলেছে।

প্রথমদর্শনে মনে হলো সুগন্ধী স্প্রুসের ছায়ায় গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে আছেন বৃদ্ধ, কিন্তু রানার মনের কোথায় যেন বেজে উঠল বিষাদের সুর। একবার দেখেই ওর মন বলল, বেঁচে নেই পল হাইনরিখ।

অসাড় দেহটার পাশে হাঁটুমুড়ে বসল রানা, বরফ-শীতল কব্জিতে হাত রেখে হৃৎস্পন্দন খুঁজল। নেই। শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, ক'দিন আগে পড়া একটা বইয়ের তথ্যগুলো রানাকে বলে দিল, অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগে চলে গেছেন ওর সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ।

অস্বস্তি ভরে তাকাল লিমা, রানার গম্ভীর, বিষণ্ন চেহারা দেখে বুঝতে পারল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর নেই। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'রানা, উনি বোধহয় বেঁচে নেই?'

দীর্ঘশ্বাস চেপে আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'না।'

'পড়ে গিয়েছিলেন ওপর থেকে, না...' কী বলবে বুঝে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল লিমা সোরেনসন।

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। কোনও হাড় ভেঙেছে বলেও মনে হয় না। বোধহয় হার্ট-অ্যাটাক—স্বাভাবিক মৃত্যু।'

মাটিতে পড়ে থাকা ক্যামেরা ব্যাগ ও ইকুইপমেন্ট-এর দিকে তাকাল লিমা, আবার ওর চোখ স্থির হলো রানার উপর। খানিকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোনও টুরিস্ট, শহর থেকে বেড়াতে এসেছিলেন?'

মাথা নাড়ল বিষণ্ন রানা। 'না। ওঁকে চিনি। মানুষটা জার্মান, বিয়ে করেননি, বছরের এসময়টা একাই থাকতেন পাহাড়ের একটা কেবিনে। মাঝে মাঝে আমাকে দাওয়াত দিতেন ওখানে, রান্না করে খাওয়াতেন, গল্প করতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। বোধহয় নাৎসিদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন—ভয়ঙ্কর সব ঘটনা বলতেন।' আরেকবার লাশটা দেখল রানা, তারপর বলল 'আমরা

যেখানে পিকআপ রেখে এসেছি, ওঁর কেবিনটা তারই কাছাকাছি।'

'কী শান্ত দেখাচ্ছে,' বিস্ময় প্রকাশ করল লিমা। 'মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছেন! বয়স কত হবে ওঁর, সত্তর?'

'সত্তর বছর বয়সে স্কি কম্পানি থেকে রিটায়ার করেন, তারপর পরবর্তী আঠারো বছর বসে থাকেননি বলে ভেঙে পড়েনি শরীর,' বলল রানা। 'রিটায়ার করতেন না, বয়সের কারণে তাঁকে অবসর নিতে অনুরোধ করায় শেষে রাজি হন। বুঝতেই পারছ, ভদ্রলোকের বয়স অষ্টাশি বছর। এখনও স্কি কম্পানিতে কিংবদন্তী হয়ে আছেন মানুষটা।'

রানা ব্যাখ্যা করতে গেল না, তবে ওর মনে পড়ে গেল স্কি কম্পানির সদাগম্ভীর প্রেসিডেন্টের মুখে শোনা একটা ঘটনা।

হেরোইন-সেবী এক স্কিয়ার একবার পাহাড়ের উপর থেকে বেপরোয়া ভাবে নেমে আসতে শুরু করেছিল অসংখ্য শিক্ষানবীস স্কিয়ারের ভিড়ের মাঝ দিয়ে। বিরাট ঝুঁকির মধ্যে তাদের ফেলে দিচ্ছিল সে। ঠিক সে-সময় কোত্থেকে যেন ছুটে আসেন পল হাইনরিখ, পিছন থেকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন নেশাখোরটাকে, তারপর জড়িয়ে ধরে ফেলে দেন তুষারের উপর। দু'জন তাঁরা নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে পাহাড়ের ঢালে গড়াতে গড়াতে নামেন দেড়শো গজ। তারপর পতন থামতেই মারমুখী প্রতিপক্ষকে চুলের মুঠি ধরে একহাতে দাঁড় করান তিনি, আরেক হাতে একের পর এক প্রচণ্ড চড় মেরে বেহাল করে ছাড়েন তাঁর চেয়ে পঞ্চাশ বছরের ছোট সেই তাগড়া জোয়ান যুবকের অবস্থা।

ততক্ষণে নাকি কৌতূহলী স্কিয়ারদের ভিড় জমে গিয়েছিল, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল তারা সত্তর বছর বয়স্ক পল হাইনরিখকে। তারপর হাইনরিখ ওই স্কিয়ারের স্কি কেড়ে নেন, শয়তানটাকে বাধ্য করেন খালি পায়ে তুষারে ঢাকা পাহাড় বেয়ে হেঁটে নেমে যেতে।

'কী করব আমরা এখন?' লিমার প্রশ্নে বাস্তবে ফিরল রানা।

'এখান থেকে লাশ সরাতে হবে তো!'

কাজটা খুবই কঠিন। এক মুহূর্ত পর জবাব দিল রানা, 'ওঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের পিকআপ পর্যন্ত। তারপর শহরে পৌঁছে দিতে হবে।' একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'দু'জনই ফিরে যাব আমরা, না অপেক্ষা করবে তুমি? ...হান্টার পাহারা দিতে পারবে তোমাকে, যদি থাকতে ভয় না পাও।'

আত্মসম্মানে লাগল লিমা সোরেনসনের। বাস্তববাদী মেয়ে ও, ভূত-প্রেত, আধিভৌতিক কোনকিছু বিশ্বাস করে না। জেদের সঙ্গে বলে দিল, 'আমি থাকছি। তুমি লাশ রেখে ফিরে এসো, আমাকে ঠিক এখানেই পাবে।'

সূর্যের দিকে তাকাল রানা। পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। ঘড়ি দেখে বলল, 'শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ফিরে আসার আগে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেব। তার মানে, কাল দুপুরের দিকে ফিরে আসতে পারব আমি।' চিন্তিত দৃষ্টিতে লিমাকে দেখল রানা। 'অবশ্য, সত্যিই যদি রাতে এখানে একা থাকতে চাও তুমি।'

'ও নিয়ে মোটেই চিন্তা করছি না আমি,' অতি দ্রুত বলল লিমা। 'হান্টার তো থাকছেই আমার সঙ্গে। ভাবছি লাশটা পিকআপ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে তোমার কোনও সাহায্য দরকার হবে কি না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'একজন বয়ে নিয়ে গেলে সহজ হবে কাজটা।' অনায়াসে পল হাইনরিখের ভারী দেহটা কাঁধে তুলে নিল ও, হাঁটতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে। ওকে অনুসরণ করল লিমা।

ক্যাম্পে পৌঁছে গাঢ় সবুজ একটা তারপুলিন মাটিতে বিছাল রানা, ওটার মাঝখানে সযত্নে শুইয়ে দিল বৃদ্ধের লাশ, তারপর মুড়ে ফেলল বাড়তি তারপুলিন দিয়ে। এবার তেরপল মোড়া মতদেহ নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল শক্ত করে। আরেকবার

পরীক্ষা করে দেখল গিঁঠগুলো। ঠিকই আছে।

অবাক হয়ে রানার দিকে বারকয়েক তাকাল লিমা সোরেনসন। মনে মনে বলল, ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে আগেও লাশ নাড়াচাড়া করেছে ও! এটা যেন অস্বস্তিকর কোনও কাজই নয়!

কাজ সেরে মোড়ানো লাশটা ডান কাঁধে তুলে নিল রানা, পল হাইনরিখের পেট থাকল ওর কাঁধের উপর, হাঁটুগুলো রানার দু'হাতে শক্ত করে ধরা। শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃদ্ধের মৃতদেহ নাড়াচাড়া করেছে সতর্ক রানা, এ ছাড়া ওর চেহারায় একবারের জন্যও ফুটে ওঠেনি সামান্যতম আবেগ।

'সাবধানে যেয়ো, রানা,' বলল লিমা। যা ঘটল তাতে খানিকটা মুষড়ে পড়েছে। হাসিটা ম্লান দেখাল। অস্বাভাবিক পরিবেশ স্বাভাবিক করবার চেষ্টায় হালকা সুরে বলল, 'তোমাকে নিয়ে চিন্তা করছি না, রানা, তবে কথা হচ্ছে, আমি যে কোথায় আছি, সেটাই কিন্তু জানি না!'

মৃদু হাসল রানা। 'হান্টারের সঙ্গে থেকো, তা হলেই চলবে। বাড়ির পথ চেনে ও।' পা বাড়াতেই ওর পিছু নিল হান্টার। থমকে দাঁড়িয়ে লিমার দিকে আঙুল তাক করে হান্টারের চোখে তাকাল রানা, নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'না, হান্টার। থাকছিস তুই। কালকে দেখা হবে।'

নির্দেশটা বুঝতে পেরে মাথা নিচু করে লিমার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রটওয়েইলার।

রওনা হয়ে গেল রানা।

পাহাড় থেকে নেমে যাওয়াটা সহজ হলো না কাঁধের ভারী ওজনের কারণে। ধীর পায়ে হাঁটছে রানা। কোথাও কোথাও ভূমি-ধসের ফলে পড়ে আছে অসংখ্য আলগা পাথর, ওসব জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল বারকয়েক। পনেরো মিনিট পরপর মৃতদেহটা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে সরাচ্ছে ও,

মাঝে মাঝেই লাশ নামিয়ে বসে বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে কিছুক্ষণ।

শেষ পর্যন্ত পিকআপের কাছে যখন পৌঁছাল, ততক্ষণে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে ওর শরীর। কাফ মাস্‌ল্‌ ও ঊরুর পিছনের আড়ষ্ট মাংসপেশীগুলো শক্ত কাঠ হয়ে গেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমে। আস্তে করে পিকআপের পিছনে পল হাইনরিখের লাশ নামিয়ে রাখল রানা, তারপর খানিকক্ষণ স্ট্রেচিং শেষে মাংসপেশী শিথিল করে নিয়ে সবুজ ঘাসের মাঠে শুয়ে পড়ল বিশ্রাম নিতে।

যখন মাঠ ছেড়ে পিকআপ নিয়ে রওনা হলো, ততক্ষণে রাতের শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে পাহাড়ি এলাকায়।

ধীরগতি পিকআপের হেডলাইট ম্লান হলদে আলো ফেলল পাথুরে সরু পথে। কখনও বা আলোটা পড়ল একপাশের খাড়া পাহাড়ে, আবার মিলিয়ে গেল অন্যপাশের গভীর খাদে। অ্যাজাক্স পাহাড়ের পিছনের পথ ধরে পিকআপ চালিয়ে উঠছে রানা উপরের মালভূমিতে।

তারপর একসময় অ্যাজাক্সের সমতল চূড়ায় উঠে এলো রানা। এতোটা উপর থেকে বিশাল প্রকৃতির সৌন্দর্য সবসময়ই শ্বাসরুদ্ধকর, কিন্তু আজকে বিষণ্নতা দূর হলো না রানার মন থেকে। কী প্রশান্ত, নীরব চারপাশ, অথচ পিকআপের পিছনে লাশ হয়ে পড়ে আছেন পল হাইনরিখ। আর কখনও পৃথিবীর কোনও সৌন্দর্য উপভোগ করবেন না তিনি। কেন হয় এরকম? কী অর্থ জীবনের? সবই কি তা হলে অর্থহীন? শুধুই ক্ষণিকের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়? দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

অ্যাসপেনের দূষণমুক্ত আকাশটাকে ভালবাসে রানা। মাথার উপর কালোর সঙ্গে নীলের মিশেল দেয়া নরম মখমলের চাঁদোয়ার মতো ঝুলে আছে আকাশ, তাতে মিটমিট করছে লক্ষ লক্ষ লাল-নীল-হলুদ নক্ষত্র। চার হাজার ফুট নীচে অ্যাসপেন, রং-বেরঙের হীরের তৈরি ঝলমলে, ছোট্ট, লম্বাটে একটা হার, গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের কোলে। ওখানে সবাই

স্বাধীন, কেউ নাক গলায় না কারও ব্যাপারে, যতক্ষণ না তার নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা ধনী মানুষের অবসর যাপনের জন্য দুনিয়ার বুকে অদ্ভুত সুন্দর এক স্বর্গ। ঘাড় ফিরিয়ে পিকআপের পিছনে তাকাল বিমর্ষ রানা, আনমনে ভাবল, পল হাইনরিখ কি তাঁর স্বর্গ খুঁজে পেয়েছিলেন অ্যাসপেন শহরে?

অ্যাসপেনের হাসপাতালে মাঝরাতের পর পৌঁছুল রানা। ক্লান্ত -অবসন্ন শরীরে ঢুকল রিসেপশনে, তারপর কাঁধ থেকে লাশ নামিয়ে রাখল ইমার্জেন্সি-রুমের টেবিলে।

'কী ওটা?' ধুলোয় ধূসরিত সবুজ তারপুলিনের দিকে বিতৃষ্ণা-বিরক্তি নিয়ে তাকাল ডিউটি নার্স। প্রায় ধমকে উঠল, 'টেবিলের ওপর থেকে নামান ওটা!'

'ওটা একটা মৃতদেহ, মিস,' মেট্রন-মেট্রন চেহারার অস্বাভাবিক লম্বা, মোটা নার্সের দিকে তাকাল রানা, কাঁধ ঝাঁকাল। 'পাহাড়ে ওঁকে পাই আমি। হয়তো চেনেন, ওঁর নাম পল হাইনরিখ। পৌঁছে দিলাম, এবার যা করার করুন আপনারা। ...আমি যাচ্ছি, ঘুমাতে হবে আমাকে।'

'একটু থাকুন, প্লিয,' আগের চেয়ে অনেক নরম স্বরে বলল নার্স। 'ইএমটি-কে ডেকে আনছি, রিপোর্ট লেখার জন্যে বিস্তারিত জানতে চাইবেন উনি।'

'বেশ।' নার্স চলে যাবার পর একটা চেয়ার টেনে ধপ করে বসল রানা।

কয়েক মিনিট পর ঘরে ঢুকলেন কোঁচকানো কাপড়চোপড় পরা ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিশিয়ান, চোখে লেগে আছে ঘুমের রেশ। রানার বক্তব্য শুনবার ফাঁকে তারপুলিন সরিয়ে চোখ বুলালেন তিনি পল হাইনরিখের মৃতদেহে। পরীক্ষা শেষে বললেন, 'একটু থাকতে হবে আপনাকে, মিস্টার রানা। নিয়ম অনুযায়ী পুলিশকে জানাতে হবে আমাদের। তারা আসা পর্যন্ত আপনি থাকলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

রানা সম্মতি দেয়ায় আবারও মৃতদেহের দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। তার আগেই নার্সকে ইশারা করেছেন।

ফোন করল নার্স।

বিরক্তি চেপে বসে থাকল রানা। স্থানীয় পেপার পড়ে অ্যাসপেন পুলিশ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হয়েছে ওর। ধারণাটা ভাল নয়। অদক্ষতার কারণে যদি মেডাল দেয়া হতো, তা হলে নিঃসন্দেহে সবগুলো মেডাল পেত অ্যাসপেন পুলিশ।

কিছুক্ষণ পর রানার সামনে এসে দাঁড়াল ডেনিম জ্যাকেট ও জিন্সের প্যান্ট পরা এক বখাটে চেহারার তরুণ। প্রাথমিক রিপোর্ট করতে তাকেই পাঠানো হয়েছে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে। সঙ্গে রিভলভার ও ব্যাজ থাকায় তরুণকে বেশ গর্বিত মনে হলো। ভারিক্কি একটা ভাব নেবার চেষ্টা আছে তরুণের, কিন্তু কাউবয় হ্যাটের তলা দিয়ে বেরিয়ে আসা জট পাকানো বাদামি চুলের গোছা বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে তার কর্তৃত্বের।

এটা বোধহয় অ্যাসপেন পুলিশের সেরাগুলোর একটা, তরুণকে পকেট থেকে বলপয়েন্ট কলম ও প্যাড বের করতে দেখে ভাবল রানা। টিপ কলমটা কিছুতেই মাথা বের করে থাকতে রাজি হচ্ছে না, পাগলের মতো কলমের গোড়া টিপতে শুরু করল তরুণ অফিসার। লাভ হলো না, প্যাডে ছোঁয়ালেই ভিতরে চলে যাচ্ছে বলপয়েন্ট।

কলমের সঙ্গে না পেরে রেগে গিয়ে ত্যাড়া সুরে রানাকে জিজ্ঞেস করল তরুণ, 'লাশ যখন পাওয়া গেল, তখন পরিস্থিতি কীরকম ছিল সেটা জানান।'

লাল-লাল ফুটকি ভরা জোকারের মতো চেহারার অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'খুব সংক্ষেপে বলছি, কলম লাগবে না আপনার। ওঁকে আমি খুঁজে পাই। একটা গাছের নীচে মারা গিয়েছিলেন—ব্যস।'

তরুণের কোমরে ঝুলন্ত রেডিও খ্যার-খ্যার করে উঠল।

যান্ত্রিক একটা স্বর বলল, রওনা হয়ে গেছেন করোনার। জবাব দেবার জন্য রেডিওর সুইচ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পুলিশ অফিসার, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফেলে দিল হাতের প্যাড ও কলম।

চুপচাপ দরজার দিকে পা বাড়াল রানা, অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছে। পিছন থেকে কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা করল ছোকরা, 'শহর ছেড়ে যাবেন না কোথাও। পরে আপনাকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে পারি আমি।'

জবাব না দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

পাঁচ

জর্জ-টাউন। বিলাসবহুল বাড়িটার রাজসিক মাস্টার-বেডরুমের প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য চৌচির হয়ে গেল টেলিফোনের তীক্ষ্ণ ক্রিংক্রিং আওয়াজে। ঘুম-জড়ানো স্বরে গুঙিয়ে আপত্তি জানাল স্বর্ণকেশী তন্বী যুবতী, তারপর পাশে শুয়ে থাকা মধ্যবয়স্ক পুরুষটির উপর দিয়ে হাত বাড়াল নাইটস্ট্যান্ডে রাখা ফোনের দিকে। তুলে নিল রিসিভার, কানে ঠেকাল। পুরুষটির রোমশ বুক স্পর্শ করল ফোনের প্যাঁচানো তার। যুবতী কিছু বলবার আগেই তার হাত থেকে একটানে কেড়ে নেয়া হলো রিসিভার, মাউথপিসটা শক্ত করে চেপে ধরা হলো থলথলে হাতের তালুতে।

ঘুম-ঘুম গলায় নিচু স্বরে বলল প্রেমিক-পুরুষ, 'শালী, তোকে না কতবার বলেছি ফোন বাজলে তুলবি না!'

জবাবে বিড়বিড় করে কী বলল যুবতী, বোঝা গেল না। পাশ ফিরে চিত হয়ে শুলো সে, মাথাটা এলিয়ে দিল নরম বালিশে, আরামদায়ক ঘুমের আবেশে ডুবে যেতে শুরু করল আবার।

ঘড়ির দিকে তাকাল বিরক্ত প্রেমিক-পুরুষ। সকাল আটটা। কর্কশ শব্দে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে 'হ্যালো' বলল সে মাউথপিসে।

অপরিচিত একটা নম্র কণ্ঠস্বর বলল, 'সিনেটর, রোববার, এই ছুটির দিনে এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনিই বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটলে যেন দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাই।'

'কে?' ফ্যাসফেঁসে স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

নাকি কণ্ঠস্বর বাঁশির মতো মিহি সুরে বলল, 'সিনেটর, আমি জর্জ ডবনি বলছি, অ্যাসপেন থেকে।'

জোরে চেপে চোখের পাতা বন্ধ করলেন সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক, তারপর চোখ খুললেন আবার, খাটাতে চেষ্টা করছেন সারারাতের পরিশ্রান্ত, ঘুম-কাতুরে মগজটাকে। তারপর অ্যাসপেন থেকে ফোন আসবার তাৎপর্য মাথায় ঢুকল তাঁর। জর্জ ডবনি—শেরিফের ডেপুটি—পল হাইনরিখের ব্যাপারে খোঁজ রাখবার জন্য পয়সা দেয়া হয় তাকে নিয়মিত—বলা হয়েছিল, ব্যাপারটার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত।

'হ্যাঁ, জর্জি, কী ব্যাপার?' সিনেটরের কণ্ঠে এবার বন্ধুত্বের ছোঁয়া, আন্তরিক সুরটা বলে দিল, তিনি ডবনির সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ, তবে মূল বিষয় দেরি না করে তাঁকে জানানোর তাগিদটা বুঝতেও দেরি হবে না কারও।

সিনেটরের কাজে আসতে পেরে খুশি-খুশি স্বরে ডেপুটি জানাল, 'ওই বুড়ো ...পল হাইনরিখ ...গতকাল মারা গেছে সে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন সিনেটর গ্রুসাক, তারপর ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত, নিঃশব্দ হাসিতে চওড়া হতে শুরু

করল তাঁর ঠোঁট। 'খুব দুঃখজনক! খুবই দুঃখজনক! আশা করি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তার?'

'জী। করোনার বলেছেঃ হার্ট অ্যাটাক। মারা যাবার কয়েক ঘণ্টা পর পাহাড়ে পাওয়া যায় তাকে। অন্তত এখন পর্যন্ত সে-রকমটাই ধারণা করা হচ্ছে।'

'খবরটা জানানোর জন্যে সত্যি অনেক ধন্যবাদ জর্জি,' নরম স্বরে বললেন সিনেটর। 'উপকারটা আমি ভুলব না।'

লাইনের অন্যদিকে সামান্য ইতস্তত করল ডেপুটি, তারপর বলল, 'আসলে... আমি... ভাবছি আমাকে বোধহয় আর দরকার নেই আপনার?' বাড়তি দুশো ডলার আসাটা বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মনটা খারাপ তার।

'আর দরকার পড়বে না, জর্জি,' বললেন সিনেটর, বুঝতে পারছেন, লোকটা আসলে কী শুনতে চায়। এবার বললেন, 'আমাদের এতদিনের এই সম্পর্কের কথা মনে রেখে একটা বোনাস পাঠানোর ব্যবস্থা করছি আমি। ওটা অর্জন করেছেন আপনি।'

'আবার কী দরকার বোনাসের, সিনেটর!' বলল ডেপুটি ডবসন। তার কণ্ঠস্বর বলে দিল, যা বলছে, সেটা তার মনের কথা নয়।

'না, আমি চাই আপনি বোনাসটা নিন। আমরা খুশি, ভাল কাজ দেখিয়েছেন আপনি।'

এবার কোনও প্রতিবাদ করা হলো না সিনেটরের কথায়।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সিনেটর গ্রুসাক, বড় করে শ্বাস টানলেন বুক ভরে, তারপর সশব্দে ছাড়লেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। অর্ধ-শতাব্দী ওই হারামজাদা পল হাইনরিখের খপ্পরে থাকার পর অবশেষে সত্যিই তা হলে মিলল মুক্তি! স্বস্তির উপলব্ধিটা হুড়মুড় করে এলো না, ধীরে ধীরে অনুভব করতে শুরু করলেন, বিরাট একটা ওজনদার পাথর যেন সরে যাচ্ছে তাঁর বুকের উপর থেকে।

বাবা ও তাঁর দুই সহযোগীর সেই মারাত্মক ভুলের ফলে যে ক্ষুরধার গিলোটিনের তলায় এতদিন মাথা পেতে রাখতে হয়েছিল তাঁকেও, সে-গিলোটিন ধ্বংস হয়ে গেছে, চিরতরে দূর হয়ে গেছে তাঁর অস্তিত্বের জন্য ভয়ানক হুমকি, সেই চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টিকারী সাক্ষাৎ শয়তান পল হাইনরিখ। পিশাচটার একপলকের হার্ট-অ্যাটাক ও মৃত্যু তাঁর তৈরি তাসের ঘরটাকে বদলে দিয়েছে সুদৃঢ় একটা অজেয় দুর্গে। প্রতিনিয়ত আর ভয়ে ভয়ে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই, আতঙ্কের খোঁচা খেতে হবে না ওই শয়তানটার কথা মনে এলে—পরিষ্কার বুঝতে পারছেন সিনেটর গ্রুসাক, এবার তিনি পরিস্থিতির উপর সত্যিই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চলেছেন। দু'একটা আলগা সুতো হয়তো রয়েছে, কিন্তু ওগুলোতে গিঁঠ দেওয়া যাবে না, এমন নয়। ঘড়ির দিকে আবার তাকালেন সিনেটর। আটটা দশ। তার মানে ফিনিক্সে এখন পাঁচটা দশ। ব্যারি ক্যাসল জানতে চাইবে খবরটা।

ঘাড় ফিরিয়ে কিং সাইয বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে থাকা স্বর্ণকেশী যুবতীর দিকে তাকালেন তিনি। মনে মনে বললেন, চেহারাটা নায়িকাদের মতো হলেও তুই শালী বুদ্ধু একটা বেয়াক্কেলে মেয়েছেলে। মেথরানী হওয়া উচিত ছিল তোর! হারামজাদী যদি ফোন ধরে কথা বলত, আর ফোনটা করত জেন, তা হলে এক সপ্তাহ পেরোনোর আগেই ডিভোর্স মামলায় আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হতো তাঁকে। পা ঘুরিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে উঠল সিনেটরের, সেই সঙ্গে তালুতে চাপচাপ ব্যথা মনে করিয়ে দিল গতরাতের প্রেমসিক্ত পার্টির কথা। ফুটবলের মতো গোল ভুঁড়ির উপর মখমলের নাইটগাউনের ফিতে বাঁধলেন তিনি, বেডরুম থেকে বেরিয়ে চলে এলেন স্টাডিতে। এখন তিনি যা বলবেন, সেটা তাঁর প্রাইভেট ফোন থেকে বলতে চান।

পাঁচ সেকেন্ড পেরোবার আগেই ঘুমের রেশ কাটিয়ে উঠলেন মেগা

ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাকের কথামত ফোনের স্ক্র্যাম্বলারটা অ্যাকটিভেট করতেও দেরি হলো না তাঁর। পল হাইনরিখের মৃত্যু-সংবাদে আন্তরিক খুশি হলেন, কিন্তু সিনেটরের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি, ভুলেও ভাবলেন না যে, বিপদ কেটে গেছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ও যখন মরল, তখন পাশে কেউ ছিল, ফ্রেড?' ভাবছেন, শয়তানটা মরবার আগে কাউকে কিছু বলে গেছে কি না।

'না। নির্জন পাহাড়ে পাওয়া যায় ওকে। মরে কাঠ।'

'ভাল,' চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করলেন ব্যারি ক্যাসল, তারপর বললেন, 'শহরে ওর বাড়ি আর পাহাড়ে ওর ওই কেবিনে লোক পাঠিয়ে দেব খুঁজতে। কোনও কিছু লুকানো থাকলে নিয়ে আসবে।'

'আরে, শালা মরেছে, ব্যারি,' উৎসাহের সঙ্গে বললেন সিনেটর গ্রুসাক, 'এত ভাবছ কেন! আমাদের ছুঁতে পারে, এমন কেউ নেই আর।'

একমত হতে পারলেন না ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, তবে ফ্রেডারিক গ্রুসাকের সঙ্গে আপাতত এ নিয়ে তর্ক করতে সায় দিল না তাঁর মন। বললেন, 'ঝামেলা মিটে যাবার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে ঘটনা, এটা ঠিক, ফ্রেড; তবে সবকিছু ঠিক আছে জানার আগে সেলিব্রেট করব না আমি।'

বিজনেস পার্টনারের হিসেবী আচরণে খানিকটা নিরুৎসাহিত হলেন সিনেটর গ্রুসাক। আগের চেয়ে সংযত স্বরে বললেন, 'যা ভাল মনে করো। তবে আমার ধারণা বিপদ আসলেই কেটে গেছে।'

ব্যারি ক্যাসল জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের জজ সাহেবটিকে জানিয়েছ খবরটা?'

'না। জানাব।' অন্য একটা বিষয় মনে পড়ে যাওয়ায় প্রসঙ্গ পাল্টালেন সিনেটর, 'ও আরেকটা কথা. কর্পোরেশনের খরচ

বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছ?'

'আগামীকাল সকালে তোমার ডেস্কে পৌঁছে যাবে রিপোর্ট।'

'ঠিক আছে,' হাই চাপলেন সিনেটর গ্রুসাক। 'অ্যাসপেনে কিছু পাওয়া গেলে জানিয়ো আমাকে। তবে আমি কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি... আমার মন বলছে, এই ঝামেলা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলেছে আমাদের।'

'সেটাই নিশ্চিত হতে চাইছি,' জবাবে বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'পরে যোগাযোগ করব।' ফোন রেখে দিলেন তিনি।

সিনেটরের মতো দুই আর দুইয়ে সবসময় চার হয়, তা বিশ্বাস করেন না ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। মাথা-মোটা, আবেগ-প্রবণ জনতাকে নিয়ে 'দেখো, আমি কত ভাল—দেখলে, আমি কত ভাল' ধরনের কাঁচা খেলায় নামেন না তিনি। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, পল হাইনরিখের মতো এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ, অভিজ্ঞ লোকের তৈরি জটিল সমস্যা এতো সহজে মিটে যায় না। বড় সমস্যা সবদিক থেকে সুচারু ভাবে সামলাতে হলে চাই সতর্ক নজর—দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।

একরোখা, খুঁতখুঁতে মানুষ ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, সহজে কারও সঙ্গে একমত হন না। ক্ষমতা রাখেন দুরূহ সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে সমস্ত সমস্যা নিমেষে দূর করবার। তাঁর স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। আর সবাই অনুল্লেখযোগ্য যেসব আপাত সাধারণ ঘটনা বেমালুম ভুলে যায়, সেগুলোও মনে থাকে তাঁর। ...আর পল হাইনরিখের মৃত্যু সাধারণ কোনও অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। এটা ধরে নেবার কোনও কারণ নেই যে, লোকটার মৃত্যু সমস্ত হুমকির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। পল হাইনরিখ সম্বন্ধে তিনি যা জানেন—কম জানেন না—বুড়ো শয়তানটা নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরেও চরম কোনও আঘাত হানবার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিখুঁত কোনও পরিকল্পনা থাকবেই পল হাইনরিখের মতো বুদ্ধিমান লোকের।

শাওয়ার-শেভ সেরে প্ল্যান্টের সিকিউরিটি সেকশনে ফোন করলেন ব্যারি ক্যাসল। রোববার সকাল ছ'টায় ফোনে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেও সামান্যতম অবাক হলো না সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের ডিউটি অফিসার। তার জানা আছে, চার বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে মিস্টার ক্যাসলের, তার পর থেকে কর্পোরেশনটাকে ঘিরেই তাঁর সমস্ত জগৎ। সপ্তাহে কম করেও সত্তর ঘণ্টা সময় দেন তিনি কর্পোরেশনের কাজে।

ত্রস্ত সিকিউরিটি অফিসার জানাল, 'ব্রিম হার্টসেলকে লোকেট করে মেসেজটা এক্ষুনি জানিয়ে দিচ্ছি আমি, মিস্টার ক্যাসল।'

ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ করে এনেছেন ব্যারি ক্যাসল, এমন সময় সুইমিং-পুল প্যাটিওতে ব্রিম হার্টসেলকে নিয়ে এলো হাউস-কিপার।

পুরুষ চিতার মতো সাবলীল, দৃঢ় পদক্ষেপে মিস্টার ক্যাসলের টেবিলের দিকে হেঁটে এলো ব্রিম হার্টসেল।

হাতের ইশারায় তাকে উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন মিস্টার ক্যাসল, কফি ঢেলে নিলেন কাপে। 'তোমার হেলিকপ্টার রেটিং আপটুডেট, ব্রিম?'

ছোট্ট করে মাথা দোলাল হার্টসেল। 'ইয়েস, সার।'

'আজ সকালে কাজ আছে তোমার।' খুব সাবধানে লিনেনের মাল দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছলেন ব্যারি ক্যাসল।

হার্টসেল জানে, মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এখন তাকে। বক্তব্য শুনবার সময় মিস্টার ক্যাসলের উপর থেকে একবারের জন্যও তীক্ষ্ণ দু'চোখ সরল না তার।

ব্রিম হার্টসেল ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, দেহের গড়নটা চিকন, কিন্তু মাংসপেশীগুলো ইস্পাতের তারের মতো শক্ত। সিআইএ থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেবার পর একদিনের জন্যও এক্সারসাইয ছাড়েনি, ফলে তাকে দেখলে মনে হয়, শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তির ছটা। মুখটা লম্বাটে তার, বাজপাখির সঙ্গে কোথায় যেন

মিল আছে। থুতনিটা রূপকথার ডাইনীদের মতো অস্বাভাবিক ছুঁচাল, চেহারায় কোনও পরিবর্তন এলে চোয়ালের দু'পাশে সরু সরু সাপের মতো কিলবিল করতে থাকে পাকানো পেশী। সবটা মিলিয়ে প্রথমদর্শনেই ব্রিম হার্টসেলকে মনে হয় ঠাণ্ডা, সতর্ক, বুদ্ধিমান, আত্মবিশ্বাসী একজন অভিজ্ঞ মানুষ।

পাঁচ বছর আগে স্পেশাল সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট পদে তাকে চাকরিতে নিয়েছেন ব্যারি ক্যাসল। বরাবরের মতোই, ভুল করেননি মানুষ চিনতে।

চাকরি-জীবনে কোথাও কোনও দাগ নেই প্রাক্তন ফাইটার-জেট পাইলট, প্রাক্তন সিআইএ ফিল্ড-এজেন্ট ব্রিম হার্টসেলের। ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজের উপর স্পেশাল ট্রেনিং আছে তার। সক্ষম, দক্ষ, পুরোপুরি বিশ্বস্ত, অনুগত একজন কর্মকর্তা; এমন এক মানুষ, যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে নিজের দেহ-মন-সত্তাকে।

পল হাইনরিখের সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানে না সে, জানবার কোনও কৌতূহলও কাজ করে না তার মাঝে।

'আমি চাই হেলিকপ্টারগুলোর একটা নিয়ে যত দ্রুত পারো অ্যাসপেনে যাবে তুমি। গতকাল মারা গেছে পল হাইনরিখ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সার্চ করার আগেই ওর বাড়ি আর কেরিন পরিষ্কার করে আসতে হবে তোমাকে। চিঠি, বা অন্য যে-সব কাগজপত্র পাও, নিয়ে এসে আমাকে দেবে তুমি। ফটোগ্রাফ, প্যাড, মেমো, ডায়রি—সব। প্রয়োজন মনে করলে ওই লোকের বাড়ি-ঘরের দেয়াল ভেঙে নামিয়ে খুঁজবে। মনে রেখো, বাজারের ফর্দও যেন না পাওয়া যায় পরে।'

'জেসন ট্রটম্যানকে নিয়ে যাব সঙ্গে,' বলল হার্টসেল। ঘড়ি দেখল। 'আশা করি এক ঘণ্টা পেরোনোর আগেই রওনা হতে পারব।'

জেসন ট্রটম্যানের নামটা শুনেই অস্বস্তির ছাপ ফুটল ব্যারি

ক্যাসলের চোখে, বিরক্ত স্বরে বললেন, 'ওই বেঁটে, পিচ্ছিল, নোংরা টিউমারটাকে সামলে রেখো। আমাদের দিকে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে, এমন কিছু যেন করে না বসে ওটা।'

সিআইএ-র প্রাক্তন টর্চার-ম্যান বেঁটে-বামন জেসন ট্রটম্যান গত ছয় বছর ধরে ব্রিম হার্টসেলের ডানহাত। নিজের বিরাট অঙ্কের বেতন থেকে ছোট্ট একটা অংশ দেয় তাকে হার্টসেল। অবশ্য না দিলেও চলত। তার সঙ্গে থাকতে পারবে, সেটাই কুকুরের মতো প্রভুভক্ত ট্রটম্যানের জন্য যথেষ্টরও বেশি। হার্টসেলের সার্বক্ষণিক সঙ্গ পাবার শর্ত একটাই, হার্টসেল যা বলবে, বিনা প্রশ্নে তা-ই করতে হবে ট্রটম্যানকে। যে-কোনও কিছু। এবং করেও সে খুশিমনে। যে-কারণে ব্যারি ক্যাসল এখনও সহ্য করছেন অর্ধোন্মাদ পিশাচটাকে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আলাপ প্রায় কখনোই করে না ব্রিম হার্টসেল, কিন্তু একবার মিস্টার ক্যাসল জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, স্ত্রী ও দুই ছেলেকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড হতে যাচ্ছিল ট্রটম্যানের, নিজের সরকারী প্রভাব খাটিয়ে ট্রটম্যানকে বাঁচিয়েছিল সে; যে-কারণে প্রাক্তন স্ত্রীর কবর খুঁড়ে পচা-গলা লাশটার বুক চিরে, কলিজা ছিঁড়ে বের করে সেটা কামড়ে খাওয়ার ফাঁকে শপথ করেছিল জেসন ট্রটম্যান, জীবনে কখনও অবাধ্য হবে না সে হার্টসেলের। কথা রেখেছে মানসিক রোগী জেসন ট্রটম্যান, বনে গেছে সে ব্রিম হার্টসেলের দ্বিতীয় ছায়া।

জেসন ট্রটম্যানই ব্যারি ক্যাসলের দেখা একমাত্র মানুষ, যে ব্যথা দিতে পারলে নিখাদ আনন্দ পায়। মানুষের যত বেশি যন্ত্রণা হবে, তার তত আনন্দ। বড়জোর চার ফুট সাত ইঞ্চি হবে লোকটা দৈর্ঘ্যে, কিন্তু ঠিক একটা গরিলার মতো চওড়া, শক্তিশালী শরীর। পেশল হাতের তালু দুটো হাঁটুর নীচে ঝোলে। বিস্ফারিত লালচে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে সর্বক্ষণ। ম্যানিয়াকটার ঠোঁটে প্রায় সারাক্ষণই লেগে আছে বিকৃত আনন্দের পৈশাচিক বাঁকা

হাসি। এক কথায়, জেসন ট্রটম্যান বদমেজাজী এক ভয়ানক চরিত্রের স্যাডিস্ট—প্রয়োজনের সময় নির্ভরযোগ্য এক নিষ্ঠুর মারণাস্ত্র। ব্রিম হার্টসেলের সাপের মতো শীতল আপাত শান্ত ব্যক্তিত্বের চরম বিপরীত ওই জেসন ট্রটম্যান।

চেয়ার ছাড়ল ব্রিম হার্টসেল। 'আমি দেখব, যেন পরিস্থিতি বুঝে চলে ও।'

'ফিরে এসেই আমাকে রিপোর্ট করবে,' কফির কাপে চুমুক দিলেন ব্যারি ক্যাসল।

ছয়

'হাইয়া, রানা!' রাস্তার ওপাশ থেকে পরিচিত দরাজ কণ্ঠস্বরটা বিকট হুঙ্কার ছাড়ল। আশপাশে চড়ুই পাখি থাকলে নির্ঘাত হার্টফেল করত।

তাকানোর আগেই মাসুদ রানা জেনে গেল, কে অমন প্রাণখোলা ডাক ডাকতে পারে।

ছোটখাটো, হালকা-পাতলা ভুলোমনের মানুষটা যেন অন্তরের গহীনের ছন্দবদ্ধ সুরলহরী শুনে আনন্দে নাচতে নাচতে রাস্তা পার হতে শুরু করল। রাস্তায় লোক চলাচলের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে চোপসানো স্টিক টানছে সে, গাঁজার ধোঁয়া ছাড়ছে ভুস-ভুস করে।

দাঁড়িয়ে পড়ল সে মাঝ-রাস্তায়, বিরাট হাঁ করে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া ছেড়ে হাত তুলে থামতে ইশারা করল একটা চলন্ত

গাড়িকে। ড্রাইভার থামতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে পিছাল এক পা, তারপর মহা খেপে গিয়ে বিশেষ একটা ইশারা করে হাত ঝাঁকাল সামনে-পেছনে। ইঙ্গিতটার মানে যারা জানে, ব্যোম খ্যাপা খেপে যাবে তারা; যারা জানে না, তারা মনে করবে ওটা মুঠো পাকিয়ে পাশ থেকে মারতে চাওয়ার ভঙ্গি—সেটাও আপত্তিকর। অগ্রসরমান গাড়ির ড্রাইভার জানে না ওই ইশারার অর্থ, যে-কারণে গাড়ি থেকে নেমে এসে মারামারিতে না জড়িয়ে বিরক্ত হয়ে চলে গেল বারকয়েক হর্ন বাজিয়ে।

পরিচয়টা দীর্ঘদিনের না হলেও এগিয়ে আসা আত্মভোলা, ফুর্তিবাজ, আধপাগলা, সরল মানুষটাকে ভাল করেই চেনে রানা। চার্লস রবিনসন ইরাক যুদ্ধ-ফেরত প্রাক্তন নন কমিশন্ড অফিসার—কর্পোরাল। ইরাকে আগ্রাসী মাতৃভূমি আমেরিকার পাঠানো সহযোদ্ধাদের বর্বর নিষ্ঠুরতা সইতে না পেরে এক পর্যায়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল মানুষটা। সরকারী খরচে মানসিক চিকিৎসার পরেও পুরোপুরি সুস্থতা ফিরে পায়নি আর। শেষে অন্যায় যুদ্ধে আর কখনও ব্যবহার করা যাবে না বুঝে আর্মি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয় রবিনসনকে। আতঙ্কজনক স্মৃতির কবল থেকে রক্ষা পেতে গাঁজা ধরেছিল বেচারা, গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

চার মাস আগে দুশো তিরিশ পাউন্ড ওজনের এক মহা ক্ষিপ্ত দানব কাউবয়ের খপ্পর থেকে চার্লস রবিনসনকে উদ্ধার করে রানা, দু'জনের পরিচয়টা হয় তখনই। কাউবয় ঠিক করেছিল, কিলিয়ে মাংসের পিণ্ড বানাবে রবিনসনকে।

কারণও ছিল তার, কাউবয়ের ঝকঝকে নতুন মোটর-সাইকেলটা ইচ্ছে করলেই যে-কেউ চালিয়ে বেড়াতে পারে, ধরে নিয়েছিল খেয়ালী চার্লস রবিনসন। একটা কিছু ধরে নিলে সেটা সহজে ছাড়তে পারে না তার অসুস্থ মস্তিষ্ক, কাজেই বিনা দ্বিধায় মোটরসাইকেলের পাশে থেমে পড়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দেয় সে। ইচ্ছে

ছিল, ঘুরে আসরে এক পাক।

তবে সিট থেকে ঘাড় ধরে তাকে শূন্যে তুলে নামায় ওই বিশালদেহী কাউবয়। ঘটনা ওখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু বিরক্ত কাউবয়কে বিনে পয়সায় বাছাই করা কিছু গালাগাল উপহার দেয় অপমানিত রবিনসন। ফলাফল: ফুটপাথের সঙ্গে রবিনসনকে চ্যাপ্টা করতে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে ক্রোধোন্মত্ত কাউবয়।

কেউ ওই পর্বত-প্রমাণ কাউবয়ের মোকাবিলা করতে সাহস পায়নি, চুপচাপ দেখছিল কী ঘটে। মার খেয়ে মারাত্মক আহত হয়ে বেহুঁশ অবস্থায় হাসপাতালে যেতে হতো পাগলা রবিনসনকে, কিন্তু মাইকেলের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে নাক গলায় মাসুদ রানা। নিজেও বলতে পারবে না, হাতাহাতি লড়াইয়ে ওর কী কী সব কৌশলে যেন পরাস্ত হয় ওই কাউবয়—আট পা বাঁধা অক্টোপাসের মতো করুণ অবস্থা হয়েছিল লোকটার: চোখ দুটো ছাড়া নড়াতে পারছিল না আর কিছু।

রানা যখন দানবটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে, তখন মোটরসাইকেলের পাশে চলে যায় রবিনসন, রক্তাক্ত, থেঁতলানো মুখটা ডানহাতের চেটোয় মুছে নিয়ে এক লাথিতে কাত করে ফেলে দেয় কাউবয়ের ওই ঝকঝকে নতুন মোটরসাইকেল।

এই ঘটনার পর আরও দশ মিনিট রানা ব্যয় করে ছটফটরত কাউবয়কে বোঝাতে যে, রবিনসনকে এই মুহূর্তে খুন করাটা তার ঠিক হবে না মোটেই।

শেষ পর্যন্ত রানা যখন কাউবয়কে বুঝিয়ে-শুনিয়ে খানিকটা শান্ত করে, কীসের যেন হোল্ড, সেটা থেকে ছেড়ে দেয়, এখানে ওখানে আঁচড় ও ট্যাপ খাওয়া মোটর-সাইকেলের কাছে চলে যায় কাউবয়, চোখ দিয়ে তখন টপটপ করে জল পড়ছিল তার, লজ্জা ভুলে হাউমাউ করে কেঁদেই ফেলত সে আশপাশে অত লোকজন ভিড় করে না থাকলে।

বিপর্যস্ত, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় কাউবয় ভয়ানক কোনও চরম

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবার আগেই তাড়াতাড়ি রবিনসনকে নিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ে রানা।

রবিনসনের প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল রানাকে, 'নামটা কী তোমার, বাপু? নাম যা-ই হোক, মানুষটা কিন্তু তুমি ভালো!' এরপর রানার কাঁধে হাত রেখে বলে সে, 'তুমি যদি বন্ধুত্ব করতে চাও, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি। হ্যাঁ, একশো পার্সেন্ট রাজি।'

ওই ঘটনার পর একদিন নিজের পড়ো-পড়ো চেহারার ভাড়া করা কুটিরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনমাসের বাচ্চা রটওয়াইলারটাকে রানার হাতে তুলে দিয়েছিল চার্লস রবিনসন, বলেছিল, 'তুমি ওকে নিয়ে নাও, মাসুদ। দেখো, ঠকবে না, বুক-ভরা ভালবাসা দিয়ে তোমার মন জয় করে নেবে ও।'

সত্যি, অদ্ভুত রিকি রবিনসনের ট্রেইনিং দেয়া হান্টার আসলেই হৃদয় জয় করে নিয়েছে রানার।

খাতির হয়ে যাবার পর রানার বাংলোয় মাঝে মাঝেই আসে রবিনসন, হাতে করে সবসময় নিয়ে আসে কিছু না কিছু। বহু যত্নে নিজ হাতে চাঁছা নক্সা খোদাই করা উইলো ডালের মজবুত লাঠি, হরিণের চামড়া নিয়ে তৈরি চমৎকার স্যান্ডেল—এসব। কয়েকবার এমনও হয়েছে, অনেক রাতে দেরি করে নিজের বাংলোয় ফিরে ক্লান্ত রানা দেখেছে, জানালা-পথে কখন যেন ঘরে ঢুকে বসে আছে রবিনসন, রান্না সেরে ফেলে অপেক্ষায় আছে ওর জন্য। রানা আসতেই বলেছে, 'দাওয়াত দিলাম কখন, আর এলে কখন, দোস্ত!'

'দাওয়াত দিলে মানে? কবে? কখন?' রানা অবাক।

'এই তো একটু আগে, মনে মনে,' বলেই হা-হা করে হেসেছে রবিনসন প্রাণখোলা হাসি।

টুকটাক যন্ত্রাংশ বদলে রানার পিকআপ-এর ইঞ্জিনটাও একেবারে নতুনের মতো করে দিয়েছে রবিনসন।

এই মানুষটাকে একবার দেখেই বুঝেছে রানা, যাকে একবার বন্ধু মনে করে, তার জন্য জান দিতেও ওর আপত্তি নেই। প্রায়ই পাগলা রবিনসনকে পাকড়াও করে রানা, গল্প করে ওর সঙ্গে।

মাঝে মাঝে দু'দশ ডলার ধারও নেয় রবিনসন।' আসল উদ্দেশ্য, ধারের টাকা শোধের উসিলায় আবার রানার সঙ্গ পাওয়া। ও বুঝে নিয়েছে, ওরই মত অসহায় এই শক্তিশালী, বড় মনের মানুষটা; স্মৃতি ভুলে গিয়ে ওরই মত আধপাগলা অবস্থা। তাই রানাকে দেখেশুনে রাখা ও তার নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। চেষ্টা করে মানুষটা যেন দুঃখ না পায়।

পাগলা রবিনসন আছে গাঁজার নেশায় তৈরি ওর কল্পনার আপন জগতে।

প্রায়ই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাংলোয় এনে রাখে রানা ভুলোমনা রবিনসনকে, ভাল-মন্দ খাওয়ায় আর শোনে ইরাক যুদ্ধের ভয়ঙ্কর সব বর্ণনা। মাঝে মাঝে রানার কোমল মনটা বলে, চলে যাই না কেন ওখানে, লড়াই করি না কেন নির্যাতিত ওই জনগোষ্ঠীর হয়ে? অশান্ত মনটাকে সান্ত্বনা দেয় ও, আমি যে তেমন উপযুক্ত লোক নই, লড়তে যে জানি না আমি!

'এক্কেবারে ঠিক সময়ে তোমাকে পেয়েছি, রানা,' রানাকে দেখে বরাবরের মতোই ঝলমল করে উঠল চার্লস রবিনসনের হাসিমুখ। 'ঠিক সাতটা বাজে। নাস্তার জন্যে সকাল সাতটার কোনও তুলনা হয় না, কি বলো? ...হয়ে যাক, দোস্ত, আজকে আমার তরফ থেকে?'

'নাস্তায় রাজি আছি, তবে আজকে বিশেষ একটা দিন, চার্লি, খাওয়াব কিন্তু আমি,' বলল রানা। পাহাড়ে লিমা সোরেনসনের কাছে ফিরে যাবার প্রস্তুতি শেষ করে বাংলো থেকে অ্যাসপেন শহরের মাঝখানে মাইকেলের রেস্টুরেন্টের সামনে এইমাত্র পৌঁছেছে ও। 'আজ বরং আমার তরফ থেকে হয়ে যাক, চার্লি? ...ঠিক আছে?' সরল-সোজা, হাসি-খুশি, ফুর্তিবাজ রবিনসনের

চওড়া, আন্তরিক হাসিটা দারুণ ছোঁয়াচে—হেসে ফেলল রানাও।

রানার কাঁধ জড়িয়ে ধরল চার্লস রবিনসন, বলল, 'ঠিক আছে, ফেলে তো আর দিতে পারি না তোমার কথা! বেশ, দোস্ত, আজকে বরং তুমিই খাওয়াও। ...গতকাল তোমাকে পিকআপ নিয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখলাম। সঙ্গে হান্টার আর অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়েও ছিল।'

লিমা সোরেনসন, ওদের ক্যাম্পিং ও পল হাইনরিখের মৃত্যুর কথা চার্লিকে জানাল রানা।

'ও, আমি তো চিনি ওই বুড়ো মানুষটাকে,' বলল রবিনসন। 'শহরের পশ্চিম দিকে থাকত, তা-ই না? আমাকে ডেকে নিয়ে মাঝে মাঝেই যুদ্ধের গল্প করত। আমাকে বলেছিল, তার একটা দারুণ ক্যামেরা আমাকে দিয়ে দেবে। জাস্ট উপহার ওই যে... ভিক্টোরিয়ান ওই বাড়িগুলোর একটায় একা থাকা সেই পল হাইনরিখ না? ...পাহাড়ে মরল মানুষটা? আহা!' রানার প্লেটের সামনে রাখা দুধের গ্লাসটা আনমনে হাতে তুলে নিল পাগলা রবিন, তারপর এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিল পানীয়টুকু।

'একদিন তোমাকে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরতে যাব,' প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল রানা। 'দারুণ সব জায়গা চিনে ফেলেছি, পাগল হয়ে যাবে গেলে।'

'সত্যি সত্যিই না আবার পাগল হয়ে যাই,' আতঙ্কিত মুখভঙ্গি করল রবিনসন। 'পাহাড়-টাহাড়ে ওঠা আমার মোটেই ভাল লাগে না। যা কষ্ট! শেষে ফুসফুস ফেটে মরেই যাব!'

খাওয়া শেষে অন্য কাস্টমারদের বিরক্তির উদ্রেক করে বিকট আওয়াজে ঢেকুর তুলল রবিনসন, মানুষের তিক্ত চাহনি বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে!' চোখ পিটপিট করে এবার রানার চোখে তাকাল সে, 'কয়েকটা ডলার ধার দিতে পারবে, দোস্ত?'

এখুনি খাওয়ানোর অফার, আবার এখুনি ধার!

রানার বুঝতে দেরি হলো না, দু'একদিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেবার অজুহাতে বাংলোয় আসবে রিকি। মানিব্যাগ বের করে বিশ ডলারের একটা নোট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা।

চার ভাঁজ করে নোট পকেটে পুরল রবিনসন। '...পাহাড়ে ক'দিন থাকবে তুমি?'

'তিন-চারদিন, বড়জোর,' বলল রানা, বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার পিছনে ঠেলে।

'তখন দেখা হবে তোমার সঙ্গে।' এক লাফে রেস্টুরেন্টের দরজার কাছে চলে গেল চার্লি রবিনসন, দরজা পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে।

চোখা দাঁতের মতো আসমান-ছোঁয়া পাহাড়-চূড়াগুলোর একটু নীচে, সবুজ মাঠ থেকে অনেক উপরে, ধারাল রোটরে শোঁ-শোঁ করে বাতাস কেটে উড়ছে হেলিকপ্টারটা। ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ছে চারপাশের পাহাড়প্রাচীরে, তারপর ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরদূরান্তে প্রতিধ্বনি হয়ে। কাত হয়ে মাঠের উপর দিয়ে দু'বার চক্কর দিল যান্ত্রিক ফড়িং, তারপর নামতে শুরু করল ধীরে। একটু পরেই মাটি স্পর্শ করল ওটা।

সরু রাস্তা যেখানে মাঠে মিশে চওড়া হয়ে গেছে, তার দেড়শো গজ দূরে রূপালী-কালো বেল জেট রেঞ্জার কপ্টারটা দেখে পিকআপ থামাল কৌতূহলী রানা। কপ্টার থেকে নামল দু'জন লোক, ঘুরন্ত রোটরের তলা দিয়ে কুঁজো হয়ে সরে গেল তারা, তারপর সোজা রওনা হলো পল হাইনরিখের কেবিনের দিকে।

গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে বিনকিউলারটা বের করে চোখে তুলল রানা, দেখল, ঝর্নার তীরে কথা বলতে থেমেছে লোক দু'জন। ভাব দেখে মনে হলো লম্বা লোকটা নির্দেশ দিচ্ছে গরিলা আকৃতির বেঁটে লোকটাকে। স্প্রুসের ঘন একটা ঝাড়ের আড়ালে

হারিয়ে গেল বাঁটকু। লম্বা লোকটা কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল পল হাইনরিখের নির্জন কেবিনে। কপ্টারের উপর বিনকিউলার তাক করল রানা। ওটাকে স্থানীয় কোনও ফ্লাইং সার্ভিসের কপ্টার বলে মনে হলো না ওর। রং ও মার্কিংটাও আর্মি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বা স্টেট পুলিশের নয়।

কোনও স্পষ্ট ধারণা করা গেল না, কিন্তু কেমন যেন একটা সন্দেহ উঁকি দিল রানার মনে। ওই দু'জনের শান্ত ভাবভঙ্গি, ধীর পায়ে হাঁটা, বা ওই বেঁটে লোকটার জঙ্গলের মধ্যে চলে যাওয়া—কী যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়।

পিকআপ থেকে নেমে পড়ল রানা। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে চলে এলো জংলা পথে। মাঠের কিনারা ধরে স্প্রুস গাছের আড়াল নিয়ে এগোল কেবিনের দিকে। কেবিনটা বেশ দূর দিয়ে পার হলো ও, তারপর ঘুরপথে চলে এলো কেবিনের পিছনে। থামল একটা স্প্রুসের মোটা কাণ্ডের পাশে। হাঁটুমুড়ে বসে চারপাশে তাকাল বেঁটে লোকটার খোঁজে।

গাছের পাতার আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে সামান্য একচিলতে সোনালী রোদ পড়েছে ওর সামনে, ওই রোদে নিঃশব্দ কালো ছায়াটাকে নড়তে দেখল রানা, পিছনে কেউ আছে বুঝতে পেরেই একপাশে সরে গেল লাফ দিয়ে। ও যেখানে বসে ছিল, সেখানে ধপ্ করে নামল ভারী একটা মোটা ডাল। ওটা লক্ষ্যচ্যুত না হলে থেঁতলে যেত মাথাটা। বুনো একটা নিচু হুঙ্কার শুনতে পেল রানা, ঘুরে দাঁড়াল দ্রুত। সেই বেঁটে গরিলা! লাঠি মাথার উপরে বাগিয়ে ধরে আবার সামনে বাড়ছে।

রানা টের পেল, বাম পায়ের পাতার উপর শরীরের ভর চলে গেল ওর, ডান পা ভাঁজ হয়ে উঠল খানিকদূর, তারপর ঝটকা মেরে সোজা হলো। বেঁটে শয়তানের তলপেটে লাগল জোরাল সবুট লাথিটা।

ঘোঁৎ করে উঠল বামন, এবার পাশ থেকে গদার মতো ধরে

ভারী লাঠি চালাল রানার মাথা লক্ষ্য করে।

চট্ করে মাথা নামিয়ে চুল ছুঁয়ে লাঠিটাকে পার হয়ে যেতে দিল রানা, তারপর মাটিতে ঢলে পড়ে আধশোয়া অবস্থায় ল্যাং মারল বামনকে। যেন গাছের গুঁড়ি সরাতে চেষ্টা করেছিল, মনে হলো ওর। একটুও নড়ল না কলাগাছের মতো মোটা, দৃঢ় পা দুটো। কুৎসিত হাসি ফুটল বামনের মুখে, বেরিয়ে পড়ল বড় বড় হলদে চৌকো দাঁত। আরেকবার টার্গেটে পৌঁছে গেল রানার বিদ্যুৎ-গতি ডান পা। নিমেষে চোখের সামনে বেঁটে বামনের শয়তানী হাসি মিলিয়ে যেতে দেখল ও, বদলে লোকটার চেহারায় ফুটে উঠল তীব্র ব্যথার ছাপ। থোহ্ করে দুটো ভাঙা দাঁত ফেলল গরিলা।

ততক্ষণে উঠে পড়েছে রানা।

হাত থেকে লাঠি ফেলে ঝাঁপ দিল বামন, রানা সরে যাবার আগেই চওড়া কাঁধের গুঁতো মারল ওর পাঁজরে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, পাঁজরের ব্যথায় ওর মনে হলো দুনিয়া ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই ওর বুকের উপর ঘোড়সওয়ারীর মতো আসীন হলো গরিলা, দু'হাতে গায়ের জোরে টিপে ধরেছে গলা।

শ্বাস নিতে না পেরে কয়েক সেকেন্ড খুব অসহায় বোধ করল রানা, তারপর আচমকা বুঝতে পারল কী করতে হবে ওকে। লোকটার কড়ে আঙুল দুটো খুঁজে নিল হাতড়ে, তারপর জোরে ঝটকা দিল উল্টোদিকে। একই সঙ্গে পা দুটো ভাঁজ করে নিয়ে এলো বুকের কাছে, তারপর দু'পায়ের ফাঁকে বামনের গলা পেঁচিয়ে ধরে এক ঝটকায় মোচড় দিয়ে কাত হয়ে গেল।

রানার উদ্দেশ্য টের পেয়ে সাবধান হয় যাওয়ায় মুটমুট আওয়াজে কড়ে আঙুলদুটো ফুটল, মচকেও গেল, কিন্তু ভাঙল না হাড়। অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এলো বামনের গলার গভীর থেকে।

বুকের উপর থেকে জগদ্দল পাথরটা নেমে গেল রানার।

প্রায় একইসঙ্গে উঠে দাঁড়াল গরিলা ও রানা। গরিলার চেহারায় সেই তাচ্ছিল্য-মেশানো হাসিটা আর দেখতে পেল না ও। সতর্ক হয়ে উঠেছে লোকটা, মাপা পায়ে পেশাদার বক্সারদের মতো সামনে বাড়ল। ডানহাতে মুখ আড়াল করে গার্ড নিয়েছে। রানাকে আন-আর্মড কমব্যাটে দক্ষ কেউ ধরে নিয়েছে লোকটা, আশা করল রানাও গার্ড নেবে, লড়াই হবে সেয়ানে সেয়ানে। সে জানে, আন আর্মড কমব্যাটে তাকে হারাতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

বামনের চোখ সর্বক্ষণ পিছনের দিকে কী যেন খুঁজছে। তবে পাঁচ সেকেন্ড পেরোনোর আগেই খোঁজা সাঙ্গ হয়ে গেল তার। রানার বাম পায়ের কিক লাগল গিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে গার্ড নেয়া ডানহাতের কনুইয়ে। নিজের মুঠোই জোরে আঘাত করল বামনের বাম চোখের কোনায়। সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত।

ব্যাটা পিছনে তাকায় কেন দেখতে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল রানা, আর ঠিক তখনই এলো আঘাতটা। করোটি চুরমার হয়ে গেছে, মনে হলো ওর। চোখের সামনে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে পেল, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

কাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে একপাশে পড়ে গেল রানা।

চোখের কোণ থেকে রক্ত মুছে সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গরিলা, ডালটা চাইছে। চোখ সরল না তার অজ্ঞান রানার শিথিল দেহের উপর থেকে।

'কী করবে, ট্রটি?' ব্রিম হার্টসেলের বলবার ভঙ্গিতে শাসনের সুরটা অস্পষ্ট থাকল।

'কুত্তার বাচ্চাকে খুন করব।'

'উঁহুঁ, লাঠির বাড়ি দিয়ে আচ্ছামত ছেঁচতে পারো, খুন করা চলবে না।'

'দাও।' হার্টসেলের হাত থেকে ডাল নিল ট্রেটম্যান, তারপর মাপা হাতে মারল রানার কপালের একপাশে। ঠাস করে আওয়াজ হলো, যেন পাকা মেঝেতে পড়ে বেল ফাটল। অচেতন, তাই ব্যথা পেল না রানা। রক্তাক্ত হয়ে গেল ওর মাথার একপাশ। চামড়া ও মাংসপেশি-ফাটা ক্ষতটা লক্ষ্য করে আবারও লাঠি তুলল ট্রেটম্যান।

'না,' শান্ত স্বরে নিষেধ করল হার্টসেল। 'যাও, কেবিনের সামনে গিয়ে কপ্টারের দিকে খেয়াল রাখো।'

'যাচ্ছি,' ডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রক্তাক্ত মুখ মুছল ট্রেটম্যান, তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, 'কালকের আগে জ্ঞান ফিরবে না কুত্তার বাচ্চার!' শরীর ঘুরিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল সে রানার পেটে। এতই জোরে, রানার শিথিল, অচেতন দেহটা শূন্যে উঠে ছিটকে পড়ল দুইহাত দূরে।

পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার ওপাশে মিলিয়ে যেতে শুরু করল সূর্যের আলো, প্রশান্ত হ্রদের গাঢ় নীল পানির বুকে এসে পড়ল ভাঙাচোরা কয়েক ফালি সোনালী রোদ, প্রগাঢ় কিছু দীর্ঘ কালো ছায়া—সেই সঙ্গে লিমা সোরেনসনের প্রত্যাশাও মিইয়ে গিয়ে পরিণত হতে শুরু করল গভীর অস্বস্তিতে। কল্পনায় ডানা মেলে দেয়ায় নানারকম সম্ভাবনা বিচার করে দেখল লিমার মন।

চরম বিরূপ পরিস্থিতিতেও অযথা আতঙ্কিত হয়ে ওঠা স্বভাব নয় লিমার, কিন্তু ওর মন বলল, এই নির্জন অপরিচিত পাহাড় থেকে শহর পর্যন্ত পথ চিনে ওকে পৌঁছুতে হবে একাই। বারবার উপলব্ধি করল, রানার সঙ্গে না গিয়ে এখানে একা রয়ে যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি ওর। স্বল্পসময়ে যতটুকু চেনে, তাতে কোনও দায়িত্ব কখনও হালকা ভাবে নেবার মতো মানুষ বলে মনে হয়নি ওর মাসুদ রানাকে। আর, তার মানে—কিছু একটা ঘটেছে মানুষটার।

ঘাসে গোল হয়ে শুয়ে আছে হান্টার, মাথাটা রেখেছে পাশে বসা লিমা সোরেনসনের কোলের উপর। হাজার হাজার বছর মানুষের সঙ্গে থেকেছে ওর স্বজাতি, ফলে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা অনুভূতি দিয়ে মনিবের বান্ধবীর উদ্বেগ টের পাচ্ছে কুকুরটা। সেই সঙ্গে মনিবের দেরিতে নিজেও অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে, হয়ে উঠেছে অতিরিক্ত সতর্ক। প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে সামান্য শব্দ পেলেও।

কুকুরটার সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করছিল লিমা এই তো আজ দুপুরের পরেও। এই নির্জন এলাকায় হান্টার শুধু ভাল প্রহরী ও রক্ষকই নয়, সহানুভূতিসম্পন্ন মনোযোগী সঙ্গীও। মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে হান্টারের মনমানসিকতাও মানুষের মতো হয়ে গেছে। লিমা হলফ করে বলতে পারবে, হান্টার জানে না, ও আসলে মানুষ নয়। গতরাতে পিছু পিছু তাঁবুতে ঢুকেছে রটওয়াইলার, শুয়েছে ওর স্লিপিং ব্যাগের পাশে। প্রথমে ঘুমের মধ্যে হান্টারের অজান্তে গড়গড় শব্দে সম্ভাব্য শত্রুকে হুঁশিয়ার করা ও সেই সঙ্গে ফোঁস-ফোঁস শ্বাসের শব্দ লিমার বিরক্তির উদ্রেক করছিল, অভ্যস্ত হওয়ার পরে বুঝেছে, প্রভুভক্ত জানোয়ারটার আদিম আওয়াজগুলো স্বস্তিদায়ক। ঘুম ভেঙে দেখেছে, ওর মুখের দু'ইঞ্চির মধ্যে বিরাট মুখটা এনে নিষ্পলক ওকে দেখছে হান্টার, অপেক্ষা করছে কখন ওর ঘুম ভাঙবে, কখন শুরু হবে নতুন একটা দিন। তাঁবুর ফ্ল্যাপের চেইন খুলে ভোরের আবছা আলোয় মুখ বের করে টের পেয়েছে লিমা, হান্টারের নম্র আচরণের আড়ালে তাড়া দেয়ার ভাবটা প্রচ্ছন্ন ছিল, যে-কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ফ্ল্যাপ খুলেছে ও।

রাতে কোনও একসময় সামান্য তুষারপাত হয়েছিল, ঘাসের বুকে ঝরে পড়া কাশফুলের মতো বিছিয়ে আছে সাদা মিহি তুষার। ধবল পর্বত-চূড়াগুলোর গায়ে ভারী হয়েছে সফেদ চাদর। একটানা হিমেল হাওয়ায় পাক খেয়ে উপরের দিকে উড়ে যাচ্ছে

তুষারকণা—উঁচু এলাকায় শীতের আগমনী বার্তা জানান দিচ্ছে নীরবে।

সূর্যটা উঁকি দেবার একটু পরেই অবশ্য গলে গেছে সমস্ত তুষার। নাস্তা সেরে হান্টারকে নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছে লিমা হ্রদের তীর ধরে। বৃদ্ধ মানুষটা যেখানে মারা গিয়েছিলেন, তার কাছাকাছি গিয়ে ক্যামেরা কেস ও ইকুইপমেন্টগুলো স্প্রুস গাছের নীচে পড়ে থাকতে দেখেছে লিমা। ওগুলো নিয়ে ফিরে এসেছে তাঁবুর কাছে।

পাহাড়ি নির্জনতায়, এই প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে, সুনীল হ্রদের তীরে মানসিক প্রশান্তিতে একাকী কেটেছে লিমার অনেকটা সময়। সাংবাদিকতা পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে ও। পিতামহ প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন, কাজেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে ও, লিখছে শুধু পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে। যে-কারণে কঠিন কাজগুলোও হয়ে উঠছে সত্যি সত্যি আনন্দদায়ক। কোনও কাহিনির পিছনে ছুটে বেড়ানো, খুঁজে বের করা কোনও ঘটনার পিছনের গূঢ় রহস্য—সত্যি, মনে হয় যেন বেঁচে আছে ও, জীবনের কোনও তাৎপর্য আছে। বিকেলভর নিজেকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে নিজের জীবন ও পেশা সম্বন্ধে আগে যা ভেবেছিল, সেই ধারণাগুলোই আরও পোক্ত হলো ওর। এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাংবাদিকতা পেশায় এখন ও যে অবস্থানে আছে, তাতে সন্তুষ্ট বোধ করল লিমা। আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই, ভাল করেই জানে ওর পক্ষে কতদূর কী করা সম্ভব। মানসিক কোনও বাধ্যবাধকতাও আর নেই এখন। কারও কোনও দায়িত্বও নিতে হবে না। এই তো, মাস কয়েক আগে চরম তিক্ততার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে গত তিনবছর বয়ে বেড়ানো মৃতপ্রায় প্রেমের সম্পর্ক। আর কারও সঙ্গে গভীর কোনও সম্পর্কে জড়ানোর ইচ্ছে নেই লিমার। বুঝে গেছে, কারও প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে যেচে কষ্ট পাবার কোনও অর্থ হয় না।

একসময় দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়াগুলোতে আবীর মাখিয়ে দিয়ে দিগন্তের ওপাশে নেমে যাচ্ছে দিনমণি। লালচে আলোটুকু কোনও উষ্ণতা দিল না। সূর্য ডুবতেই দ্রুত কমে গেল তাপমাত্রা, শুরু হলো হাড়-কাঁপানো পাহাড়ী শীতল হাওয়া। উলের পুরু একটা সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে ক্যাম্পের সামনে আগুন জ্বেলে হাত শেঁকতে বসল লিমা। ওর ফুট তিনেক পিছনে আগুনের আঁচের বাইরে শুয়ে রাতের শীতলতা উপভোগ করছে হান্টার।

আগুনের আরও কাছ ঘেঁষে বসল লিমা, একটু পরে ওকে স্বীকার করতে হলো, এখন, এই মুহূর্তে যে সর্বগ্রাসী, গভীর একাকীত্বে তলিয়ে যাচ্ছে, সেরকমটা আগে কখনও হয়নি ওর। আবার লিমার মনে পড়ল মাসুদ রানার কথা।

অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল রানা, আস্তে করে চোখ মেলল। সন্ধ্যার আবছা, ঘোলাটে আলোয় ডাল-পাতার আচ্ছাদনটাকে অস্পষ্ট দেখল ও। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করল দৃষ্টি। ওর মনে হলো, ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে মাথাটা। যেন ঢপঢপ করে হাতুড়ি ঠুকছে কেউ কপালে। ব্যথাটা এতো তীব্র যে, অজান্তেই আরও জোরে গোঙাল রানা। চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকল, একের পর এক চিন্তার ঢেউ আসছে, সেগুলো মনের তীরে থিতিয়ে পড়বার জন্য সময় দরকার। লিমা... হান্টার...পাহাড়... ওই হেলিকপ্টার... লোক দুটো... কেন? কেন মারল ওরা ওকে?

অভিমানে শ্বাস আটকে এলো রানার। কী করেছিল ও? কেন এভাবে অযথা আক্রমণ করা হলো? কারা যেন আছে, ওর কোনও ক্ষতি হলে ঠিকই প্রতিশোধ নেবে। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ! ...কী ভাবছে ও এসব? কে আবার আসবে ওকে সাহায্য করতে? ...ও মরলে কার কী? ...ওই লোক দুটো। কী করছিল ওরা পল হাইনরিখের কেবিনে? ...মনটা বলছে, আগে হলে ওকে এভাবে

মেরে পার পেত না ওই লোক দুটো, বরং উল্টো মার খেয়ে বেহাল দশা হতো তাদেরই। ...কেন এরকম মনে হচ্ছে?

কাত হয়ে একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা, মনে হলো তলপেট ও মাথার ব্যথায় জ্ঞান হারাবে। গলা চিরে বেরিয়ে এলো চাপা গোঙানি। ...তলপেটে ব্যথা কেন? তা হলে মাথায় বাড়ি দিয়ে ওকে অজ্ঞান করবার পর পেটে লাথিও মেরেছে ওরা? নেশাগ্রস্তের মতো থম মেরে বসে থাকল রানা, খানিক পর মাথা ঘোরা কমে এলো, ব্যথার তীব্রতাও হ্রাস পেল একটু। ব্যথার জায়গা দখল করে নিচ্ছে রাগ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, আড়ষ্ট পায়ে জংলা পথ ধরে চলে এলো কেবিনের সামনে, ঝর্নার তীরে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, মাথা ঘুরে ওঠায় ভেজা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। তবে জ্ঞান থাকল, বুঝতে পারল, কয়টা বাজতে পারে এখন। লিমার কথা মনে পড়ায় হাতছানি দেয়া অচেতনতার শিথিল আবেশ প্রত্যাখ্যান করল ওর মন। না, এখানে শুয়ে বিশ্রাম নেয়া চলবে না।

দু'হাতের ভরে শরীরটা তুলে বরফ-শীতল পানিতে মাথা চুবিয়ে দিল ও, সাবধানে জমাট বাঁধা রক্ত পরিষ্কার করতে শুরু করল কপালের ক্ষত থেকে। স্রোতে ভেসে গেল ওর গালে লেগে থাকা রক্তমাখা কয়েকটা শুকনো পাতা।

ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে চিন্তা-ভাবনাগুলো আরও একটু স্বচ্ছ হলো ওর। অদ্ভুত একটা জেদ অনুভব করল ও অন্তরে। রক্ষা নেই ওই কাপুরুষ দুটোর! অবাক হয়ে ভাবল, দুর্ঘটনার পর এতদিন কই, কখনও তো এরকম লাগেনি আমার! দুর্ঘটনার আগে কি আমি এতো জেদি ছিলাম? নাকি দুর্ঘটনার পর বদলে যাওয়ায় এরকম হয়ে গেছি? আবার মোড় ঘুরল ওর চিন্তা। লিমার কমনীয় মুখটা দেখতে পেল ও মানস-চোখে। ওই দুর্গম পাহাড়ে একা আছে লিমা, ফিরে আসবার পথ চেনে না।

টলমল পায়ে পিকআপ পর্যন্ত হেঁটে গেল রানা, বারবার নিজেকে শাসিয়ে দিল: খবরদার, মাসুদ রানা, পড়ে যাওয়া চলবে না তোমার!

হেলিকপ্টার যেখানে নেমেছিল, সে-জায়গায় চ্যাপ্টা হয়ে আছে ঘাস, চোখ এড়াল না ওর। কীভাবে কী ঘটেছে আরেকবার শুরু থেকে ভেবে দেখল। পরে পুলিশকে জানাতে হবে তো।

পিকআপের পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে বিশ্রাম নিয়ে উঠতে শুরু করল পাহাড়ি পথে। মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ রূপালী আলো ছড়াচ্ছে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে আকাশের দিকে ক্রমেই উঠে যাওয়া ওই সরু, পাহাড়ি পথ। পিকআপ থেকে নেয়া টর্চটা ব্যবহার করল না ও। ওটা পকেটে গুঁজে পথের অতিরিক্ত চড়াইগুলো দু'হাত ব্যবহার করে উঠল। বারবার প্রতিবাদ জানাল ওর শরীরটা, মাথা ও তলপেটের ব্যথায় দরদর করে পানি পড়ল চোখ থেকে, কিন্তু একবারের জন্যও থামল না রানা, এগিয়ে চলল কর্তব্যের কথা স্মরণ করে।

হ্রদের স্থির পানিতে চতুর্দশী চাঁদের নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে আছে লিমা সোরেনসন। হঠাৎ শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া মৃদু কাঁপন তুলল নিথর পানির বুকে, হেলেদুলে উঠল হাসিখুশি চাঁদমামা। হ্রদের বুক ছুঁয়ে সবুজ ঘাসের মাঠে সরে এলো হাওয়ার শিহরণ, একাকী হাওয়া আলতো পরশ বোলাল লিমার গালে, তারপর ফিসফিস করে কী যেন বলল ওর পিছনে, অ্যাসপেনের পাতায়।

ক্রমে বেড়ে ওঠা উদ্বেগ দূর করতে চাইল লিমা মন থেকে। একই সঙ্গে রাগ ও হতাশা অনুভব করছে ও পরিস্থিতির অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তায়।

মাঝরাত হয়ে এলো প্রায়।

কোথায় মাসুদ রানা? কী ঘটেছে আসলে? আর কতক্ষণ

অপেক্ষা করা উচিত ওর জন্যে?

সিদ্ধান্ত নিল লিমা, আপাতত ঘুমানোর চেষ্টা করা উচিত। কী করবে সে-সিদ্ধান্ত সকালে নিলেই হবে।

আগুনের সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল ও, তাঁবুর দিকে পা বাড়াল; আর তখনই নিচু, হিংস্র গর্জন বেরিয়ে এলো হান্টারের কর্কশ গলা চিরে। গর্জনটা জোরাল, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল আরও। ঘাড়ের রোম উঁচু করে যেদিকে চেয়ে আছে হান্টার, সেদিকে তাকাল লিমাও, কিন্তু দেখতে পেল না কিছু। দাঁড়িয়ে পড়েছে হান্টার, ধীরে ধীরে, সতর্ক পায়ে এগোতে শুরু করল জঙ্গলের কিনারার গাঢ় অন্ধকার ছায়া লক্ষ্য করে।

শরীর অবশ করা একটা আতঙ্ক অনুভব করল লিমা, গলার ভিতরটা শুকনো ঠেকল ওর। তারপর হান্টারের আচরণের পরিবর্তনটা বয়ে আনল স্বস্তি। বাচ্চা কুকুরের মতো খুশির ছোট ছোট ডাক ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ছুটতে শুরু করেছে হান্টার, মুহূর্তে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। আশ্বস্ত বোধ করল লিমা। মানুষটা রানা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। নিশ্চয়ই রানা!

মনের গভীরে জমা হওয়া ওর সমস্ত উদ্বেগ, হতাশা কেটে গেল টলতে টলতে রানাকে আগুনের দিকে হেঁটে আসতে দেখে।

রানাকে ঘিরে লাফাচ্ছে আর চক্কর কাটছে হান্টার।

কাছে আসতেই রানার রক্তাক্ত মুখটা আগুনের লালচে আভায় স্পষ্ট দেখল লিমা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'মাই গড, রানা! কী হয়েছে তোমার?' টলে উঠতেই দেরি না করে শক্ত হাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল ও, নিয়ে চলল তাঁবুর দিকে।

ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে রানা, পৌঁছে গেছে ক্লান্তির শেষ সীমায়। কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেই তাঁবুর মেঝেতে ওকে বসাল লিমা, তারপর সাহায্য করল স্লিপিং ব্যাগে ঢুকতে।

এবার ক্যানভাসের একটা ব্যাগ নিয়ে হ্রদের তীরে চলে গেল লিমা. ব্যাগে পানি ভরে ফিরে এসে দেখল, আকুল হয়ে রানার

গাল চাটছে হান্টার, সেই সঙ্গে কুঁই-কুঁই করে কাঁদছে গভীর, অকৃত্রিম দুঃখে।

সুশীতল পানি দিয়ে রানার মুখ মুছিয়ে আলতো করে পরিষ্কার করল লিমা কপালের পাশের ক্ষতটা, তীব্র ব্যথায় কয়েকবার গোঙাল রানা, জ্ঞান হারাল তারপর।

থেঁতলানো, কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে দক্ষ হাতে ড্রেসিং বেঁধে দিল লিমা, রানার শরীর গরম করতে আপাতত আর কিছু করবার নেই বুঝে ঢুকে পড়ল ওর স্লিপিং ব্যাগে, আহত সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে শুলো।

চেইন টেনে দেয়ায় দু'জনের দেহের উত্তাপে একটু পরেই আরামদায়ক, উষ্ণ হয়ে উঠল স্লিপিং ব্যাগের ভিতরটা।

ধীরে ধীরে দেহের কাঁপুনি থামল রানার, অচেতনতা একসময় পরিণত হলো স্বাভাবিক ঘুমে।

সাত

প্রথম আমলের ভাঙাচোরা ফোক্সওয়াগেন বিট্‌ল্‌ গাড়িটার স্টিয়ারিং হুইলে অধৈর্য ভাবে আঙুল ঠুকে তবলা বাজাচ্ছে চার্লস রবিনসন। প্রায় সাত মিনিট হলো ও ওই তবলাই বাজাচ্ছে। ওর সামনে নতুন পোর্শে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে আকর্ষণীয় চেহারার এক স্বর্ণকেশী। ব্যাঙ্কের ড্রাইভ-ইন উইনডোতে দাঁড়ানো তরুণী টেলারের সঙ্গে গতকালকের পার্টি নিয়ে অলস আলাপ জুড়েছে সে। ইতিমধ্যেই চার্লির জানা হয়ে গেছে ওদের কার প্রেমিকের নাম কী,

বিশেষ মুহূর্তে তারা কে তাদের প্রেমিকাকে কোন্ পোশাকে দেখতে ভালবাসে। কথা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না দুই তরুণীর, বিরক্ত হয়ে শুনছে রবিনসন প্রায় মিনিট আটেক হলো।

'এই যে!' আরও দু'মিনিট পরে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল রবিনসন। 'এত গল্প করছ যে, এটা পার্ক পেয়েছ নাকি! গাড়ি সরাও, মিস!'

টেলারের জানালার ওপাশে দাঁড়ানো রুগ্না মেয়েটা বিরক্তির সঙ্গে একবার দেখল রবিনসনকে। মুখে লাল লাল ফুটকি ভরা টেলারের সঙ্গিনী দামি পোর্শে গাড়িতে বসে আছে, সেই অহমিকাতেই বোধহয় বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করল ভাঙাচোরা গাড়ির আরোহী অনাকাঙ্ক্ষিত আপদটাকে। নির্বিকার চেহারায় চালিয়ে গেল গল্প।

পোর্শে টার্বোটার দিকে একপলক তাকাল চার্লি রবিনসন, তারপরেই ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল শয়তানি হাসি। *আড়াই লাখ ডলার খরচ করেছ তুমি ওটাতে চেপে বেসামাল গতিতে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে, না? ...বেশ!*

খটর-মটর-ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করা প্রাগৈতিহাসিক ফোক্সওয়াগেন-এ ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে আস্তে করে সামনে বাড়ল চার্লি। আলতো ভাবে পোর্শের পিছনের বাম্পারে ছুঁলো ওর গাড়ির সামনের বাম্পার। এবার অ্যাক্সিলারেটর পুরোপুরি দাবিয়ে ধরল চার্লি। ফুঁসে ওঠা ফোক্সওয়াগেন-এর ঠেলা খেয়ে ব্যাঙ্কের স্টল ছাড়িয়ে সামনের রাস্তা অর্ধেকটা পার হয়ে গেল অপূর্ব সুন্দর পোর্শে। একপাশ থেকে জোরে আসছিল একটা পিকআপ, ড্রাইভার সতর্ক ছিল বলে পোর্শের পেটে গুঁতো দিল না ওটা, কড়া ব্রেক কষে থামল একেবারে পেট ঘেঁষে। বিরাট হাঁ করা আতঙ্কিত মেয়েটাকে তার দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে দেখল পিকআপের ড্রাইভার।

বিস্ফারিত চোখে নির্জলা অবিশ্বাস নিয়ে চার্লির দিকে তাকাল

ব্যাঙ্কের রুগ্না টেলার, এত বিস্মিত হয়ে গেল যে মাইক্রোফোন মুখের সামনে অন করে না ধরেই বলে উঠল, 'কী ভয়ানক! বিশ্বাস করা যায় না এমন কাজ করতে পারে কেউ! খুন হয়ে যেতে পারত ও! তুমি! তুমি...'

কানের কাছে হাত এনে শুনতে চেষ্টা করছে, এমন ভাব দেখাল চার্লি, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। খেয়াল করল, ব্যাক গিয়ার দিয়ে সামনের বাঁকে থেমেছে পোর্শে। রাগে ছটফট করতে করতে গাড়িটা থেকে নামল দাম্ভিক তরুণী, দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে প্রায় ছুটতে ছুটতে ফোক্সওয়াগেনের দিকে এগোল। ফিনফিনে টাইট গেঞ্জির তলায় ব্রেসিয়ার না পরায় লাফাচ্ছে তার...

'এতো সাহস তোমার!' চার্লির পাশের জানালায় এসে আঙুল নাচাল মেয়েটা। 'ছোটলোক! বদমাশ! ইতর!'

জবাবে মিষ্টি করে হাসল চার্লি, তারপর বলল, 'গালাগাল দিয়ো না, মিস, ওতে আমার রাগ হয়। সামনে থেকে সরো এখনই, না হলে তোমার ওই শখের মুড়ির টিনটাকে এমন গুঁতোই দেব যে, এরপর ওটাকে টো করে জাঙ্কইয়ার্ডে নিয়ে যেতে লোক ডাকতে হবে তোমার।'

যতটা না আতঙ্কে, তার চেয়ে বেশি বিস্ময় বোধ করে থমকে গেল তরুণী, তারপর সামলে নিয়ে হিসহিস করে বলল, 'তোমাকে আমি পুলিশে দেব, বদমাশ কোথাকার!'

চওড়া হাসল চার্লি রবিনসন। 'লেডি, তুমি জানো, রাগলে ধেড়ে বাঁদরের পেছনদিকের মতো লাল হয়ে যাও তুমি?'

জবাব না দিয়ে মাটিতে থুহ্ করে থুতু ফেলল তরুণী, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে গেল তার পোর্শের কাছে। কম্পানির সুনামের প্রতি সুবিচার করে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল লাখ ডলারের দ্রুতগামী পোর্শে, রাস্তায় চাকার গাঢ় দাগ ফেলে ছুটল বিদ্যুৎ-গতিতে।

সামনে বেড়ে থাকা ধাতব ট্রেতে চেক রাখল চার্লি, তারপর জানালার কাঁচের ওপাশ থেকে ওর দিকে বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়ে থাকা রুগ্না টেলার মেয়েটার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। তরুণীর বড় বড় সবুজ চোখ দুটো ভারী পাওয়ারের চশমার পুরু কাঁচের কারণে আরও বড় দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে তরুণী আসলে ভিনগ্রহের প্রাণী। চোখ টিপল চার্লি। 'চেকটা ক্যাশ করো। ছোট নোটে টাকা দেবে।'

চেকের দিকে তাকিয়ে আবার চার্লিকে দেখল বিস্মিত তরুণী। 'কিন্তু চেকটা তো মাত্র বিশ ডলারের!'

'ঠিক,' জোর গলায় সায় দিল চার্লি। 'বিশটা এক ডলারের নোট হলেই চলবে।'

বুকপকেটে বিশ ডলার মুচড়ে ভরে নিয়ে অ্যাক্সিলারেটর দাবাল ও, রওনা হয়ে গেল ঘটরঘটর আওয়াজ তুলে এক ঝলক নীল ধোঁয়া পিছনে রেখে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আপনমনে মাথা দোলাল। গতকাল সকালে রানার মুখে পল হাইনরিখের মৃত্যুর খবরটা শুনবার পর থেকে চিন্তাটা বারকয়েক এসেছে ওর মনে। অসুবিধেটা কী! নিজেকে যুক্তি দিল, চুরি তো আর করছি না! মারা গেছে পল হাইনরিখ, এখন তো আর কিছু চাওয়া যাবে না তার কাছে। শহরের পশ্চিম দিকে চলল চার্লি। ওদিকেই পল হাইনরিখের বাড়ি।

বাড়িটার পিছনে গাড়ি রেখে আশপাশ দেখে নিল ও। রাস্তার দু'পাশে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা ভিক্টোরিয়ান আমলের প্রকাণ্ড দোতলা দালানগুলো গম্ভীর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য কাঁচ ও রেড-উড দিয়ে তৈরি দু'একটা আধুনিক বাড়িও আছে। এদিকের বাড়িগুলোর চারপাশে ফল ও ফুলের বাগান। ঘন হয়ে জন্মানো উঁচু ঝোপের বেড়া কোনও কোনও বাড়িকে একেবারেই আড়াল করে রেখেছে চারপাশ থেকে। পল হাইনরিখের বাড়িটাও তেমনি।

সময়টা ভর দুপুর। আরেকবার রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল চার্লি। খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ, কেউ নেই আশপাশে। পল হাইনরিখের বাড়ির পাশেই রট আয়রন-এর উঁচু গেট। ওটা টপকে বাগানে ঢুকে পড়তে সমস্যা হলো না ওর। লন পার হলো নিয়মিত ছাঁটা ঝোপগুলোর আড়াল নিয়ে। থামল বড় একটা ঝোপের পিছনে, একটা জানালার নীচে। এবার গা থেকে জ্যাকেট খুলে ওটা হাতে মোড়াল ও, তারপর তালার পাশে কাঁচের ছোট পেন-এ ঘুসি মারল বেশ জোরে।

চামড়ার কেস থেকে স্টিলের একটা চিকন পিক বের করল ব্রিম হার্টসেল। পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না কিচেনের দরজার তালা খুলে যেতে। আপনাআপনি ফাঁক হলো কজায় নিয়মিত তেল দেয়া কপাট।

স্টাডিতে দাঁড়িয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল চার্লি রবিনসন। এইমাত্র শেল্ফ্ থেকে তুলে নেয়া দামি ক্যামেরাটা জ্যাকেটের পকেটে পুরেছে ও, মানুষের গলার আওয়াজে একেবারে জমে গেল। ভাবতে শুরু করল, এরপর কী করা উচিত ওর।

'কিচেন থেকে শুরু করছি আমি,' ট্রটম্যানকে বলল ব্রিম হার্টসেল। 'তুমি বাড়ির সামনের দিকটা খুঁজে দেখো।'

দেরি না করে হল ক্লযিটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল চার্লি। আরেকটু দেরি করলে ধরা পড়ে যেত, কারণ এক সেকেন্ড পরেই হল-এ ঢুকল বামন গরিলা জেসন ট্রটম্যান।

এরপর ড্রয়ারগুলো খুলবার আওয়াজ পেল চার্লি, খসখস শব্দ হলো কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করবার। এ-বাড়িতে ডাকাত পড়েছে বুঝতে পেরেই ক্লযিটের পিছনের দেয়ালে সেঁটে গেল চার্লি, নিজের সামনে টেনে আনল একটা ভারী ওভারকোট। নড়তে গিয়ে পা দিয়ে বসল দাঁড় করিয়ে রাখা একটা স্কি পোলের

গোড়ায়। ক্লসিটের দেয়ালে বাড়ি খেল স্কি পোল, তারপর খটর-মটর আওয়াজ তুলে এখানে-ওখানে ঠোকাঠুকি লেগে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাজ থামিয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জেসন ট্রটম্যান। সরাসরি আওয়াজের উৎসের খোঁজে চলে গেল তার অভ্যস্ত চোখ। তবুও ঘরের ভিতরে একবার নজর বুলিয়ে নিল সে, কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে তারপর তাকাল আর্চওয়েয়ের বাইরে ক্লযিটের দরজাটার দিকে।

গা শিউরানো হাসি হাসল ট্রটম্যান, শোল্ডার হোলস্টার থেকে .৩২ রিভলভারটা তুলে নিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল অসংখ্য ফুটোওয়ালা সাইলেন্সার, আটকে নিল ওটা নাক বোঁচা রিভলভারে।

ক্লযিটের দরজার বামপাশে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে, তারপর একটানে খুলে ফেলল দরজা। ততক্ষণে রিভলভারের হ্যামার কক্ করা হয়ে গেছে তার। নিচু, চাপা স্বরে বলল, 'মাথার ওপর হাত তুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসো, হাত যেন ভুলেও না নড়ে!'

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চার্লি রবিনসন।

'ঠিক পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম, বেরোও,' হুমকির সুরে আবার বলল ট্রটম্যান, ক্লযিটের ভিতরের লোকটার মানসিক দুরবস্থা টের পেয়ে সদ্য হারানো দুটো ছাড়া বাকি সব দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর, 'পাঁচ সেকেন্ড পর গুলি করতে শুরু করব আমি।'

'ঠিক আছে, বের হচ্ছি,' সামনে থেকে ওভারকোট সরিয়ে উঠে দাঁড়াল চার্লি, বেরিয়ে এলো মাথার উপর হাত তুলে।

'বেশ, বেশ,' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ট্রটম্যান, 'তা হলে ধরা পড়ল চোর!'

'পুলিশ নাকি তোমরা?' নার্ভাস হয়ে জিজ্ঞেস করল চার্লি। বিপদে পড়ে সার্বক্ষণিক গাঁজার ঘোরটা প্রায় কেটে গেছে ওর।

'আমি চোর না। বিশ্বাস করো। পল হাইনরিখ আমাকে একটা ক্যামেরা গিফট করতে চেয়েছিল, ওটা নিতে এসেছিলাম।'

'পুলিশ না আমরা, আমরা ওই "নাকি",' আধবোজা তৃপ্ত চোখে চার্লস রবিনসনকে দেখল জেসন ট্রটম্যান। 'হার্টি, আসো তো একটু এদিকে!'

বামনটার চেহারা ও ভয়ঙ্কর ভাব-ভঙ্গি দেখে গাঁজার বাকি নেশাটুকুও এক পলকে ছুটে গেল চার্লির।

হল-এ ঢুকে অগোছাল পোশাক পরা হালকা-পাতলা যুবককে নার্ভাস হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখল ব্রিম হার্টসেল। পরিস্থিতি বিরূপ হয়ে উঠছে উপলব্ধি করে বলে উঠল, 'ধুশ্-শালা! ওকে কোথায় পেলে, ট্রটি?'

ঘাড় কাত করে চিবুক দিয়ে ক্লযিটটা দেখাল ট্রটম্যান, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'আমাদের দেখে ফেলেছে ও, হার্টি। পরে কিন্তু চিনিয়ে দিতে পারবে। ...দেব শেষ করে?' চওড়া হাসি দেখা দিল ট্রটম্যানের পৈশাচিক চেহারায়।

বেঁটে পিশাচটার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল ব্রিম হার্টসেল। মিস্টার ক্যাসল চান না অযথা কোনও খুনোখুনি হোক, মনোযোগ আকৃষ্ট হোক পুলিশ বা জনসাধারণের। কিন্তু এটাও ঠিক, পল হাইনরিখের বাড়িতে তারা এসেছিল, তার সাক্ষী এই যুবক। তাদের এই খোঁজাখুঁজি আইনের চোখে বৈধ নয়। এর কারণে বেরিয়ে আসতে পারে ব্যারি ক্যাসলের নাম। সেটা তিনি চাইতে পারেন না। আগেও দু'বার ব্যারি ক্যাসলের হয়ে মানুষ হত্যা করেছে সে—ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ এজেন্ট ছিল তারা—ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট যদি জেনে ফেলত যে ব্যারি ক্যাসলের কর্পোরেশনে স্পাই ঢুকে গিয়েছিল, তা হলে ক্ষতি হতো, সে-কারণে করতে হয়েছিল খুনগুলো। অন্তত একটা কারণ ছিল সেটা। আরেকটা কারণ, তার নিজের মগজ খাটিয়ে বহু যত্নে তৈরি সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত, না-ও থাকতে পারত

তাতে লোভনীয় চাকরিটা। বিস্তারিত না জানলেও ব্রিম হার্টসেল এটুকু জানে, পল হাইনরিখ সংক্রান্ত সমস্ত কিছু ব্যারি ক্যাসলের কাছে টপ প্রায়োরিটি বিষয়, যতদিন ধরে সে চাকরি করছে ব্যারি ক্যাসলের, তারও আগে থেকে পল হাইনরিখের উপর নজরদারি করছিলেন ব্যারি ক্যাসল। মাঝে মাঝে দু'এক কথায় ব্যারি ক্যাসল জানিয়েছেন, কর্পোরেশনের জন্য পল হাইনরিখের অস্তিত্ব কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, অথচ করবার কিছুই নেই তাঁর।

আবার ট্রেটম্যানের দিকে তাকাল হার্টসেল, এবার আস্তে করে মাথা দোলাল। কিচেনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'ওর ব্যবস্থা করো, ট্রেটি।'

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বিচলিত বন্দির দিকে একবারও না তাকিয়ে ফিরে গেল সে কিচেনে।

লম্বা লোকটা যা বলে গেল তা অন্তর দিয়ে বুঝল চার্লি, কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধল ওর। অবাক হয়ে ভাবল, ঈশ্বর! ওরা আমাকে খুন করতে চায়? উদ্যত রিভলভারের চেয়ে সামনে দাঁড়ানো ষাঁড়ের মতো গর্দানওয়ালা নাক থ্যাবড়া গরিলা-সদৃশ প্রাণীটাকে অনেক বেশি আতঙ্কজনক মনে হলো ওর। লোকটার বাইসেপ দুটো ওর ঊরুর চেয়েও মোটা।

'কসম খোদার, কাউকে আমি একটা কথাও বলব না,' তাড়াতাড়ি বলল চার্লি, 'আমি শুধু আমাকে উপহার দেয়া ক্যামেরাটা নিতে এসেছিলাম।' দ্রুত চিন্তা করছে চার্লি, ভাবছে, কীভাবে নিরাপদে পালাতে পারবে ও বনমানুষটার কবল থেকে। লোকটার চোখে থাপ্পড় মেরে দৌড় দিলে... পালাতে পারবে না?

'এবার সত্যি বিরাট ভুল করে বসেছ তুমি, হিপ্পি,' বিকৃত আনন্দ পেয়ে খল-খল করে হাসল জেসন ট্রেটম্যান।

'দেখো, ভাই,' দেহের পাশে হাত নামিয়ে দিল চার্লি, 'কী-ই বা বলার আছে আমার, তুমিই বলো? আসলে আমিও তো চোর,

তোমাদেরই মতো। এক চোর আরেক চোরের চুরির কথা পুলিশকে বলে কখনও ভুলেও? ...আমিও বলব না।' এক পা আগে বাড়ল চার্লি। একইসঙ্গে দূরত্ব কমাচ্ছে ও, সরে যাচ্ছে রিভলভারের নলের সামনে থেকে।

এবার ডানহাতটা শক্ত করে বামন ষাঁড়ের চোখে চাপড় মারতে চেষ্টা করল ও।

কিন্তু ক্ষিপ্র প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশি ধীর চার্লস রবিনসন, অনেক অনেক বেশি অনভিজ্ঞ।

অপেক্ষা করে ছিল জেসন ট্রটম্যান, বাঁ বাহু দিয়ে চার্লির হাতটা অনায়াসে ঠেকিয়ে দিল সে, একই সঙ্গে চার্লির বাইসেপ ধরে বসল ভাইস-এর মতো শক্ত হাতে। এক হাতের জোরে ঘুরিয়ে দিল সে চার্লিকে, তারপর প্রচণ্ড ঠেলায় আছড়ে ফেলল দেয়ালের গায়ে।

নাক-মুখ থেঁতলে গেল চার্লির। ফাটা নাক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত।

'কী করতে যাচ্ছ, সেটা তোমার চেহারায় পরিষ্কার ফুটে ওঠে, শালা হিপ্পি,' টিটকারির সুরে চার্লিকে বলল ট্রটম্যান। হাত থেকে রিভলভারটা ছেড়ে দিল সে, ওটা ব্যবহার করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। মেঝেতে পড়ে ধাতব শব্দ তুলল রিভলভার।

মচকানো কড়ে আঙুল বাঁচিয়ে একহাতে চার্লস রবিনসনের কপাল চেপে ধরল ট্রটম্যান, অপর হাতের তালু ঠেকাল ওর চিবুকে। মোচড় দেয়ার ভঙ্গিতে দ্রুত নড়ল তার হাতদুটো, এক ঝটকায় ভেঙে দিল সে হালকা-পাতলা চার্লি রবিনসনের ঘাড়ের হাড়। কণ্ঠনালী পেঁচিয়ে যাওয়ায় টুঁ শব্দ করতে পারল না ট্রটম্যানের অসহায় শিকার, এলিয়ে পড়ল শিথিল শরীরটা দীর্ঘ, রোমশ, পেশীবহুল দু'বাহুতে।

কর্পোরেশনে কারুকার্য-খচিত প্রকাণ্ড মেহগনি ডেস্কের পিছনে

রাজকীয় রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন ব্যারি ক্যাসল। আটত্রিশ তলার উপরে তাঁর সাজানো-গোছানো, খোলামেলা অফিস-ঘরটা যে-কোনও কোটিপতির দিবাস্বপ্নের ঠিকানা হতে পারত।

ব্যারি ক্যাসলের সামনে, ডানদিকে চামড়ার উইংব্যাক চেয়ারে বসে আছে ব্রিম হার্টসেল, অ্যাসপেন থেকে যা জেনে এসেছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করছে বসের কাছে। দরজার কাছে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জেসন ট্রটম্যান—নীরব এক অশুভ প্রহরী।

অ্যাসপেন শহরে পল হাইনরিখের বাড়িতে অনাহূত অতিথির সঙ্গে দেখা হবার ঘটনা ব্যারি ক্যাসলের কাছে রিপোর্ট করবার সময়ও কোনও পরিবর্তন এলো না হার্টসেলের নির্বিকার, নিস্পৃহ চেহারায়। অন্য দুটো খুনের ঘটনার মতোই বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেল না সে এবারও, শুধু জানাল, সবদিক বিবেচনা করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মিস্টার ক্যাসল কখনও এসব ব্যাপারে সরাসরি জানতে চান না। বিচার-আচার শেষে যেটা করা জরুরি, যা করতেই হবে, সেটা করে ফেলা হয়েছে, এ-পর্যন্ত জানাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। ব্রিম হার্টসেলের ধারণা, ব্যারি ক্যাসল জানতে চান না, তার আরেকটা কারণ হচ্ছে, কখনও যদি প্রয়োজন পড়ে, তা হলে এসব ব্যাপারে জানেন তা সহজেই অস্বীকার করতে পারবেন, বিবেকের দংশনে ভুগতে হবে না তাঁকে।

আজ পর্যন্ত ব্যারি ক্যাসলের অন্তরের গহীনে কী আছে, বা তিনি কী ভাবছেন, তা সঠিক ভাবে আন্দাজ করতে পারেনি কেউ। অন্তরে যা-ই থাক, তাঁর সরু, কিন্তু সুদর্শন চেহারা, ধূসর-নীল শান্ত চোখ কখনও হৃদয়ের কোনও ভাব প্রকাশ করে না, থাকে অস্বচ্ছ, শীতল।

এমনকী তাঁর দুষ্কর্মের সঙ্গী, সাপের মতো ঠাণ্ডা ব্রিম হার্টসেলের পক্ষেও বসের মন বোঝা অসম্ভব। যে-কারণে বুঝতে

পারল না, অ্যাসপেনে যুবকের অযথা মৃত্যু কতটা বিরক্ত করেছে ব্যারি ক্যাসলকে। তবে এটাও ঠিক, এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না আর। আগের হত্যাকাণ্ড দুটোর মতোই এই হত্যাকাণ্ডও ছিল অনিবার্য।

বোকার মতো মাথা গরম করে কোনও কাজ করেনি হার্টসেল বা ট্রটম্যান, পরবর্তী পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে সেটা ভেবে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে ওরা।

ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট-এর কাজ নিয়মিত পাবার জন্য চুক্তি করতে হয়েছে, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে ওই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিগুলো সই করানোর জন্য আগের খুন দুটো করা দরকার হয়ে পড়েছিল। তাঁর কর্পোরেশনে গুপ্তচর ঢুকে পড়েছিল, তা জানানোর উপায় ছিল না কাউকে। কর্পোরেশনের প্রাণ সঞ্চালণকারী রক্তবাহী ধমনীটাই শুকিয়ে যেত কেউ জানলে। ...আর পল হাইনরিখ—ওই লোকের ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক। পল হাইনরিখের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে একটাই পরিণতি—এতদিন যা কিছু মূল্যবান মনে করে এসেছেন তিনি, ধ্বংস হয়ে যাবে সব—তাঁর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য, তাঁর ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সম্মান, প্রতিপত্তি—এমনকী, হয়তো স্বাধীনতাও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরম্ভ হয়েছে সমাপ্তির শুরুটা। সবকিছু সুচারু ভাবে গুটিয়ে আনবার সুযোগ পেয়েছেন ব্যারি ক্যাসল। সুযোগটা হেলায় হারানোর মতো বোকা তিনি নন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সমস্ত হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে-বুকিয়ে দিতে হবে এবার।

অ্যাসপেনের খবরের কাগজে প্রকাশিত পল হাইনরিখের মৃত্যু-সংবাদটা আরেকবার পড়লেন ব্যারি ক্যাসল। কাগজটা তাঁকে এনে দিয়েছে ব্রিম হার্টসেল। খবরের একটা ছোট বিষয় মনোযোগ কেড়ে নিল তাঁর। কোনও এক বিদেশি লোক খুঁজে পায়

পল হাইনরিখের মৃতদেহ।

'এই যে এই মাসুদ রানা,' ব্রিম হার্টসেলের দিকে তাকালেন ব্যারি ক্যাসল, 'কে লোকটা? বিদেশি? আমার মনে হয়, এর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া উচিত।'

'আমিও ভেবেছি আপনি খোঁজ নিতে চাইতে পারেন, মিস্টার ক্যাসল,' শান্ত স্বরে বলল হার্টসেল। 'অফিস থেকে এখানে আসার সময় কিছু ইকুইপমেন্টও নিয়ে এসেছি সেজন্যে। আপনি চাইলে আজ রাতে আবার অ্যাসপেনে ফিরতে পারি আমরা, ওই লোকের বাড়িতে ইলেকট্রনিক সার্ভেইলান্স বসাতে সমস্যা নেই কোনও। যদি দেখা যায় পল হাইনরিখের কাছে আমাদের জন্যে ক্ষতিকর কিছু পায়নি সে, তা হলে যন্ত্রপাতি সরিয়ে আনা যাবে পরে একসময়।'

ব্রিম হার্টসেলের শীতল চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন ব্যারি ক্যাসল। হার্টসেলের নিখুঁত পেশাদারী দক্ষতা সত্যিই পছন্দ করেন তিনি। চাকরিতে নেবার কিছুদিনের মধ্যেই হার্টসেল হয়ে উঠেছিল তাঁর বিশ্বস্ত ডানহাত। আজও তা-ই আছে।

ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ব্যারি ক্যাসল, 'ভাল। তবে বৃহস্পতিবার রওনা হয়ো তুমি। আগামী দু'দিন নতুন লেযার প্রজেক্টের ব্যাপারে আমাদের সিকিউরিটি পরখ করে দেখবেন জেনারেল ও'নিল, আমি চাই তুমি নিজে থাকো তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে।'

'যা ভাল মনে করেন আপনি, সার,' দৃঢ়, নিচু স্বরে বলল হার্টসেল। 'তা হলে বৃহস্পতিবার সকালে রওনা দেব আমরা।'

আট

দু'দিন পুরোপুরি বিশ্রাম নিল রানা। প্রথম দিন ওকে উঠে দাঁড়াতেও দেয়নি লিমা, তবে দ্বিতীয় দিন সামান্য হাঁটাহাঁটি করেছে ও। জোর করে রান্নার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে লিমা, এবং সুস্বাদু খাবার গলা পর্যন্ত ঠেসে নির্দ্বিধায় মনে মনে স্বীকার করেছে রানা, এতো ভাল রাঁধুনি হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না কখনোই ।

কপালের ক্ষতটা ফুলে আছে এখনও, ছুঁলে ব্যথা লাগে, এ ছাড়া আর কোনও সমস্যা থাকল না তৃতীয় দিন। তবে তীব্র রাগ ও জেদ অনুভব করছে রানা। কেবিনের ওই ঘটনার কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেনি। শেষে বাধ্য হয়ে লিমার সঙ্গে একমত হয়েছে, অযথা চিন্তা করে ফায়দা হবে না কোনও।

কিন্তু মনটা স্থির হয়নি ওর, ভেবে বের করতে চেয়েছে নির্জন কেবিনে কেন এসেছিল লোক দুটো। ডাকাতিই ছিল তাদের উদ্দেশ্য? কিন্তু হেলিকপ্টারে করে ডাকাতি করতে এসেছিল, সেটা অসম্ভব। মূল্যবান কী-ই বা থাকবে ওই কেবিনে? কপ্টারের তেলের খরচও তো উঠবে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ ছিল তাদের আসবার। লোক দুটো চায়নি ওরা যা করছে, সেটা জেনে ফেলুক কেউ। তার মানেই বে-আইনী কিছু।

ওই দু'জনকে পেশাদার, দক্ষ লোক মনে হয়েছে ওর। বার কয়েক এ-ও মনে হয়েছে, এরকম পেশাদার লোক আগেও

কোথাও দেখেছে ও। আবছা ভাবে একবার মনে হয়েছে একটা হাত কাটা লোকের কথা। অনেক আগে তাকে বোধহয় চিনত ও। দুর্ধর্ষ ছিল লোকটা, তবে খারাপ ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে করতে পারেনি ও তার পরিচয়।

বেশি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ অবশ্য পায়নি রানা, পাহাড়ে ওর অসুস্থতার বেশিরভাগ সময়টা কেটেছে লিমা সোরেনসনের সঙ্গে গল্প করে, গল্প শুনে। অকপটে নিজের অতীত, বর্তমান রানাকে জানিয়েছে লিমা, বলেছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, বদলে জানতে চেয়েছে রানার মনের চাওয়া, না পাওয়ার কথা। গত চারমাসের শিকড়-ছেঁড়া ওর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা লিমাকে শুনিয়েছে রানা। সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছে লিমা, সান্ত্বনা দিয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে একসময়, স্মৃতি ফিরে আসবে ওর।

পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করেছে ওরা, ফলে খারাপ কাটেনি দু'জনের।

একটু আগে দুপুরের ঘুম দিয়ে উঠেছে ওরা। দুপুরটা গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে যাচ্ছে।

কাত হয়ে তাঁবুর ফ্ল্যাপ সরিয়ে বিকেলের সূর্যটার দিকে তাকাল রানা, স্পর্শ করল পাশে শুয়ে থাকা লিমার বাহু। 'সাঁতার কাটবে, লিমা?'

তাপমাত্রা এখনও আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট। অ্যাসপেনে এরকম আবহাওয়াকে বলে ইন্ডিয়ানদের গ্রীষ্ম।

'ঠাট্টা করছ?' বলল বিস্মিত লিমা, 'ভোরে যখন ওই পানিতে মুখ-হাত ধুলাম, তখন মনে হয়েছিল আরেকটু ঠাণ্ডা হলে জমে বরফ হয়ে যেত পানি।'

'কিন্তু এখন নেমে দেখো, ভাল লাগবে,' মৃদু হাসল রানা। 'বিশ্বাস করতে পারো আমাকে।' কথা শেষ করে আর দেরি করল না রানা, প্যান্ট-শার্ট খুলে সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে চলে গেল হ্রদের তীরে তারপর একবার পিছনে তাকিয়েই ডাইভ দিল পানিতে।

দু'মিনিট পর হ্রদের তীরে চলে এলো লিমাও, গোড়ালি ডুবিয়ে দিল পানিতে। পানি আরামদায়ক তা নিশ্চিত হয়ে এগোল আবার, তারপর কোমর ডুবে যেতেই ঝাঁপ দিল সামনে। সাঁতরে চলে এলো ও রানার পাশে। দু'জন একসঙ্গে আধঘণ্টা সাঁতার কাটল ওরা। জলকেলিতে মেতে উঠল বাচ্চাদের মতো, পানি ছিটাল একে অপরের গায়ে। এবং... দু'জন দু'জনের খুব কাছে এলো ওরা সে-রাতে।

রাতে খাওয়ার পর তাঁবুর বাইরে, আগুনের ধারে স্লিপিং ব্যাগে পাশাপাশি শুলো ওরা, তাকিয়ে দেখল রাতের কালো আকাশের গায়ে অজস্র নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। টুকটাক কথা হলো, তারপর এক সময় ফুরিয়ে গেল সমস্ত কথা। তারও পরে, কখন যেন রানার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখল লিমা। একসময় দু'জন ওরা হারিয়ে গেল নিজেদের একান্ত সুখের জগতে। অবাক হয়ে চোখ মিটমিট করে ওদের ছেলেমানুষি দেখল শুধু জ্বলজ্বলে নক্ষত্ররাজি, সাক্ষী হয়ে রইল রাতের আকাশ, ঝিরিঝিরি হাওয়া, সুবাসিত বুনো ফুল, নীরব অ্যাসপেন ও সুগন্ধী স্প্রুস।

আরও অনেকক্ষণ পর চুপ করে শুয়ে থাকা রানার দিকে ঘোর-ভাঙা চোখে তাকাল লিমা। মাথার নীচে হাত দিয়ে চিন্তায় ডুবে থাকা মানুষটাকে বড় বেশি নিঃসঙ্গ মনে হলো ওর। মন বলল, মানুষটার এই নিঃসঙ্গতা তার নিজেরই বেছে নেয়া। আর ওই কালো চোখ দুটো—অত গভীর, মায়াভরা চোখ কখনও কারও দেখেনি ও। কিন্তু ওই কালো চোখ দুটোয় বোধহয় একই সঙ্গে কঠোরতার বিচ্ছুরণও আছে। বুকের মাঝে শিহরণ অনুভব করল লিমা, নারীর সহজাত অনুভূতি ওকে বলে দিল, এই কাছে শুয়ে থাকা অদ্ভুত আকর্ষণীয়, অকৃত্রিম পুরুষটিকে ভালবাসা যায়, যে-কোনও বিপদে নিশ্চিন্তে ওর উপর নির্ভর করা যায়, ভরসা করা যায় চোখ বুজে, নিবিড় ভাবে কাছে টানা যায়, কিন্তু... চিরতরে বেঁধে রাখা যায় না কোনও শক্ত বাঁধনে। যেমন হঠাৎ করে এসেছে

ওর জীবনে, ঠিক তেমনি বোধহয় হঠাৎ করেই চলেও যাবে। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো লিমার। ফিসফিস করে লিমা বলল, 'আমি কি তোমাকে ভালবেসে ফেলছি, মাসুদ রানা?'

'কিছু বললে, সো... লিমা?' জিজ্ঞেস করল রানা। হঠাৎ করে সোহানা নামটা মুখে চলে আসায় একটু অবাক হলো ও। ...সোহানা কে? ওর প্রেয়সী? সরে গেছে অনেক দূরে? নইলে তো ওর এতদিনের অসুস্থতার মাঝে একবার হলেও যোগাযোগ করত। অতীত নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে বুঝতেই মনোযোগ অন্যদিকে সরাল রানা। 'কী যেন বলছিলে, লিমা?'

'না, কিছু না,' চুপ করে গেল লিমা, দীর্ঘশ্বাস চেপে মাথা রাখল রানার বুকে।

পরদিন সকালে নাস্তার পর স্লিপিং ব্যাগ দুটো তুলে ব্যাকপ্যাকের ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধল রানা।

লিমা আছে তাঁবুর আরেকদিকে, প্লাস্টিকের শেষ গজালটা মাটির গভীর থেকে তুলছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে খেলা শুরু করবার চেষ্টায় মাঝে মাঝে মাটিতে পড়ে থাকা গজাল কামড়াচ্ছে হান্টার, মুখ দিয়ে নেড়ে এদিক-ওদিক ফেলছে।

কাজের ফাঁকে কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা চামড়ার ক্যামেরা কেসটার দিকে চোখ গেল লিমার। একটু থমকে গেল ও। যেখানে রেখে ভুলে গিয়েছিল ওটার কথা, সেখানে নেই ওটা, সরানো হয়েছে। কাজটা সম্ভবত কোনও র‍্যাকুন-এর। বাইরের একটা পকেট আচ্ছামত চিবিয়েছে ওটা। পকেটের কাছে মাটিতে পড়ে থাকা গুঁড়ো ও ছেঁড়া কাগজ দেখে মনে হলো ভিতরে খাবার কিছু ছিল। পকেটের চারপাশেই কামড়ের দাগ। খাবার খুঁজতে গিয়ে ওগুলো তৈরি করেছে র‍্যাকুন। স্ট্র্যাপ ধরে কেসটা তুলল লিমা, খেয়াল করেনি যে উপরের ফ্ল্যাপটার বাকল লাগানো নেই, ফলে ক্যামেরা ও লেন্স ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওগুলো আবার কেস-এ

ভরতে গিয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা চোখে পড়ল লিমার।

কেস-এর ভিতরের দিকে তলায় আছে ক্যামেরাটা, অথচ বাইরে থেকে দেখলে কেসটার গভীরতা আরও বেশি মনে হয়, যেন ফলস বটম আছে ওটার। এমনিতে বোঝা যেত না কিছুই, কিন্তু র‍্যাকুনটা ফলস বটমের গায়ে বড় একটা ফুটো করেছে, যে-কারণে বোঝা যাচ্ছে, কেসটার আসল তলি আরও নীচে।

ক্যামেরাটা সরিয়ে কেস-এর ভিতরটা ভালমত দেখল লিমা। ফলস বটম যে বানিয়েছে, খুব দক্ষতার সঙ্গে করেছে সে কাজটা। খালি চোখে কিছু বোঝা প্রায় অসম্ভব। ক্যামেরা কেস পাশ ফিরিয়ে মাটিতে রাখল ও, তারপর র‍্যাকুনের তৈরি ফুটো দিয়ে গোপন কম্পার্টমেন্টে ঢুকিয়ে দিল দুটো আঙুল। টানতেই ছিঁড়ে গেল নকল তলির নরম চামড়া। ফাঁকটা বড় হতেই হাত ভরে কয়েকটা জিনিসের স্পর্শ পেল লিমা, বের করে আনল ওগুলো।

একটা পাসপোর্ট, অ্যাড্রেসবুকের মতো আকারের চামড়ার কালো একটা বই ও চামড়া-মোড়ানো পাতলা একটা আয়তক্ষেত্রাকার বাক্স।

পাসপোর্টটা ওয়েস্ট জার্মানির, উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ইশ্যু করা হয়েছে পল হাইনরিখের নামে। যে তারিখে ইশ্যু করা হয়, তার ছ'সপ্তাহ পর আমেরিকান কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশনের এন্ট্রি স্ট্যাম্প আছে পাসপোর্টে। পাসপোর্টটা ব্যবহৃত হয়নি আর কখনও। অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে পাসপোর্টের মেয়াদ। পার্সোনাল ইনফর্মেশন-এর পাতায় ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা গেল পল হাইনরিখ অবিবাহিত ছিলেন, মিউনিখে জন্মেছিলেন উনিশশো উনিশ সালে। জার্মানিতে তাঁর শেষ ঠিকানা ছিল ল্যান্ডসবার্গ। ছবিটা পল হাইনরিখেরই। বাহান্ন বছর আগের ছবি, তবে মৃত বুড়োমানুষটার মুখের সঙ্গে বেশ মিল আছে যুবক পল হাইনরিখের।

পাতলা বাক্সটা খুলল লিমা। ভিতরের জিনিসটা দেখে

মিলিটারি ডেকোরেশন বলে মনে হলো ওর। কালো রঙের লকেটের আকৃতিটা জার্মান ক্রস-এর মতো, বর্ডারগুলো রূপালী। মাঝখানে একটা স্বস্তিকা চিহ্ন। পিছনে "১৯৩৯" এনগ্রেভ করা। লকেটের চওড়া ফিতেটা লাল, দু'পাশে কালো-সাদা ডোরা। ফিতের মাঝখানটা যেখানে ক্রস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেখানে রয়েছে রূপার তৈরি কিছু ছোট ছোট পাতা। পাতাগুলোর তলায় ক্ষুদ্রাকৃতি রূপার তরবারী। ডেকোরেশনটা সরিয়ে রেখে চামড়া মোড়ানো পাতলা বইটার দিকে মনোযোগ দিল লিমা।

কভারটা খয়ে গেছে, সোনার এমবস করা লেখাগুলোও এখন অস্পষ্ট, তবে পড়া যায় বাক্সটা কাত করে আলোর দিকে ধরে লেখাগুলো পড়ল লিমা। জার্মান ভাষায় লেখা কথাগুলো পল হাইরিখের পদমর্যাদা সম্বন্ধীয় বলে মনে হলো ওর।

SS--GRUPPENFUEHRER und COLONEL-LEUTNANT der WAFFEN-SS-PAUL HEINRICH

SS-WIRTSCHAFTS und VERWALTUGS-HAUPTAMT UNTER den EICHEN 126-135

BERLIN-LICHTERFELDE

বোধহয় পল হাইনরিখের মিলিটারি টাইটেল, সেই সঙ্গে ঠিকানা, আন্দাজ করল লিমা। বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে শুরু করল ও। প্রথম চার পৃষ্ঠায় সারি সারি সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নেই। বাকি পৃষ্ঠাগুলো সাদা, লেখা হয়নি কিছুই। শেষের পাতা ও পিছনের কভারের ভাঁজ থেকে উঁকি দিল অস্পষ্ট, ঝাপসা একটা ছবি। ছবিটা পল হাইনরিখের। তরুণ বয়সে তোলা। পরনে মিলিটারি ইউনিফর্ম, এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে আছেন অভিজাত চেহারার এক সুন্দরী তরুণীর। লিমার মনে হলো, বাইশের বেশি হবে না তরুণীর বয়স। খেয়াল করল এইমাত্র যে

মিলিটারি পদকটা ও দেখেছে, সেটা পরে আছেন পল হাইনরিখ। ফটোগ্রাফের পিছনে কেউ লিখে রেখেছিল: **'MÜNCHEN–Oktober--1942'**

সংখ্যাগুলোতে আবার চোখ বুলাল লিমা, কৌতূহল বোধ করছে।

তাঁবুর খুঁটি তুলবার কাজ কতদূর এগোল দেখতে এলো রানা। বইটা থেকে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল লিমা, জিজ্ঞেস করল, 'জার্মান ভাষা জানো তুমি, রানা?'

'কী জানি! কোনও একসময় শিখেছিলাম বোধহয়,' অনিশ্চিত স্বরে বলল রানা। 'জানি না বিদ্যেটা এখনও পেটে আছে কি না।'

কালো রঙের ছোট বইটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল লিমা। 'চেষ্টা করে দেখো তো, কভারের লেখাগুলোর মানে বোঝো কি না।'

জার্মান ভাষা যে পানির মতো সহজ, সেটা লেখাগুলোয় চোখ বুলিয়ে টের পেয়ে অবাক হয়ে গেল রানা নিজেই। বক্তব্যটা পড়ে লিমার দিকে তাকাল ও। 'কোথায় পেলে এটা?'

রানার দিকে অবাক চোখে তাকাল লিমা। 'তা হলে তো স্মৃতি পুরোপুরি নষ্ট হয়নি তোমার, রানা! ...কী লিখেছে?'

'ওয়্যাফেন এসএস-এর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলেন পল হাইনরিখ, এসএস ইকোনোমিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসে পোস্টিং ছিল। ঠিকানাটা বার্লিনের। এসএস-এ তাঁর পদবী ছিল গ্রুপেনফুয়েরার।' একটা কথা মনে পড়ায় বলল রানা, 'তার মানে পল হাইনরিখ এসএস-এর খুব সম্ভাবনাময় অফিসার ছিলেন।'

'আর এটা?' মিলিটারি ডেকোরেশন-এর বাক্সটা রানার হাতে দিল লিমা।

মেডেলটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা। খানিকটা আনমনে বলল, 'বুঝলাম। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানির সবচেয়ে সম্মানজনক, দুর্লভ পদক। নাইটস ক্রস, সেই

সঙ্গে ওক গাছের পাতা আর আড়াআড়ি তলোয়ার। অত্যন্ত যোগ্য, দক্ষ যোদ্ধা না হলে এই পদক পেতেন না পল হাইনরিখ। ...জখমের চিহ্ন দেখেছিলাম তাঁর বাহুতে, বোধহয় সেজন্যেই পরে তাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে এসএস ইকোনোমিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসে পোস্টিং দেয়া হয়।'

'ডেথ-ক্যাম্পগুলোর নৃশংস ভয়াবহতার জন্যে এসএস-রা দায়ী ছিল না?' রানার হাতে পল হাইনরিখের তরুণ বয়সের ছবিটা দিল লিমা।

'অন্যান্য আরও অনেক বীভৎস কাণ্ড-কারখানার পাশাপাশি ডেথ-ক্যাম্প-এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্বেও ছিল এসএস,' বলল রানা। ছবিটা এক পলক দেখে এবার যেন ইতিহাসের বই থেকে গড়গড় করে বলে গেল ও, 'পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে আগে বা পরে কখনও আর একসঙ্গে অতজন দুর্দান্ত লড়াকু যোদ্ধা জড় করা সম্ভব হয়নি। একটা বই পড়েছিলাম, লিখেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এমন একজন নামকরা জেনারেল। লিখেছিলেন, "যুদ্ধ করে জার্মানদের হারাতে পারিনি আমরা, দশগুণ বেশি মৃত্যুর বিনিময়ে ওদের আমরা আত্মসমর্পণ করাতে পেরেছিলাম মাত্র।" সামান্য যতটুকু জানি, তাতে মিথ্যে লেখেননি ভদ্রলোক।'

চিন্তিত চোখে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লিমা, তারপর বলল, 'রানা, আমার মনে হয় গোপন তাৎপর্য আছে এমন কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছি আমরা। ভুলও হতে পারে আমার, তবে মনে হয়, এগুলো এভাবে লুকিয়ে রাখার পেছনে বিশেষ কোনও কারণ আছে ভদ্রলোকের।' বহুদূরে চলে গেল লিমার উদাস দৃষ্টি, তারপর নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল ও, 'এমনও তো হতে পারে, আসলে পল হাইনরিখ একজন পলাতক যুদ্ধাপরাধী?'

'মনে হয় না,' বিনা দ্বিধায় বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে নিজের নাম

বদলাতেন তিনি।'

'হয়তো বদলেছেন। পাসপোর্টটা ভুয়া।'

'কিন্তু অ্যাড্রেস বুক?' আবার দ্বিমত পোষণ করল রানা, 'উনি যদি লুকিয়ে থাকতে চাইতেন, তা হলে ভুলেও কোনও এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেলের পরিচয় গ্রহণ করতেন না।'

সায় দিতে বাধ্য হলো লিমা। তারপর বলল, 'কিন্তু নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে জিনিসগুলো এভাবে ফলস বটমে লুকিয়ে রাখার।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'বিশ্বযুদ্ধের পর এসএস আর্মি অফিসার পরিচয়টা ছিল অত্যন্ত বিব্রতকর তা ছাড়া, ওই ফটো আর অ্যাড্রেস বুকের সঙ্গে হয়তো কোনও মধুর স্মৃতি জড়িয়ে ছিল তাঁর। নাইটস ক্রসটার কারণে উনি যে গর্ব বোধ করতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলস বটমে এসব রেখেছিলেন হয়তো অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতেন বলে, একইসঙ্গে চেয়েছিলেন কৌতূহলী মানুষ তাঁর অতীত নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করুক।' একটা কথা মনে হতেই একটু থমকে গেল রানা।

ঠিক ওর মনের কথাটাই প্রশ্ন আকারে বেরিয়ে এলো লিমার মুখ থেকে। 'কিন্তু ভদ্রলোকের কেবিনের ওই লোক দু'জন, রানা? ওরা কেন বিনা উস্কানিতে হামলা করে বসল তোমার ওপর?'

'জানি না,' মন অন্যদিকে সরানোর জন্য তাঁবু গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। একটু পর বলল, 'পিকআপ পর্যন্ত আগে পৌঁছাই, তারপর শহরে ফেরার আগে একবার হের হাইনরিখের কেবিনে ঢুঁ মারব।'

মৃদু হাসল লিমা। 'আমি বোধহয় তোমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছি, রানা?'

'সন্দেহ-বাতিক খুব ছোঁয়াচে রোগ,' জবাবে বলল আত্মমগ্ন রানা।

*

পল হাইনরিখের কেবিনে খুঁজে এমন কিছু পাওয়া গেল না, যেটা থেকে বোঝা যায়, কেন ওই লোক দুটো রানাকে ওভাবে মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

কেবিনের ভিতরটা পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো, সব যেন ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। নিঃসঙ্গ মানুষের ব্যবহৃত পাহাড়ি একটা কেবিনে যা থাকা উচিত, তার বেশি কিছুই নেই।

রানা হতাশ হলেও দমল না লিমা, নিজের ধারণায় স্থির থাকল: ক্যামেরা কেস-এ পাওয়া জিনিসগুলোর সঙ্গে কেবিনে আসা সেই লোক দুটোর কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে। তবে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে জোরাজুরি করল না; পাহাড়ি, এবড়োখেবড়ো পথে শহরে ফিরবার সময় পিকআপের সিটে চুপ করে বসে থেকে চোখ বুলাল ছোট বইটার সংখ্যা-লেখা পৃষ্ঠাগুলোয়।

অ্যাজাক্স পাহাড়ের চূড়ার কাছে পথের সরু একটা বিপজ্জনক অংশ আছে। ওখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নেবার সময় হঠাৎ রানার দিকে ফিরে তাকাল লিমা, শক্ত করে ওর বাহু ধরে ঝাঁকি দিল বারকয়েক। ঝাঁকি লেগে স্টিয়ারিং হুইলটা ক্ষণিকের জন্য ছুটে গেল রানার হাত থেকে। নিয়ন্ত্রণ হারাল পিকআপ, চলে এলো গভীর খাদের কিনারায়। পিকআপের আচমকা বেসামাল নড়াচড়ায় গাড়ির উপর পড়ে যেতে গিয়েও পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামলে নিল হান্টার। ক্ষিপ্র হাতে স্টিয়ারিং ধরল আবার রানা।

'ধরতে পেরেছি, রানা!' উত্তেজিত স্বরে বলল লিমা, রানার নাকের কাছে দ্রুত নাড়ল অ্যাড্রেস বুক। 'কোড! কাগজগুলোতে কোড লেখা আছে! আমার কথা সত্যি না হলে মরতে রাজি আছি আমি!'

'আসলেও মরতেই যাচ্ছিলে,' পিকআপ থামিয়ে হাঁপ ছেড়ে বলল রানা। 'খাদটা এখানে সরাসরি নেমে গেছে অন্তত দেড়শো ফুট।'

হাঁ করে থাকা কালো খাদের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল লিমা, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত! বুঝতে পারিনি এরকম কিছু ঘটতে পারে!'

পিকআপের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। 'সংখ্যাগুলোকে কোড মনে হলো কেন তোমার?' চিন্তাটা ওর মাথাতেও দোলা দিয়ে গিয়েছিল, ঠিক করেছিল, পরে সময় করে অ্যাড্রেস বুকটা ভাল করে ঘেঁটে দেখবে।

'কোড ছাড়া আর কী হবে!' বলল লিমা। 'সত্যি যদি কোড হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই গোপন কোনও তথ্য আছে পল হাইনরিখ বা আর কারও সম্বন্ধে। তা না হলে কষ্ট করে এনকোড করতে যাবে কেন? হেলিকপ্টার নিয়ে কেবিনে খুঁজতে আসা লোক দুটো বোধহয় এই বইটার জন্যেই এসেছিল। ...রানা, কোড ভাঙার ব্যাপারে কিছু জানো তুমি?'

'সামান্য,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল রানা। 'ওটুকু জ্ঞানে চলবে কি না জানি না।' একটু থেমে বলল ও, 'তবে একজনকে চিনি, উনি হয়তো পারবেন ওই সংখ্যাগুলো ডিকোড করতে।'

নয়

টুলে বসে আছেন ক্লান্ত ডেযমন্ড হেইঞ্জ, শেলফে নতুন আসা বইগুলো রাখতে গিয়ে কাত হলেন বৃদ্ধ, কোমরের ব্যথায় গাল কুঁচকে উঠল তাঁর। আজকে খারাপ দিনগুলোর একটা, বললেন বিড়বিড় করে। ব্যথাটা সবসময় যেমন থাকে, আজকে তার চেয়ে

বেশি, দপদপ করছে। সেই উনিশশো তেতাল্লিশ সাল থেকে সহ্য করছেন তিনি ভাঙাচোরা হিপ-এর এই ব্যথা। খাঁটি জার্মান হওয়া সত্ত্বেও হিটলার-বিরোধী শিবিরে ছিলেন বলে নাৎসি ডেথ-ক্যাম্প বুশেনওয়াল্ডে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। সেখানে ইন্টারোগেশনের সময় রাইফেলের বাঁট-এর একের পর এক বাড়িতে ভেঙে দেয়া হয়েছিল তাঁর হিপ। কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি, কিচ্ছু না। স্রেফ মরবার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিল তারা ওঁকে। একসময় আপনাআপনি জোড়া লেগেছে তাঁর হিপ, কিন্তু শীর্ণ শরীরটা হয়ে গেছে কাত। ডানদিকে কাত হয়ে চলতে বেশ কষ্ট হয় তাঁর।

ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা হের হেইঞ্জের চেহারায় তাদের ছাপ ফেলেছে, ফলে রূঢ়, সন্দেহপ্রবণ মানুষ মনে হয় তাঁকে দেখলে। তবে আদতে তাঁর মতো নরম, দয়ালু মানুষ খুব কমই হয়। ভদ্রলোকের নীরবে কথা বলা মায়াভরা চোখ দুটো প্রকাশ করে দেয়, সত্যিকারের ভাল একজন মানুষ তিনি। বাচ্চারা সহজেই বোঝে, যে-কারণে নামতে চায় না একবার তাঁর কোলে উঠলে।

বুশেনওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এর নরক-অত্যাচার থেকে আগের সেই সাহসী, ন্যায়নিষ্ঠ, ভালমানুষটা অক্ষতই বেরিয়ে এসেছিল—তবে শারীরিক ভাবে নয়, মানসিক ভাবে।

রিসিটগুলো দেখে সারাদিনের বিক্রির হিসাব করতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্যাশ কাউন্টারের কাছে চলে গেলেন ডেযমন্ড হেইঞ্জ, রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দোকানের সামনের বাঁকে এসে থেমেছে টকটকে লাল রঙের পরিচিত সেই পিকআপ। ওটা থেকে নামল মাসুদ রানা নামের আশ্চর্য প্রাণবন্ত ছেলেটা। আজকে ওর সঙ্গে মিষ্টি দেখতে চমৎকার এক তরুণী মেয়েও আছে। রানার কপালের একপাশ ফুলে আছে দেখতে পেয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল হের হেইঞ্জের।

হান্টারকে পিকআপেই বসে থাকতে নির্দেশ দিল রানা, তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে পা বাড়াল তাঁর দোকানের দিকে।

হান্টারের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন হের হেইঞ্জ, জার্মান কুকুর দেখলে ডেথ-ক্যাম্পের সেইসব বিভীষিকাময় আতঙ্কজনক দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় তাঁর।

মাঝে মাঝে তাঁর দোকানের কাজে নানানরকম সাহায্য করে মাসুদ রানা, ছেলেটার সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করেন তিনি, তবে প্রথমদিনের আলাপে ঘনিষ্ঠতা হবার পরপরই রানাকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, কুকুরটাকে যেন দোকানে না নিয়ে আসে ও, কুকুরের লোমে অ্যালার্জি আছে তাঁর। সেই থেকে হান্টারকে বাইরে বসিয়ে রাখে রানা।

তবে হের হেইঞ্জ সত্যি কথা বলেননি রানাকে। কুকুরের লোমে অ্যালার্জি নেই তাঁর। কালো-খয়েরী রঙের বিরাট ওই রটওয়াইলারটাকে দেখলেই অনেকদিন আগের গা-শিউরানো একটা দৃশ্য বারবার হানা দেয় তাঁর মনে। দু'জন এসএস গার্ড বন্দিদের সামনে একটানা পায়চারি করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল, বিকৃত আনন্দ পাবার জন্য এক ইহুদি বন্দির উপর সঙ্গের রটওয়াইলারটাকে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দেয় তারা। বিশালাকৃতি, ক্ষিপ্র কুকুরটা ডেযমন্ড হেইঞ্জের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল অসহায় লোকটাকে। কয়েকশো টুকরো করতে পুরো পাঁচ মিনিটও লাগেনি ওটার। বিকৃত-রুচি এসএস গার্ডদের দমফাটানো, পৈশাচিক হো-হো হাসির আওয়াজ আর মৃত্যু-পথযাত্রী বন্দির তীক্ষ্ণ; করুণ আর্তচিৎকার এখনও যেন শুনতে পান হের হেইঞ্জ। যুক্তিবাদী মানুষ তিনি, ভাল করেই জানেন, হান্টার ওরকম কিছু করবে, সেটা ভেবে নেয়া তাঁর ঠিক নয়, তবে জন্তুটার স্বভাব ও নিষ্পলক চোখের উদ্ধত দৃষ্টি তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

দরজার কাছে চলে এসেছে রানা, ওর পাশের সুন্দরী তরুণীর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন হের হেইঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গেলেন, এই মেয়ে স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব

নেই এর। দু'জনকে মানিয়েছেও দারুণ, বললেন মনে মনে। রানার হাঁটাচলার ভঙ্গিতে বুঝতে তাঁর দেরি হলো না, মেয়েটি প্রেয়সী হতে চলেছে প্রাণবন্ত যুবকের।

'তোমার এই অবস্থা হলো কী করে, মাই সান?' রানার কপালের ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হের হেইঞ্জ।

'মারামারি, হের হেইঞ্জ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। 'লিমা, ইনি হের ডেযমন্ড হেইঞ্জ,' দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল ও। 'হের হেইঞ্জ, ও মিস সোরেনসন, লিমা সোরেনসন।'

লিমার হাতটা আলতো হাতে তুলে নিয়ে মৃদু হাসলেন হের হেইঞ্জ। তাঁর মনে হলো, আগে অ্যাসপেনে দেখেননি লিমাকে। বললেন, 'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস সোরেনসন। ...তুমি বোধহয় অ্যাসপেনে বেড়াতে এসেছ?'

'জী,' বলল লিমা। 'আমারও ভাল লাগছে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে। আপনার কথা অনেক শুনেছি রানার কাছে।' জার্মান ভদ্রলোকের ভরাট, আন্তরিক কণ্ঠস্বর ও উষ্ণ আচরণটা ভাল লাগল ওর। 'খুব সুন্দর একটা হ্রদের তীরে ক্যাম্প করেছিলাম আমরা, এইমাত্র ফিরছি ওখান থেকে।'

'ক্যাম্পিং? চমৎকার! রানা খুব ভাল গাইড, সুন্দর সুন্দর সব জায়গা চেনা আছে ওর।' লিমার হাত ছেড়ে রানার দিকে তাকালেন হের হেইঞ্জ। 'খবরের কাগজে পল হাইনরিখের মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম। খুব দুঃখজনক।'

'মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল,' নরম স্বরে বলল রানা, হের হেইঞ্জ কাউন্টারে হেলান দিয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বুঝতে পারল, ভদ্রলোকের ব্যথাটা বেড়েছে আবার। অসুস্থতা নিয়ে কথা বললে বিব্রত হন হের হেইঞ্জ, কাজেই এ-ব্যাপারে কিছু বলল না ও। 'একটা কাজে এসেছিলাম আপনার কাছে, হের হেইঞ্জ।'

কথাটা যেন শুনতে পাননি হের হেইঞ্জ, বললেন, 'চার্লস রবিনসনের মৃত্যুটা আমাকে সত্যিই দুঃখ দিয়েছে। জানি, তোমার

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ও। মনটা ভাল ছিল পাগলাটে ছেলেটার। এভাবে মারা যাবে... ফিউনারেল কি আগামীকাল?'

হতবাক হয়ে হের হেইঞ্জের দিকে তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ফিউনারেল? কী বলছেন? ...রিচি মারা গেছে?' বেসুরো শোনাল ওর কণ্ঠ।

'দুঃখিত,' নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে বললেন হের হেইঞ্জ, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি জানো।'

'কী হয়েছিল ওর?' দুঃসংবাদটা বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। হের হেইঞ্জের মুখে খুঁজছে হাসির আভাস।

'আমেরিকা হ্রদে ওকে পায় কয়েকজন টুরিস্ট,' বললেন হের হেইঞ্জ। 'পুলিশ ধারণা করছে পাহাড়ের উপর থেকে হ্রদের অল্প পানিতে ডাইভ দেয়ায় ঘাড় ভেঙে মারা গেছে ও।'

'আমেরিকা হ্রদে কী করছিল ও?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রানা। ওর মনে পড়ে গেল, চার্লি পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরতে পছন্দ করত না একদম।

দুঃখিত চেহারায় সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়লেন হের হেইঞ্জ। বুঝতে পারলেন না রানার প্রশ্নের জবাবে কী বলবেন। 'খবরের কাগজে আর কিছু লেখেনি।'

'স্বাভাবিক মৃত্যু নয়,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'হলফ করে বলতে পারি, আমেরিকা হ্রদে ও নিজে যায়নি। পানিতে ঝাঁপ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না ওর। সাঁতার জানত না বলে অল্প পানিতে নামতেও ভীষণ ভয় পেত।'

রিচি রবিনসন গাঁজার নেশা করত, সেটা জানেন ডেয়মন্ড হেইঞ্জ, একবার ভাবলেন বলবেন কি না যে, নেশাতুর হয়ে বে-ঘোরে হয়তো ঝাঁপ দিয়েছিল বেচারা। কিন্তু ও-ধরনের কিছু বলা উচিত হবে না বুঝে মুখ বুজে রইলেন। পাগলাটে, বেপরোয়া রবিনসনের প্রতি রানার গভীর সহানুভূতির কারণটা কখনোই ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। তবে এটা তাঁকে স্বীকার করতে

হলো, দোকানে এলে কখনও তাঁর সঙ্গে তিলমাত্র অভদ্র আচরণ করেনি রবিনসন। রানার দিকে তাকালেন হের হেইঞ্জ। 'পুলিশের সঙ্গে কথা বললে হয়তো আরও কিছু জানতে পারবে।'

'তা-ই করব,' দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'আসি তা হলে, পরে ফোন করব আপনাকে, তখন বলব কী জন্যে এসেছিলাম।'

'দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি,' বললেন হের হেইঞ্জ, 'বিকেলটা বাসাতেই থাকব। ফোন কোরো।' লিমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'গুডবাই, মিস সোরেনসন। আশা করি আবারও দেখা হবে আমাদের।'

'গুডবাই ফর নাউ, মিস্টার হেইঞ্জ,' আন্তরিক হাসল লিমাও। হের হেইঞ্জের ছানি-পড়া চোখে বিষাদের ছাপ চিনতে ভুল হলো না ওর, বুঝতে পারল, ছিটগ্রস্ত চার্লস রবিনসনের আকস্মিক মৃত্যু সহজভাবে নিতে পারেননি তিনিও।

পুলিশ-স্টেশনের পথে রওনা হয়ে চার্লির মৃত্যুর কারণ গাঁজা বা অন্য কোনও ড্রাগের নেশা কি না, সেটা ভাবল রানা। যুক্তিতে মেলে না বলে বাদ দিল সম্ভাবনাটা। কতটা নেশা হলে ড্রাগ নেয়া থামাতে হবে, সেটা খুব ভাল করেই জানত চার্লি।

'চার্লস রবিনসন কে?' একটু পরে নীরবতা ভাঙল লিমা।

'আমার বন্ধু,' শান্ত স্বরে বলল রানা। কোনও আবেগ প্রকাশ পেল না ওর কণ্ঠে। 'খুব ভাল একজন বন্ধু। এমন একজন মানুষ, যাকে প্রয়োজন শেষে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আমেরিকান সরকার। অথচ জনগণের ভোটে নির্বাচিত লোভী, ক্ষমতাশালী, রাজনীতিকদের তুলনায় হাজারগুণ ভালমানুষ ছিল ও।'

পুলিশ-স্টেশনে একজন মাত্র পুলিশ অফিসার ডিউটি দিচ্ছে। দেখেই বখাটে চেহারার তরুণকে চিনতে পারল রানা, পল হাইনরিখের মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ওকে জেরা করতে এসেছিল এ-ই।

এখন সে ডেস্কের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিরাট একটা পিৎযা খাচ্ছে। আগন্তুকদের পায়ের আওয়াজে পিৎযার বাক্স ডেস্কের উপর নামিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকাল। লিমার উপর প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ আটকে থাকল তার দৃষ্টি। 'আবার আপনি,' বলে উঠল রানাকে চিনতে পেরে। কপাল কাটা কঠোর চেহারার লোকটাকে পছন্দ হলো না তার। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপনাকে করার মতো আর কোনও প্রশ্ন নেই আমার, নইলে ডেকে পাঠাতাম।'

'কারও প্রশ্নের জবাব দিতে এখানে আসিনি আমি,' তরুণ পুলিশের দাম্ভিক ভাব দেখে রেগে যাওয়ায় একটু তীক্ষ্ণ শোনাল রানার কণ্ঠ। 'চার্লস রবিনসনের মৃত্যু সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চাই বলে এসেছি।'

'কী জানতে চান?'

'মৃত্যুর কারণ।'

'চিফ বলেছেন, লোকটা অনেক ওপর থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিল। ঘাড় ভেঙে মারা পড়ে। ডুবে যায় সঙ্গে সঙ্গে।'

'আর কেউ ছিল ওর সঙ্গে? বা ক্যাম্পিং করার ইকুইপমেন্ট নিয়ে গিয়েছিল ও?'

'আমার অন্তত জানা নেই।' উঠে দাঁড়িয়ে একটা ফাইল কেবিনেটের ড্রয়ার টেনে খুলল তরুণ অফিসার, ওটা থেকে বের করল একটা ক্যামেরা, কোঁচকানো কয়েকটা ডলার। ওগুলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডেস্কের উপর রেখে আবার বসে পড়ে বলল, 'এগুলো ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

ক্যামেরাটা একপলক দেখেই চিনতে পারল রানা। এই লাইকা ক্যামেরাই রয়েছে পল হাইনরিখের ক্যামেরা কেস-এ। তবে চার্লির কাছে পাওয়া এটা ভিনটেজ মডেলের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তৈরি। গায়ে খোদাই করে লেখা: মেড ইন জার্মানি। অফিসারের দিকে তাকাল রানা। 'করোনার তাঁর

রিপোর্টে কী লিখেছেন, কোনও ধরনের ড্রাগ পাওয়া গেছে রবিনসনের সিস্টেমে?'

কর্কশ আওয়াজ করে হাসল তরুণ। 'রিপোর্ট আমি পড়িনি, জানতে চাইলে চিফকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার। তবে ওই ব্যাটা সর্বক্ষণ যেরকম নেশা করে থাকত, বুঝতে আমার দেরি হয়নি, পড়ার সময় পুরো টাল ছিল গাধাটা।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার শরীর। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হলো ওর। এক ঘুসিতে বেয়াড়া ছোকরার নাকটা চ্যাপ্টা করে দেয়া ঠিক হবে না মোটেই, সতর্ক করল নিজেকে। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'এধরনের মতবাদ নিজের কাছে রাখাই স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল, মিস্টার ডবনি। আমার বন্ধু ছিল চার্লি রবিনসন।'

'তা হলে বলতে হয়, আপনিই ছিলেন তার একমাত্র বন্ধু,' পুলিশী ব্যাজ-এর জোগানো বাড়তি সাহস তরুণ অফিসার ডবনিকে খানিকটা বেপরোয়া করে তুলেছে। একই সঙ্গে অপরূপা লিমা সোরেনসনের উপস্থিতি দায়িত্ববান ও কতর্ব্যপরায়ণ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপনের তাগিদও দিচ্ছে তাকে। উসখুস করে উঠে সে বলল, 'বদমাশটা সেদিন আরেকটু হলেই ব্যাঙ্কের সামনে খুন করে ফেলছিল একটা মেয়েকে। ওর মতো একটা গর্দভ পাহাড় থেকে হ্রদে লাফ দিয়ে পড়ে মরে গেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।'

যথেষ্ট শুনেছে রানা, একটু সামনে ঝুঁকল ও, তারপর হাতের ঝাপ্টায় পিৎযার খোলা বাক্সটা কাত করে ফেলে দিল তরুণের কোলে। টমেটো কেচআপে মাখামাখি হয়ে গেল ডেপুটি ডবনির শার্ট-প্যান্ট।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'আরেকবার বলো কী বলছিলে।'

রানার দিকে মুখ তুলে তাকাল হতচকিত পুলিশ অফিসার, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক একটা ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে খালিহাতে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হলো তার। কপাল-কাটা কঠোর চেহারার লোকটা মেরে বসবে ভেবে ঘনঘন ঢোক গিলল সে

বারকয়েক।

রানার কণ্ঠের শীতল হুমকিতে চমকে গেছে লিমাও, নতুন করে উপলব্ধি করল, ক্ষিপ্ত রানাকে আসলে তিলমাত্র চেনে না ও।

চট্ করে রানার বাহুতে হাত রাখল লিমা। 'প্লিয, রানা! শান্ত হও। চলো!'

সম্বিত ফিরে পেয়ে এবার সাহস ফিরে পাবার আশায় কোমরে ঝোলানো রিভলভারের বাঁটে হাত রাখল তরুণ পুলিশ।

নিঃশব্দ হাসিতে ঠোঁট প্রসারিত হলো রানার, জ্বলে উঠল চোখ জোড়া। 'গুলি করার ইচ্ছে থাকলেই শুধু বের কোরো ওটা। গুলি যদি তাড়াতাড়ি করতে না পারো, তা হলে অস্ত্রটা তোমার পেছনদিক দিয়ে ভরে দেব আমি, প্রকটোলজিস্টদের টিম লাগবে ওটা নোংরা থেকে বের করে আনতে।'

'যথেষ্ট হয়েছে, রানা!' আতঙ্কিত হয়ে উঠল লিমা, রানার বাহুতে ঘনঘন ঝাঁকি দিল। অনুনয় করে বলল, 'চলে এসো, রানা, প্লিয!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছাল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। এবার সাহস ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল শার্ট-প্যান্টে পিৎযার মসলা মাখা অপদস্থ তরুণ অফিসার, কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'মিস্টার, তোমাকে গ্রেফতার করছি আমি!'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'কী অভিযোগে? কার্পেটে হোঁচট খেয়েছিলাম বলে গ্রেফতার?' সোজা দরজার দিকে হাঁটা দিল ও লিমাকে পাশে নিয়ে। 'যদি জেরা করার প্রয়োজন পড়ে, তা হলে খুঁজে নিয়ো আমাকে।'

রাগে কথা বলতে পারল না ডেপুটি শেরিফ ডবনি, হাঁ করেও খপ করে বন্ধ করল মুখটা। বুঝতে পারল না কী করা উচিত তার এখন।

'খুব দেখালে, রানা,' পিকআপে উঠবার পর বলল লিমা। 'কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো? পুলিশ-স্টেশনে ঢুকে পুলিশের

অফিসারকেই হেনস্থা করা! জিযাস!'

'রেগে গিয়েছিলাম বলে আমি তোমার কাছে মাফ চাইছি, বলল রানা। 'তবে ওই বেয়াদব লোকটার সঙ্গে যে আচরণ করেছি, সেজন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই।'

আলতো করে রানার বাহু স্পর্শ করল লিমা। 'বুঝতে পারছি, চার্লিকে সত্যিই খুব ভালবাসতে তুমি।'

'ভালবাসবার মতো মানুষ ছিল ও,' পিকআপ ঘুরিয়ে বাংলোর পথ ধরল রানা। 'ও ছিল একেবারে খাঁটি সোনা।'

ওরা বাংলোয় পৌঁছুনোর পর আধঘণ্টা পেরোবার আগেই বাঁকা, সরু পথ ধরে পুলিশের গাড়িটাকে আসতে দেখে অবাক হলো না রানা। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামিয়ে নামলেন পুলিশ চিফ, শেরিফ জন ব্রিকার।

লম্বা-চওড়া মাঝবয়সী মানুষ জন ব্রিকার, টেক্সাসের সুরে টেনে টেনে ইংরেজি বলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ কয়েকবার গলফ ক্লাবে দেখা হয়েছে রানার, আলাপও হয়েছে তখন। মানুষটাকে ভাল লেগেছে ওর, তবে এটাও বুঝেছে, যেসব আইন নিজে উনি মন থেকে মানতে পারেন না, সেগুলোর প্রয়োগে আপত্তি আছে তাঁর।

রবিনসনের মুখে শুনেছে রানা, দক্ষিণের কোনও ছোট শহরের শেরিফ ছিলেন জন ব্রিকার, কঠোর মারিজুয়ানা-বিরোধী আইন প্রয়োগ করতে গড়িমসি করছিলেন বলে বরখাস্ত করা হয় তাঁকে ওখান থেকে। মারিজুয়ানা-সেবীদের বিরুদ্ধে কখনও যাবেন না, এটা অ্যাসপেনে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, সুতরাং অ্যাসপেন টাউন-কাউন্সিল খুশিমনে শেরিফ পদে নিয়োগ দিয়েছে তাঁকে।

জন ব্রিকার দরজায় টোকা দেবার আগেই দরজা খুলে দিল রানা, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'আসুন, শেরিফ।'

রানার হাতটা ধরে জোরে জোরে কয়েকবার নাড়লেন শেরিফ জন ব্রিকার, সেই সঙ্গে বাচ্চাদের দুষ্টমিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না,

এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ানোও চলল। নিচু, ঘড়ঘড়ে স্বরে টেনে টেনে বললেন, 'মিস্টার রানা... মিস্টার রানা... আপনি আমাকে কোণঠাসা করে ফেল...' হঠাৎ থেমে ভুরু কুঁচকে চাইলেন রানার কপালের দিকে, 'জখম হলো কী করে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম,' অম্লান বদনে মিথ্যে বলল রানা। হাতের ইঙ্গিতে ভিতরে আসতে বলল শেরিফকে।

ভদ্রলোক ঢুকতেই দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা। লিমাকে লিভিংরুম সোফায় বসে থাকতে দেখে দরজার কাছেই থমকে দাঁড়ালেন ব্রিকার, তারপর মাথা থেকে হ্যাট খুলে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে গেলেন । 'মাফ করবেন, মিসি, আপনাকে দেখিনি।'

দু'জনকে দু'জনের নাম ও পরিচয় জানাল রানা।

'প্লেযার,' গলন্ত মোমের মতো নরম শোনাল জন ব্রিকারের উষ্ণ কণ্ঠ।

মৃদু হেসে 'মাইন টু,' বলল লিমা। ভদ্রলোকের আচরণ দেখে বুঝতে পারল, লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিতে এসেছেন উনি, গ্রেফতার করতে আসেননি রানাকে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো হান্টার, বাতাসে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে খোঁৎ-খোঁৎ আওয়াজ করল নাক দিয়ে। অনিশ্চয়তায় ভুগল: গর্জন ছাড়া উচিত, না মেনে নেয়া উচিত পরিচিত গন্ধওয়ালা লোকটাকে?

'সিট!' হান্টারকে মেঝেতে বসতে বলল রানা। আরামকেদারা দেখাল জন ব্রিকারকে। 'বসুন, প্লিয?'

শরীরটা ভঙ্গুর কাঁচের তৈরি, এমন ভঙ্গিতে হান্টারের ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে বসলেন জন ব্রিকার, হ্যাটটা খুব সাবধানে রাখলেন হাঁটুর উপর। সোজা হয়ে বসে বললেন, 'মিস্টার রানা, অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছেন আপনি আমাদের জর্জ ডবনির সঙ্গে। ও চাইছে, আমি আপনাকে গ্রেফতার করি।' তাঁর লম্বাটে, তিনকোনা চেহারায় বেশ চিন্তার ছাপ দেখা দিল।

'গ্রেফতার করতেই এসেছেন?' সোফায় লিমার পাশে বসল রানা।

'না,' বললেন ব্রিকার। 'তবে মধ্যস্থতা করতে হবে এখানে আমাকে। কিছুতেই আপনার পক্ষ নিতে পারছি না আমি। ব্যাপারটা চুপচাপ হজম করে গেলে ছোট হয়ে যাব আমার লোকদের কাছে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ডবনি আপনাকে বলেছে, কী কারণে ওরকম হয়েছে?'

'ওর দিকটা বলেছে। যা বলেছে, তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। শিভালরাস একটা কচি ছেলে আমাদের ডবনি। তা ছাড়া, যতদূর মনে পড়ে, আপনার বন্ধু রবিনসনকেও পছন্দ করত না ও।' চুলে আঙুল চালালেন ব্রিকার, তারপর মাথার পিছনদিকটা খসখস করে চুলকালেন। 'কয়েক মাস আগে কী কারণে যেন ওর মাথায় কফ মেশানো থুতু ফেলেছিল রবিনসন। তাতে করে আর যা-ই হোক, রবিনসনের প্রতি ভালবাসা জন্মেনি আমাদের ডবনির।'

'কিছুটা পাগলাটে ছিল চার্লি, কিন্তু মনটা ছিল হিরের টুকরো,' গম্ভীর হয়ে গেল রানার চেহারা। 'আপনাদের ডবনি আপত্তিকর কথা বলছিল ওর সম্বন্ধে। আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম ওসব না বলতে। শোনেনি সে আমার অনুরোধ, তখন রেগে যাই আমি। চার্লি আমার বন্ধু ছিল।'

'ওর অতীত খানিকটা জানি আমি,' বললেন জন ব্রিকার। 'আর জানি বলেই বেশ কয়েকবার ওকে গ্রেফতার করতে গিয়েও করিনি। থাক ওসব, মূল সমস্যায় ফিরে আসা যাক। আমি খুব খুশি হবো আপনি অফিসার ডবনির কাছে দুঃখপ্রকাশ করলে। আরেকটা ব্যাপার, ওকে নতুন একটা শার্ট কিনে দিলে আমরা খুবই খুশি হব। শুনেছি টমেটোর দাগ কাপড়ে পড়লে ওঠানো নাকি অসম্ভব।'

রেগে গেল রানা, তবে শেরিফ ব্রিকারের অবস্থানটা বুঝে বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? আমি আপনাকে শার্টের দাম দিয়ে দেব, সেটা জর্জ ডবনিকে দিয়ে দেবেন আপনি, আর সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দেবেন, একজন মহিলার সামনে ওরকম ব্যবহার করে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত।'

আন্তরিক খুশির হাসি হাসলেন জন ব্রিকার। রানাকে গত চারমাসে যতটুকু দেখেছেন, বা ওর সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছেন, তাতে এর বেশি রানা কিছু করতে রাজি হবে বলে মনে হয়নি তাঁর। উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হ্যাট চাপালেন ব্রিকার। 'তা হলে তো মিটেই গেল সমস্যা, তা-ই না।'

'একমিনিট, শেরিফ,' বলল রানা। 'অটোপসি করে চার্লির শরীরে কোনও ধরনের ড্রাগ পাওয়া গিয়েছিল কি না বলতে পারেন?'

'ছিল না। কোনও ড্রাগ পাওয়া যায়নি। করোনার রিপোর্ট দিয়েছে: টোটালি ক্লিন।'

'ফুসফুসে পানি ছিল?'

'না।' রানার চোখে তাকালেন শেরিফ ব্রিকার। 'হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'রিচি সাঁতার জানত না।'

'জানতাম না,' গম্ভীর হয়ে গেল শেরিফের চেহারা। 'হ্রদের পানিতে ডুবে যাবার পরেও মৃতদেহের ফুসফুসে পানি ছিল না জেনে অবাক হয়েছিলাম। অবশ্য সেটা আগের কথা। পরে ওর লাশ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে কারণটা বুঝতে পারি। পাথুরে যে-তাক থেকে চার্লস রবিনসন লাফ দিয়েছিল বলে ধারণা করছি, তার বিশ ফুট নীচে সামান্য বের হয়ে আছে আরেকটা তাক। রবিনসন যদি দৌড়ে গিয়ে লাফ না দিয়ে থাকে, তা হলে নীচের তাকে মাথা দিয়ে পড়েছিল হয়তো. তখনই মারা যায় ঘাড় ভেঙে। পানিতে যখন পড়ে, তার

আগেই যদি ওর মৃত্যু ঘটে থাকে, তা হলে ফুসফুসে পানি না পাওয়ার একটা ব্যাখ্যা মেলে।'

'কিন্তু শেরিফ, যে-মানুষ পানিকে অসম্ভব ভয় পেত, সাঁতার জানত না, সেই মানুষ পাহাড়ের ওপর থেকে হ্রদের পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে—এটার কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

ব্রিকার বললেন, 'ড্রাগ নিত ও, এটা আমার মত আপনিও জানেন।'

'তারপরেও চার্লির মৃত্যু স্বাভাবিক, সেটা মেনে নিতে পারছি না আমি,' একগুঁয়ের মতো বলল রানা। 'ওর সিস্টেমে কোনও ড্রাগ পাওয়া যায়নি। এসব বাদ দিলেও, হ্রদটা যদি শহরের মাঝখানে হতো, দুর্ঘটনা বলে হয়তো মেনে নিতে পারতাম ওর মৃত্যুটাকে। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি, শহর ছেড়ে পাহাড়-জঙ্গলে স্বেচ্ছায় যায়নি ও। ওসব জায়গায় ঘোরাঘুরি একদম পছন্দ ছিল না ওর।'

'কিন্তু গিয়েছিল কোনও কারণে, এ ছাড়া লাশ ওখানে পাওয়া যাবার আর কোনও ব্যাখ্যা নেই।' কাঁধ ঝাঁকালেন শেরিফ ব্রিকার। 'তবে কথা দিচ্ছি, তদন্তে যদি অন্য কিছু বেরিয়ে আসে, তা হলে আপনাকে আমি অবশ্যই জানাব, মিস্টার রানা।'

পাহাড়ি কেবিনে ওর উপর অকারণে আক্রমণ, চার্লির মৃতদেহের কাছে পাওয়া ক্যামেরা ও পল হাইনরিখের ক্যামেরা কাকতালীয় ভাবে একই কম্পানির হওয়া—তথ্যগুলো শেরিফকে জানাবে কি না ভাবল রানা। সিদ্ধান্ত নিল, জানাবে না। দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না, সেটা নিজে আগে খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করবে ও। হঠাৎ ওর মনে হলো, এ-ধরনের কাজ আগেও করেছে ও।

'ফিউনারেল কবে?' শেরিফের সঙ্গে বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানে হবে না.' বললেন ব্রিকার। 'লাশ নিয়ে যাওয়া

হয়েছে। নিউ জার্সিতে ফিউনারেল শেষে আর্লিংটন-এর জাতীয় গোরস্তানে কবর দেয়া হবে ওকে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কেন?'

'ওটা প্রাক্তন সৈনিককে দেয়া রাষ্ট্রের শেষ সম্মান।' রানার কাছ থেকে অফিসার ডবনির নতুন শার্ট কিনবার টাকা নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন জন ব্রিকার, রওনা হওয়ার আগে বললেন, 'আপনার বন্ধুর এই করুণ পরিণতির জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল রানা। বুঝতে পারছে, ভদ্রলোকের আন্তরিকতায় খাদ নেই কোনও।

তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। কী পরিহাস! বেঁচে থাকতে যে-মানুষ ন্যূনতম প্রাপ্য সম্মান পেল না, অবহেলা-অনাদর ছাড়া যার কপালে জুটল না কিছুই, মৃত্যুর পর তার মৃতদেহটাকে সম্মান দেখানোর এই বিলাসিতা—ভণ্ডামি-নীচতা ছাড়া আর কী বলা যায় একে?

বাংলোয় ফিরে যাবার আগে পিছনের ওয়ার্কশপের পাশে চলে এলো রানা বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে। ওখানে, ক্ষীণকায়া ঝর্নার ধারে বসে প্রায়ই কাঠের কাজ করত চার্লি।

কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করে যে মহা-শক্তি, তার কাছে নীরবে প্রার্থনা করল চার্লির জন্য, তারপর বিষণ্ন মনে ফিরল বাংলোতে।

রাত আটটার পর যে-কোনও সময় রানা ও লিমাকে বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ করেছেন ডেযমন্ড হেইঞ্জ। রানার বাংলো থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছুতে বিশ মিনিটের বেশি লাগে না, তবে দেড় ঘণ্টা আগে বের হলো রানা। হের হেইঞ্জের বাড়িতে যাবার আগে আরেকটা জায়গায় যাবে, ঠিক করেছে ও।

পল হাইনরিখের বাড়ির পিছনের রাস্তায় ঢুকে পিকআপের

হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা, ইঞ্জিন বন্ধ করে ফোর হুইল ড্রাইভটাকে গড়িয়ে যেতে দিল বাড়ির গেট পর্যন্ত, থামল তারপর। আশপাশের বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে না উঁচু ঝোপের কারণে। ফাঁকা রাস্তায় কাউকে দেখল না রানা। কিছুক্ষণ হের হাইনরিখের বাড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকল পিকআপে। কোনও নড়াচড়া বা শব্দ হয় কি না সেটা খেয়াল করছে।

কৌতূহলী চোখে পাশ থেকে রানার দিকে তাকাল লিমা, বুঝতে পারল না রানার উদ্দেশ্য, তারপর হালকা স্বরে বলল, 'মনে হয় না ভদ্রলোককে বিস্মিত করতে পারব আমরা, রানা। উনি জানেন আমরা আসছি।'

'বাড়িটা হের হেইঞ্জের নয়,' বলল রানা। 'পল হাইনরিখের।'

ফটকের ফাঁক দিয়ে অন্ধকার বাড়িটার দিকে তাকাল লিমা। 'কী করতে চাইছ, রানা?'

'হের হাইনরিখের ক্যামেরা আর চার্লির কাছে পাওয়া ক্যামেরা একই কম্পানির,' বলল রানা। 'দুটোই লাইকা। আমি যতটুকু জানি, কোনও ক্যামেরা ছিল না চার্লির। ওকে একটা ক্যামেরা উপহার দিতে চেয়েছিলেন হের হাইনরিখ। চার্লি সম্ভবত ক্যামেরাটা নিতে এসেছিল এখানে। এখান থেকেই ক্যামেরাটা সংগ্রহ করে ও।'

কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে চমকে গেল লিমা। 'মাই গড, রানা! কেবিনে যে দু'জন তোমাকে মেরেছিল, ওরাই যদি এ-বাড়িতে এসে থাকে—পল হাইনরিখের কাছে কিছু খুঁজলে নিশ্চয়ই এখানেও এসেছিল—তারপর... চার্লিকে ওরা এখানে পেয়ে থাকলে...' শিউরে উঠে চুপ করে গেল লিমা। 'তুমি যখন পুলিশ অফিসার ডবনি আর শেরিফকে করোনারের রিপোর্টের কথা জিজ্ঞেস করলে, তখনই আমার মনে হয়েছিল আসলে তুমি বলতে চাইছ, খুন হয়েছে চার্লি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, হত্যাটা ড্রাগ নিয়ে কোনও ধরনের রেষারেষির ফলাফল।'

'ক্যামেরাটা দেখার আগে আমিও ওই লাইনেই চিন্তা করছিলাম,' বলল রানা। 'তারপর মনে পড়ল, হের হাইনরিখের মৃত্যুর কথা চার্লিকে বলেছিলাম আমি। ও বলেছিল, ওকে একটা ক্যামেরা উপহার দিতে চেয়েছিলেন হের হাইনরিখ। ....আরেকটা ব্যাপার, এক ব্লক দূরে চার্লির ফোক্সওয়াগেনটাকে পার্ক করা অবস্থায় দেখেছি আমি একটু আগে। ওটা দেখে আমার ধারণা হয়েছে, চার্লি শুধু এখানে আসেইনি, খুনও হয়েছে এখানে।'

চুপ করে থাকল লিমা। কোড ভাঙবার উত্তেজনা, বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জটা উপভোগ করছিল ও, কী জানা যাবে ভেবে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, কিন্তু ঘটনা যে এভাবে মানুষ খুনের মতো ভয়ানক অপরাধের দিকে মোড় নেবে, সেটা ছিল ওর কল্পনার বাইরে। নিজেকে খুনিদের টার্গেট ভাবতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল লিমার। হয়তো ওই অন্ধকার বাড়ি থেকে ওদের দিকেই লক্ষ রাখছে এখন খুনিরা!

গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করল রানা। 'একটু অপেক্ষা করো, লিমা। দেরি হবে না আমার।'

'আমিও আসব,' সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে আশ্চর্য দৃঢ় স্বরে বলল লিমা। 'ভুলে যাচ্ছ, আমি সাংবাদিক?'

তরুণীর কণ্ঠস্বর বলে দিল রানাকে, নিষেধ করলে শুনবে না লিমা। পিকআপ থেকে নামল ও। 'বেশ, এসো তা হলে। আমার পেছনে আসবে, যদি বিপদ দেখি, যা করতে বলব, দেরি না করে তা-ই করবে। ...ঠিক আছে?'

বাধ্য মেয়ের মতো মাথা দোলাল লিমা। 'আচ্ছা।'

ফটক টপকে ওটা খুলে দিল রানা ভিতর থেকে। ঢুকল লিমা, রানার পিছু নিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এগোল বাড়ির পিছনদিক লক্ষ্য করে। চাঁদের ম্লান আলোয় একটু পরেই পৌঁছে গেল ওরা প্রশস্ত বারান্দার ছাউনির নীচে, গাঢ় ছায়ায়।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কিচেনের দরজার তালাটা

নিঃশব্দে খুলে ফেলল রানা। অবাক হলো এ-ধরনের কাজে নিজের দক্ষতা দেখে। চোর-চোট্টা ছিলাম নাকি কখনও? ভাবল একবার।

টর্চটা নিচু করে ধরে জ্বালল রানা, আলোটা যাতে জানালার দিকে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখল। এবার ঘুরে দেখতে শুরু করল একটার পর একটা ঘর। ওর পাশে হাঁটছে লিমা। সেই পাহাড়ি কেবিনের মতোই পল হাইনরিখের বাড়িটাও পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো, মনেই হয় না জায়গা থেকে নড়ানো হয়েছে কিছু। তবে অনেকদিন ধরেই অব্যবহৃত পড়ে আছে, তা বোঝা যায়। গ্রীষ্মে সম্ভবত একবারও এখানে ফিরে আসেননি পল হাইনরিখ। আসবাবপত্রগুলোর উপর পড়ে আছে মিহি ধুলোর আস্তরণ।

তবে স্টাডিতে ডেস্ক-এর উপর থেকে কয়েকটা সাদা কাগজ সরানো হয়েছিল, আগের ধুলোর দাগ যেখানে ছিল, তার আধইঞ্চি ডানে আবার রেখে দেয়া হয়েছে ওগুলো, ফলে সরানোর আগে কাগজগুলো যেখানে ছিল, সেখানে ডেস্কের উপরে অল্প একটু জায়গায় ধুলো নেই। লেদার টপের উপর কে যেন হাত রেখেছিল অসাবধানে, ওখানে আঙুলের দাগ দেখল রানা।

দেয়ালের গায়ে সারি সারি বুক শেলফগুলোর উপর টর্চের আলো ফেলল রানা। ওর টর্চের রশ্মি থমকাল একসারিতে রাখা কয়েকটা ক্যামেরার উপর। মোট ছয়টা ক্যামেরা, সবগুলোই লাইকা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের মডেল। ডানদিকের প্রথম ক্যামেরাটার ডানপাশে খানিকটা জায়গা একদম ধুলোমুক্ত। ঠিক অতটুকু জায়গাই নিয়েছে অন্য ক্যামেরাগুলো।

'রিচি এখানে এসেছিল!' ফিসফিস করে বলল লিমা। বুক ধড়ফড় করা একটা অনুভূতি হলো ওর।

ধুলোহীন জায়গাটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল নিশ্চুপ রানা, কিন্তু দেখল না কিছুই—ওর মন চলে গেল অনেক দূরে

কোথাও। স্বপ্নে দেখা সেই কাঁচা-পাকা ভ্রূওয়ালা গম্ভীর বৃদ্ধকে হঠাৎ মনে পড়ল ওর। তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর প্রখর দৃষ্টি কী যেন বলতে চাইছে ওকে নীরবে।

দশ

বইয়ের দোকানে যেরকম উষ্ণ আচরণ করেছিলেন হের ডেযমন্ড হেইঞ্জ, তার ব্যতিক্রম করলেন না রানা ও লিমাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে। সুন্দর করে সাজানো লিভিংরুমে নিয়ে এলেন তিনি ওদের। পুরনো কাঠের আসবাবপত্রে প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালী কারুকার্য, চামড়া-মোড়া দুর্লভ সব বইয়ের মন উন্মাতাল করা গন্ধ, মেঝের চমৎকার ডিযাইনের পার্শিয়ান কার্পেট ও দেয়ালের শেলফগুলোয় রাখা চাইনিয পোরসিলিন ঘরটাকে শান্ত-সমাহিত একটা আবহ দিয়েছে। আরামদায়ক সোফা ও গদি-মোড়া চেয়ারগুলোর পুরু কুশন, পা রাখবার জন্য নরম পাপোশ—বাড়ির মালিকের অতি উন্নত রুচির প্রমাণ দিচ্ছে সবকিছু। ঘরটাতে ঢুকলেই মনে হয়, কাজের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আরাম করে বসে খানিক গল্প করা যাক।

হের হেইঞ্জের নির্ধারিত ভলিউমে বাজছে মোৎযার্টের জুপিটার সিম্ফনি, মৃদু আওয়াজটা মন ভাল করে দেয়, তবে জোর করে আকর্ষণ করে না আলাপরত কারও মনোযোগ। রানা ও লিমার সম্মানে বহু পুরনো ওয়াইনের একটা বোতল খুললেন হের হেইঞ্জ।

ভদ্রলোকের দাওয়াত পেয়ে এ-বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছে রানা, প্রতিবারই অনুভব করেছে, হের হেইঞ্জ অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মানুষ, একাকীত্বে অভ্যস্ত। নিজের অতীত স্মৃতির মাঝে ডুব দিয়ে থাকেন তিনি বেশিরভাগ সময়। তবে সেই স্মৃতিটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের, যখন পুরো জার্মান জাতি ক্ষমতার লোভে উন্মাদ হয়ে ওঠেনি, যখন তিনি ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক সম্ভাবনাময়, উচ্ছল, সুখী যুবক।

ঘুরে ঘুরে দুষ্প্রাপ্য পোরসিলিনের সংগ্রহ মুগ্ধ চোখে দেখল লিমা, থামল মার্বেল ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টেলে রাখা অস্পষ্ট ছবিগুলোর সামনে। একটা ফটো মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। ছবিতে হাস্যরত হের হেইঞ্জ ও তাঁর প্রেয়সীকে দেখা যাচ্ছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। উনিশশো উনচল্লিশ সালে তোলা হয়েছিল ছবিটা।

অনেকগুলো বছর এই ছবিটা চোখের আড়ালে সরিয়ে রেখেছিলেন হের হেইঞ্জ, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাদায়ক স্মৃতির শ্বাসরুদ্ধকর কষ্ট কমেছে তাঁর। অতীত মনে করতে চেয়েছেন তিনি, উপলব্ধি করেছেন, ওই ছবির সঙ্গে অন্য আরও অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তাঁর। ভাল লাগার মধুর স্মৃতি। আইডা—আইডার মিষ্টি, লাজুক হাসি, নরম আন্তরিক ব্যবহার, কোমল স্পর্শ—আরও অনেক অনেক কিছু।

'আপনার স্ত্রী, হের হেইঞ্জ?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'হ্যাঁ। আইডা। বিয়ের কিছুদিন আগে আমার বাড়ির বাগানে তোলা ছবি।'

'আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী।' কেয়ারি করা বাগানে দাঁড়ানো দু'জনের ছবিটা আরেকবার দেখল লিমা। 'কোথায় উনি?'

'মারা গেছে,' চাপা স্বরে বললেন হের হেইঞ্জ, 'অ্যালাইড ফোর্সের বম্বিঙের সময় এয়ার রেইড শেল্টারে পৌঁছাতে দেরি করে ফেলেছিল। উনিশশো তেতাল্লিশের কথা।'

'দুঃখিত,' অপ্রস্তুত হয়ে গেল লিমা।

'না, ঠিক আছে,' বললেন হের হেইঞ্জ। 'অনেক আগের কথা তো, কষ্টটা এখন আর অতটা লাগে না।'

পাহাড় থেকে শহরে ফিরবার পর একের পর এক এতকিছু ঘটেছে যে, লিমাকে বলে উঠতে পারেনি রানা হের হেইঞ্জ সম্বন্ধে। নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। নীরব ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে লিমার দিকে তাকাল ও।

'তো, রানা, কী নিয়ে আলাপ করবে?' বিচক্ষণ মানুষ বলে অস্বস্তিকর নীরবতাটুকু তাড়াতাড়ি ভাঙলেন হের হেইঞ্জ, হাতের ইশারায় বসতে বললেন ওদের।

পল হাইনরিখের ক্যামেরা কেস-এ পাওয়া আর্মি ডেকোরেশন, পাসপোর্ট, অ্যাড্রেস বুক, কেবিনের সামনে ওর আক্রান্ত হওয়া থেকে শুরু করে পরবর্তীতে যা ঘটেছে, সংক্ষেপে ভদ্রলোককে প্রায় সবই খুলে বলল রানা, জানাল ওদের সন্দেহের কথা। অনুরোধ করল, যেন তথ্যগুলো গোপন রাখেন তিনি।

'পল হাইনরিখের অতীত মোটেই বিস্মিত করেনি আমাকে,' বললেন হের হেইঞ্জ। 'চল্লিশ দশকের শেষের দিকে আর পঞ্চাশ দশকের শুরুতে বেশ কয়েকজন জার্মান সেনা-অফিসার এসে স্থায়ী হয়েছিল অ্যাসপেনে। তাদের বেশিরভাগই ছিল অ্যালপাইন কর্পসের সদস্য। এমন একটা সময় ছিল, যখন জার্মান টান ছাড়া ইংরেজি বলাটাকে অ্যাসপেনের স্কি স্কুলে অযোগ্যতা বলে ধরে নেয়া হতো। পল হাইনরিখ যখন এলো, সেটা উনিশশো পঞ্চান্ন সালের কথা—এদিকের স্কিইং তখনও শৈশবে। আজকের তুলনায় অ্যাসপেনের লোকসংখ্যাও ছিল অনেক কম। সবাই সবাইকে চিনতাম আমরা। স্পষ্ট মনে পড়ে, লিফটম্যান হিসেবে কাজ শুরু করেছিল পল হাইনরিখ। তবে ম্যানেজারিয়াল পোস্টে পদোন্নতি পেতে দেরি হয়নি তার। অনেকের কাছে শুনেছি, পল হাইনরিখের মতো দক্ষ মাউন্টেন ম্যানেজার আগে আসেনি কখনও।'

'ব্যক্তিগত ভাবে পল হাইনরিখকে চিনতেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'না। আমার দোকানে বছরে মাত্র একবার আসত সে বই কিনতে। গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর আগে বই কিনে নিয়ে যেত। কখনও-সখনও আবহাওয়া নিয়ে টুকটাক কথা হয়েছে তার সঙ্গে আমার। একবার বলেছিল, মাছ ধরতে ক্যানাডা যাচ্ছে। তবে আমার উপস্থিতিতে সবসময় অস্বস্তিতে ভুগত বোধহয়, যে-কারণে মন খুলে আলাপ করতে পারত না কখনও। একটু আগে যা শুনলাম, তারপর বুঝতে পারছি তার অস্বস্তির কারণ। সন্দেহ অবশ্য আগেই হওয়া উচিত ছিল আমার। পল হাইনরিখ যখন অ্যাসপেনে এলো, তার কয়েক বছর পরের ঘটনা...' শার্টের হাতা গুটালেন হের হেইঞ্জ, বাহুতে উল্কি দিয়ে আঁকা ঝাপসা পাঁচটা সংখ্যা দেখালেন। 'বুশেনওয়াল্ডে আমার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর,' বললেন লিমাকে। রানা উল্কিটা আগেই দেখেছে।

'একদিন দোকানের তাক পরিষ্কার করছি, এমন সময় এলো পল হাইনরিখ,' আগের কথার সূত্র ধরলেন হের হেইঞ্জ। 'যে-বইগুলো কিনেছে, সেগুলো প্যাকেট করে নিয়ে যখন হাতে দিলাম, আমার উল্কিটা দেখে চমকে পিছিয়ে গিয়েছিল সে। মনে হয়েছিল ফণা তোলা সাপ দেখেছে সামনে। ফ্যাকাসে মুখে তাড়াতাড়ি দাম মিটিয়ে চলে গিয়েছিল কোনও কথা না বলে। তখন ভেবেছিলাম, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ব্যাপারে সাধারণ জার্মানদের মধ্যে যে অপরাধবোধ আছে, তার মধ্যেও তা-ই কাজ করেছে। একবারও ভাবিনি অন্যকিছু থাকতে পারে তার অস্বাভাবিক আচরণের পেছনে। এসএস হেডকোয়ার্টারে তার অ্যাসাইনমেন্ট আর মিলিটারি র‍্যাঙ্ক জেনে এখন মনে হচ্ছে, ব্যক্তিগত ভাবে ডেথ-ক্যাম্পের সঙ্গে জড়িত ছিল হয়তো সে।'

'আপনার কি মনে হয়, পল হাইনরিখের অ্যাড্রেস বুকে লেখা সংখ্যাগুলো কোড হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'হওয়া অসম্ভব নয়,' সামান্য ইতস্তত করে বললেন হের হেইঞ্জ।

'আপনি তো কোড ব্রেকিং জানেন,' বলল রানা। 'চেষ্টা করে দেখবেন, সংখ্যাগুলোর কোনও অর্থ বের করা যায় কি না?'

ডেযমন্ড হেইঞ্জ হাইডলবার্গ ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র ছিলেন, জটিল সব কোড ভাঙা ছিল তাঁর অন্যতম শখ, সেটা জানে ও।

যুদ্ধ শুরু হয়ে না গেলে হাইডলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে ম্যাথমেটিকস-এর লেকচারার হিসেবে যোগ দিতেন হের হেইঞ্জ। কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের বিরোধিতা করায় একসময় বন্দি হলেন তিনি। দুঃসহ স্মৃতি রোমন্থন করতে চাননি, তাই মুক্তি পেয়ে হাইডলবার্গে আর ফিরে যাননি কখনও। জার্মানিতেই থাকেননি।

'একেবারে পারব না তা ভাবছি না,' সামান্য দ্বিধা করে রানার কথার জবাবে বললেন হের হেইঞ্জ। 'কিন্তু আমার জানা পুরনো সব পদ্ধতি কতটা কাজে আসবে সেটা একটা প্রশ্ন, তা ছাড়াও কোডে একই সংখ্যা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের তারতম্যের কারণে হয়তো লেগে যাবে মাসের পর মাস। তবে অ্যাসপেন ইন্সটিটিউটে আমার পরিচিত একজন আছে, আমার জুনিয়র বন্ধু, প্রিন্সটনের প্রফেসর—ও হয়তো আমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পারবে। আর্মি ইন্টেলিজেন্স থেকেও মাঝে মাঝে ডাক পড়ে ওর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত কোডের ওপর কয়েকটা বইও লিখেছে। কালকে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি আমি, তোমরা চাইলে অ্যাড্রেস বুকটা দিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখতে অনুরোধ করতে পারি। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো ওকে, বলে দিলে ওই অ্যাড্রেস বুকের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না ও।' উঠে দাঁড়ালেন হের হেইঞ্জ, চলে গেলেন ঘর ছেড়ে, ফিরে এলেন ট্রেতে সাজানো প্লেটে বিসকিট ও কেক নিয়ে।

ওগুলো দেখে মৃদু হাসল রানা, বলল, 'ডালিয়ার বেকারি শপে

গিয়েছিলেন আপনি।' মিসেস ডালিয়া কামোনস্কির বেকারি এক নামে চেনে অ্যাসপেনের স্থানীয়রা। গোটা শহরে ওরকম সুস্বাদু বিস্কুট বা কেক পাওয়া যায় না আর কোথাও।

'যাবই তো,' আন্তরিক হাসলেন হের হেইঞ্জও। কফি টেবিলের উপর সবার হাতের নাগালে ট্রে নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমার বাড়িতে অ্যাসপেনের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা অতিথি হয়ে আসছে... যাব না?' লিমার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় ট্রে থেকে কেক-বিস্কিট তুলে নিতে বললেন। 'আগে ডালিয়ার তৈরি কিছু না খেয়ে থাকলে খুব অবাক হবে, মিস সোরেনসন।'

একটুকরো কেক নিয়ে মুখে দিল লিমা, জিভের ছোঁয়ায় সুস্বাদু কেক গলে যেতেই বুঝল, মিথ্যে প্রশংসা করেননি হের হেইঞ্জ।

গভীর ঘুমের ভিতরে কান দুটো নড়ে উঠল হান্টারের, জেগে গেল হঠাৎ। বাংলোর পিছন থেকে শুকনো পাতার আস্তরণে পায়ের খসখস আওয়াজ, অপরিচিত কণ্ঠস্বরে কথাবার্তার অস্ফুট শব্দে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল ও। একটু উঁচু করল মাথা, নামল না ওর বিছানা থেকে। তারপর অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আবারও। এবার সামনের দরজার কাছ থেকে। চট্ করে বিছানা থেকে নেমে মাথাটা নিচু করে ঝাঁপিয়ে পড়বার ভঙ্গিতে চার পায়ে দাঁড়িয়ে গেল হান্টার। গলার আওয়াজ যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। গোপনে কে আসে প্রভুর বাড়িতে? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ভাল নয়!

সহজেই তালা খুলে ফেলল ব্রিম হার্টসেল, ঢুকল বাংলোর নিকষ কালো লিভিংরুমে। তার পিছনে ঢুকল জেসন ট্রেটম্যান, হার্টসেলকে পার হয়ে সামনে বাড়ল। দেহের পাশে ঝুলন্ত তার অস্বাভাবিক লম্বা হাতের একটা আরও লম্বা হয়ে আছে সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের কারণে।

নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে হলওয়ে ধরে সামনে বাড়ল হান্টার।

অপরিচিত অনাহূত লোক দু'জনকে দেখেই ওর গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এলো ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড়ে একটা গর্জন। বেছে নিল বেঁটে লোকটাকে। ছুটতে শুরু করল ও, তারপর কয়েক হাত দূর থেকে শত্রুর কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে লাফ দিল।

অন্ধকারে আরও গাঢ় অন্ধকার আকৃতিটাকে তীরের মতো ছুটে আসতে দেখে গলা বাঁচাতে অজান্তেই বুকের কাছে অস্ত্র ধরা হাতটা তুলল জেসন ট্রেটম্যান, তার বাইসেপে বসে গেল হান্টারের বাঁকানো শ্বদন্ত। শক্তিশালী ঘাড়টা জোরে ঝাঁকি দিল হান্টার, ছিঁড়ে আনতে চাইল এক থোকা মাংস। ব্যথায় চাপা স্বরে কাতরে উঠল ট্রেটম্যান, বসে পড়েই কিল মারল হান্টারের ঘাড়ে। তার বাইসেপ ছেড়ে কব্জি কামড়ে ধরল হান্টার। ঝটকা-ঝটকিতে ট্রেটম্যানের হাত থেকে মেঝেতে পড়ে খটাং-খটাং আওয়াজ করে আরেকদিকে সরে গেল রিভলভারটা। পাগলের মতো একহাতে হাতড়ে অন্ধকার ঘরে ওটা খুঁজল গরিলা, একইসঙ্গে কুকুরটাকে ঠেকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল আরেক হাতে। কামড় খেল উরুর মাংসে।

খানিকটা সরে গিয়ে টর্চ ও পিস্তল বের করে ফেলল হার্টসেল। তার দিকে হিংস্র জন্তুটার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। টর্চের আলোয় দ্রুত লক্ষ্যস্থির করল সে, তারপর স্পর্শ করল ট্রিগার। এত কাছ থেকে মিস হবার কথা নয়। হান্টারের মাথার তালুতে ঢুকল .৩৮ বুলেট।

জোরালো ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়ল হান্টার, পড়ে থাকল নিথর। নিষ্প্রভ খোলা চোখ দুটোতে এখন আর কোনও আক্রোশ নেই। মুখের একপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকল টুকটুকে লাল, লম্বা জিভ।

দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জেসন ট্রেটম্যান। কাঁপা স্বরে বলল, 'কী ছিল ওই শয়তানের বাচ্চাটা?'

হান্টারের উপর টর্চের আলো ফেলল ব্রিম হার্টসেল, ওর হাত

ও উরুর জখমগুলো দেখে নিয়ে বলল, 'রটওয়াইলার। ...কী অবস্থা তোমার?'

'কুত্তার বাচ্চাটা হাত-পা ফেড়ে ফেলেছে আমার,' চাপা স্বরে বলল ট্রটম্যান, মুখ বিকৃত করে রেখেছে। 'ব্যথা! তবে অচল হয়ে পড়িনি।'

'একবার রটওয়াইলারের ভয়ঙ্কর হামলা চাক্ষুষ করবার সুযোগ হয়েছিল,' দ্রুত টর্চের আলো বুলিয়ে ট্রটম্যানের জখম পরীক্ষা করতে করতে বলল হার্টসেল। 'কপালটা ভাল তোমার, ট্রটি।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে গেল ট্রটম্যান, ফায়ারপ্লেসের ভিতর থেকে লোহার পোকারটা তুলে নিয়ে আবার ফিরল সে হান্টারের কাছে। পোকারটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে রটওয়াইলারের খুলির উপর নামিয়ে আনল প্রচণ্ড জোরে। তারপর অন্ধ আক্রোশে একের পর এক বাড়ি মেরে ভাঙল ওটার দু'পায়ের হাড় ও পাঁজরগুলো। প্রতিটা বাড়ির সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো অশ্রাব্য সব গালাগালি।

'বাদ দাও, ট্রটি, মরে ভূত হয়ে গেছে ওটা,' কিছুক্ষণ পর বলল হার্টসেল। 'হাতে অনেক কাজ আছে আমাদের।'

'কুত্তার বাচ্চাকে কাঁচা খেতে পারলে রাগ যেত,' অন্তরের কথাই বলল ট্রটম্যান, তবে পোকার ফেলে দিল হাত থেকে।

চিন্তিত চেহারায় পায়ের কাছে পড়ে থাকা হান্টারের প্রকাণ্ড শরীরটা দেখল হার্টসেল। 'এরকম কোনও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সেটা আমরা ভাবিনি।' ওয়াল ক্যাবিনেট থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করে দ্রুতহাতে ট্রটম্যানের জখমগুলোয় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল সে মেঝের উপর টর্চ নামিয়ে রেখে, তারপর আলো ঘুরিয়ে লিভিংরুমের চারপাশটা দেখল। ফায়ারপ্লেসের কোনায় গান-ক্যাবিনেটের উপর স্থির হলো হলদে আলোটা। ওটাতে আছে রানার শখ করে কেনা দুর্লভ কয়েকটা বন্দুক ও রাইফেল। 'এখন আর মাসুদ রানার চোখ এড়িয়ে কাজ সেরে চলে যাবার উপায়

নেই,' আবার বলল হার্টসেল। 'লোকটা জানবেই, কেউ ঢুকেছিল ওর বাংলোয়। গোটা ব্যাপারটাকে এখন ডাকাতি হিসেবে দেখাতে হবে আমাদের।' ক্যাবিনেট খুলে একটা টুয়েলভ বোর ডাবল ব্যারেল পার্ডি, একটা সিঙ্গেল ব্যারেল পাম্প-অ্যাকশন বেরেটা বন্দুক ও প্রাচীন আমলের একটা রেমিংটন বাফেলো গান বের করে বাড়িয়ে দিল সে ট্রটম্যানের দিকে। 'এগুলো ধরো। ঝটপট চুরি করে নিয়ে সরে পড়া যায়, এমন দামি যা পাওয়া যাবে, সঙ্গে নেব আমরা।'

আধঘণ্টা পেরোবার আগেই খুদে ট্র্যান্সমিটারগুলো বসানো হয়ে গেল তার। দুই বেডরুমে দুটো, কিচেন ও লিভিংরুমের ফোনে একটা করে। পরীক্ষা করে দেখল, চমৎকার কাজ করছে ছারপোকাগুলো।

বয়ে নিয়ে যাবার মতো দামি জিনিসপত্র একটা ঝোলায় ভরে লিভিংরুমে বসে হাত-পায়ের ব্যান্ডেজগুলো আরও ভাল ভাবে বাঁধল জেসন ট্রটম্যান, তারপর ব্রিম হার্টসেলের ফিরবার অপেক্ষায় থাকল। তার টর্চের আলো পড়ল দেয়ালের গায়ে একটা ছবির উপর। ভালভাবে ছবিটা দেখতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাছে চলে গেল সে, তারপর ডাক দিল সঙ্গীকে, 'ব্রিম, দেখে যাও!'

টেলিফোনটা ক্রেডলে রেখে ট্রটম্যানের পাশে চলে এলো হার্টসেল, ছবিটার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে শিস বাজাল ঠোঁট গোল করে। 'একেই তো কেবিনের কাছে ফেলে এসেছিলাম আমরা!'

'হ্যাঁ, একেই,' চোখ সরু করে ছবিটা আরও কিছুক্ষণ দেখল জেসন ট্রটম্যান, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এ-ই তা হলে মাসুদ রানা। ...তখন আমি অসতর্ক ছিলাম, মাসুদ রানা! এরপর থাকব না। একই ভুল দুইবার করি না আমি।'

এগারো

রানার প্রথমে মনে হলো, মারা গেছে হান্টার। তারপর ওর চোখে পড়ল, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাসে উঠছে-নামছে হান্টারের বুক। জরুরি কিছু নির্দেশ দিল ও লিমাকে, তারপর খুব সাবধানে রটওয়াইলারের শিথিল দেহটা কোলে তুলে নিয়ে এলো পিকআপের কাছে, কোলে নিয়ে সাবধানে উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে।

ততক্ষণে বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছে লিমা। রানাকে বলল, 'ডাক্তার জেঙ্কিন্স বললেন, চেম্বারে থাকবেন।'

মাথা দোলাল গম্ভীর রানা। অন্তরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ওর। মনে হচ্ছে, বিনা কারণে আবারও হামলার শিকার হয়েছে ও। ভেবে পাচ্ছে না, হঠাৎ করে ওর নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবনে এসব কী ঘটছে।

পিকআপ ছেড়ে দিল লিমা, বাঁক ঘুরে রওনা হলো শহরের পথে। চোখে ঝাপসা দেখছে লিমা, কাঁদছে ও প্রভুভক্ত হান্টারের মরণাপন্ন অবস্থা দেখে।

রুমাল দিয়ে হান্টারের মাথার ক্ষতটা চেপে ধরে থাকল রানা, বিড়বিড় করে বলে চলল, 'তুই সেরে যাবি, হান্টার। দেখিস, সেরে যাবি।' পাহাড়ি কেবিনের সেই লোক দু'জনের কথা মনে পড়ল। ওরাই কি এসেছিল বাংলোয়? ওরাই কি খুন

করেছে চার্লিকে? কেন? কী উদ্দেশ্যে? পল হাইনরিখের কেবিনে-বাড়িতে কী খুঁজছে ওরা? আমার বাংলোয় এসেছিল কেন? সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাবধানে হান্টারকে ধরে রাখল রানা, যাতে ঝাঁকি যতটা সম্ভব কম লাগে।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স অ্যাসপেনের সেরা পশু-চিকিৎসক। হান্টারের ভ্যাকসিনেশন তিনিই করেছেন। হান্টারের সামান্য জ্বর হলেও ওকে তাঁর কাছে নিয়ে যায় রানা।

চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর জেঙ্কিন্স, লিমা আলগোছে ব্রেক কষে তাঁর সামনে পিকআপ থামাতেই ঘুরে চলে এলেন তিনি রানার পাশে। রানা নামতেই ওর হাত থেকে অচেতন হান্টারকে নিয়ে নিলেন, একবার তাকিয়েই মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। চেম্বারের দিকে দ্রুত পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে হলো?'

'জানি না,' ডাক্তারের পিছু নিল রানা। 'লিভিংরুমে পেয়েছি ওকে এই অবস্থায়। রক্তের ভেতর পড়ে ছিল।'

'ডক্টর, সেরে যাবে তো ও?' কান্নাভেজা স্বরে জিজ্ঞেস করল লিমা।

অপারেটিং টেবিলে হান্টারকে শুইয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন ডক্টর জেঙ্কিন্স। দু'মিনিট পর বললেন, 'আপনারা ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি কতটা কী করা যায়। অনেক সময় লাগবে অপারেশন করতে।'

লিমার প্রশ্নটাই আবার করল উদ্বিগ্ন রানা, 'ও বাঁচবে, ডক্টর?'

'জানি না,' দুঃখিত চেহারায় হান্টারের আহত শরীরটা দেখলেন ডাক্তার। 'আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, কিন্তু খুব খারাপ ভাবে আহত হয়েছে ও।'

রাত দুটোর সময় ওয়েইটিং রুমে এলেন ডক্টর জেঙ্কিন্স.

ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে, কফি টেবিলের উপর তুলে দিলেন লম্বা, সরু সরু পা দুটো। ভদ্রলোকের হাসিখুশি চেহারাটা রুক্ষ দেখাল, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলগুলো এখন উস্কখুস্ক। 'বাঁচবে,' রানা ও লিমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির জবাবে বললেন। মাথা নাড়লেন আফসোস করে। 'ঈশ্বর জানেন কেন স্যাডিস্ট-এর মতো এভাবে পেটাল কেউ ওকে।'

'পিটিয়ে ওর এই অবস্থা করেছে?' জিজ্ঞেস করল লিমা। কাঁদতে কাঁদতে লাল হয়ে গেছে ওর চোখ দুটো।

'হ্যাঁ, বিকৃত আনন্দে পেটানো হয়েছে বেচারাকে,' বললেন ডাক্তার। 'এক্স-রেতে দেখলাম মাথায় বাড়ি মেরে খুলি ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা বুলেটও বের করেছি ওর করোটির হাড় থেকে। ওই দুটো আঘাতের যে-কোনও একটাই ওকে অজ্ঞান করতে যথেষ্ট ছিল। বেচারা জ্ঞান হারানোর পর মাথায় গুলি করা হয়েছে, অথবা বাড়ি দেয়া হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে যাবার পরে মুগুর বা লাঠির বাড়ি মেরে মেরে ভেঙেছে পা আর পাঁজরের হাড়।' তিক্ত চেহারায় মাথা নাড়লেন ডক্টর জেঙ্কিন্স।

'পুরোপুরি সেরে উঠবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। মাথার ভিতরে ফাঁকা একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। ক্রোধ দূর হয়ে জেগে উঠছে শীতল প্রতিশোধস্পৃহা। ওর মনে হলো, হান্টারকে যে ওভাবে মেরেছে, তাকে খুন করতে সামান্যতম বাধবে না ওর। সত্যিই খুন করে ফেলতে পারবে, চিন্তাটা একটু নাড়িয়ে দিল ওকে।

'মনে হয় সেরে উঠবে,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারলেন না ডক্টর জেঙ্কিন্স। 'মাথার আঘাতটা খুব মারাত্মক নয়। বুলেটও ঢুকেছে কাত হয়ে, তাই আটকে গেছিল খুলিতে। ওটার কারণে ব্যথা পাবে ও কিছুদিন, তবে আর কোনও গুরুতর ক্ষতি হয়নি। হাতির দাঁতের মতো শক্ত হয় রটওয়াইলারের হাড়, অন্য জাতের কুকুর হলে মারা যেত সঙ্গে সঙ্গে। আরও ভারী

ক্যালিবারের বুলেট হলে অবশ্য বাঁচত না ও।'

'দেখা যাবে ওকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিকভারি পেন-এ রেখেছি, এখনও জ্ঞান ফেরেনি,' আপত্তির সুরে বললেন ডক্টর জেঙ্কিন্স। 'অন্তত ঘণ্টা তিনেক লাগবে জ্ঞান ফিরতে। স্টেবল হবার আগে না জাগলেই ভাল। মনিবের ঘ্রাণ পেলে হয়তো আগে আগেই জ্ঞান ফিরে পেতে পারে।'

রানা নাছোড়বান্দার মতো বলল, 'ওর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষা করতে পারি আমি?'

মৃদু হাসলেন ডক্টর জেঙ্কিন্স। হান্টার যখন খুব ছোট, তখন থেকে ওর চিকিৎসা করছেন তিনি। জানেন, কতটা ভালবাসে রানা হান্টারকে। বললেন, 'বসুন, কোনও অসুবিধে নেই। যাবার আগে দরজার তালাটা টিপে দিয়ে গেলেই চলবে। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে আবার আসব।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডক্টর,' আন্তরিকতার সঙ্গে বলল রানা। 'ঋণী হয়ে থাকলাম আমি।'

'হান্টার আমার পছন্দের রোগী,' বললেন ডক্টর জেঙ্কিন্স। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে তাকালেন তিনি। 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ওর দাঁতে মাংসের টুকরো আর চামড়া পেয়েছি। ওকে যে মেরেছে, তার কাছ থেকে খানিকটা স্মৃতিচিহ্ন আদায় করেছে হান্টার।'

গম্ভীর চেহারায় কথাগুলো শুনল রানা, তারপর বলল, 'যদি ওই লোকের দেখা পাই, তা হলে সুদে-আসলে ওর পাওনা শোধ করে দেব।'

'মারামারি আমি পছন্দ করি না, মিস্টার রানা,' বেরিয়ে যাবার আগে বললেন ডক্টর জেঙ্কিন্স। 'কিন্তু ওই লোকটাকে যদি সত্যিই পান, তা হলে দয়া করে আমার তরফ থেকে গোটা কয়েক দাঁত ফেলে দেবেন তার, আমি খুশি হবো।'

ডক্তার চলে যাবার পর পাশাপাশি বসল রানা ও লিমা। হান্টার বাঁচবে কি না সেটা স্থির হয়ে যাবার পর রানার মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন টের পেল লিমা। থমথম করছে রানার চেহারা, কী যেন ভাবছে গম্ভীর হয়ে। চোখ দুটোর দৃষ্টি বরফের মতো হিমশীতল।

কিছুক্ষণ পর লিমা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, পল হাইনরিখের কেবিনে তোমার ওপর আক্রমণ বা চার্লির খুনের সঙ্গে তোমার বাংলোয় ডাকাতি আর হান্টারকে খুন করতে চাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে?'

'আছে,' নির্দ্বিধায় বলল রানা। 'কাকতালীয় ভাবে একই সঙ্গে এতকিছু ঘটতে পারে না।'

'পুলিশকে জানাবে না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'আমার বাংলো থেকে ফায়ার-আর্মস চুরি আর হান্টারের ওপর আক্রমণের কথা জানাব পুলিশকে। চার্লির মৃত্যু আর আমার ওপর হামলার ব্যাপারে আমি নিজেই চেষ্টা করে দেখব কিছু করতে পারি কি না। অ্যাসপেন পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই আসলে, ওরা এতই অযোগ্য যে করতে পারবে না কিছুই। করতে চেষ্টাও করবে না। বলবে, অফ্ সিযনে চাকরি না থাকায় পল হাইনরিখের কেবিনে, বাড়িতে আর আমার বাংলোয় চুরি করেছে স্থানীয় কোনও বেকার যুবক।'

'ওই লোক দুটো যা খুঁজছে, তা যদি আমাদের কাছে থেকে থাকে, তা হলে এর পর কী হবে কে জানে!' বলল লিমা।

রানা মনে মনে চাইল, আসুক আবার লোক দুটো। ওই দু'জন লোক বিনা উস্কানিতে হামলা করেছে ওর উপর, খুন করেছে চার্লিকে, বারবার ওর নিশ্চিন্ত জীবনে নিয়ে এসেছে অনিশ্চয়তা আর দুঃখ। তাদের ঠেকাতে কিছুই করতে পারেনি ও। কিন্তু করতে পারেনি বলেই পারবে না কখনও, এমন তো

নয়! কী করবে জানে না রানা, তবে এটা জানে, কিছু একটা করতে হবে ওকে। আগে জানতে হবে ওই লোক দুটোর পরিচয়, উদ্দেশ্য—তারপর ভেবে দেখবে, কীভাবে প্রতিশোধ নেবে।

তিনঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর একটানা পায়চারি থামিয়ে লিমার দিকে তাকাল রানা। 'আমি কেনেল-এ যাচ্ছি। আসবে তুমি?'

'চলো,' উঠল লিমাও।

দু'জন ওরা চলে এলো কেনেল-এ। আওয়াজ করল না কেউ, রিকভারি পেন-এর মেঝেতে পা গুটিয়ে বসে থাকল চুপচাপ। ঘরের কোনায় বেডবোর্ড-এ কাত হয়ে পড়ে আছে হান্টার, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে নিয়মিত, অ্যানেসথেটিক-এর প্রভাব কমে আসছে বলে ঘুমের ভিতরে মাঝে মাঝে কাঁপছে ও থরথর করে।

হান্টারের খুলির অর্ধেকটা কামিয়ে দিয়েছেন ডক্টর জেঙ্কিন্স, সেখানে মাখিয়ে রেখেছেন সাদা অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম। পিস্তলের গুলি যেখানে ঢুকেছিল, সেখানে ছোট একটা ব্যান্ডেজ। পাঁজরগুলো শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে গজ ব্যান্ডেজে। সামনের ডানদিকের পা প্লাস্টার অভ প্যারিস দিয়ে মোড়ানো।

ভোরের আলো ফুটবার পর জ্ঞান ফিরল হান্টারের। রানার কোলে মাথা রেখে ঝিমাচ্ছিল লিমা, জেগে গেল প্রভুভক্ত রটওয়াইলারের করুণ আর্তনাদে। উঠে দাঁড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করল হান্টার। না পেরে ঘষটে ঘষটে কাছে আসতে চাইল, তারপর শুয়ে পড়ল তীব্র ব্যথায়। গোঙানোর ফাঁকে চোখে অভিযোগ নিয়ে অসহায়, কাতর দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'নো, হান্টার, স্টে,' প্রিয় কুকুরের পাশে চলে গেল রানা, আস্তে করে কোলে তুলে নিল হান্টারের মাথা। নিচু স্বরে কথা বলল ঘাড়ে আলতো করে হাত বোলানোর ফাঁকে। জবাবে

বিলাপ করে উঠল রটওয়াইলার। ওর দ্বিধান্বিত চোখ দুটোতে অবুঝ ভয় দেখল রানা। বেচারা বুঝতে পারছে না, নড়তে গেলে ভয়ানক ব্যথা লাগছে কেন।

তারপর রানার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজল হান্টার, দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠল ওর সারা শরীর। মনিবের গায়ের পরিচিত প্রিয় গন্ধটা স্বস্তি এনে দিল ওকে।

হান্টারের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল রানা একঘণ্টারও বেশি সময়, ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিল ঘাড়ে। তারপর আবারও ঘুমিয়ে পড়ল হান্টার। নিশ্চুপ লিমাকে ইশারা করে রটওয়াইলারের ঘুম না ভাঙিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল রানা। দু'জন ওরা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কেনেল থেকে।

নিউ ইয়র্কে ফিরবার কোনও তাড়া আপাতত নেই লিমার। এস্কয়ার পত্রিকায় একটা ফিচার লিখবার কথা ঠিক হয়ে আছে ওর, সেটা এক মাসের মধ্যে জমা দিলেই চলবে। ফিচারটা লিখতে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না, কাজেই লিমা সিদ্ধান্ত নিল, হান্টার বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আরও ক'টা দিন অ্যাসপেনেই থাকবে ও। থাকবার আরেকটা কারণ, কপাল যদি ভাল হয়, তা হলে হের হেইঞ্জের বন্ধু হয়তো এরইমধ্যে কোড ভেঙে ফেলবেন। সেক্ষেত্রে, ডাক আসতে পারে হের হেইঞ্জের কাছ থেকে।

রানার ব্যক্তিগত তদন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, ওর প্রশ্নের জবাবে অ্যাসপেনের সবক'জন ডাক্তার ও ফার্মাসিস্ট জানালেন, কুকুরের কামড় খাওয়া কারও চিকিৎসা করেননি তাঁরা। পরিচিতদের জিজ্ঞেস করেও একই ফল হলো, অ্যাসপেনে গত কয়েকদিনে আহত কোনও লোক দেখেনি তারা কেউ। এ থেকে রানার ধারণা হলো, হান্টার বোধহয় কামড় বসাতে পারেনি ঠিকমত, নয়তো লোকটা নিজেই চিকিৎসা

করেছে নিজের। পরের সম্ভাবনাটাকেই সত্যি বলে মনে হলো রানার।

নিজেদের 'সুনাম' অক্ষুণ্ণ রেখে কোনরকম তৎপরতা দেখাল না অ্যাসপেন পুলিশ।

তবে অ্যাসপেন এয়ারপোর্টের এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট রানার বর্ণনা শুনে চিনতে পারল পাহাড়ি কেবিনের কাছে নামা সেই কপ্টারটাকে। ওটার রিফিউয়েলিং করেছিল সে।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল রানা, কিন্তু পরে লগ দেখে জানা গেল, নগদ টাকায় বিল পরিশোধ করা হয়েছে বলে তেলের পরিমাণ ও টাকার অঙ্ক ছাড়া আর কোনও তথ্য লেখা নেই লগে। এফএএ জানাল, রানা যদি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর জানাতে পারে, তা হলে কপ্টারের মালিক কে, সেটা তারা খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন নম্বর জানা নেই রানার। একবারও খেয়াল করেনি ও নম্বরগুলো। খেয়াল করবার প্রয়োজনও বোধ করেনি তখন। করবার কথাও নয়।

দ্বিতীয় দিন অনেকটা সুস্থ বোধ করল হান্টার, দুপুরে লিমার হাত থেকে বড় বড় দুটো চিযবার্গার খেল ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে। ডক্টর জেঙ্কিন্স জানালেন, আগামীকাল হান্টারকে বাংলোয় নিয়ে যেতে পারবে রানা। তবে আগামী ছ' থেকে আট সপ্তাহের আগে খোলা যাবে না ওর সামনের পায়ের প্লাস্টার ও পাঁজরের ব্যান্ডেজ। বেশি হাঁটাহাঁটি করতে দেয়া একদম ঠিক হবে না, কাজেই ভ্যালিয়াম দিলেন তিনি হান্টারকে। উত্তেজিত হয়ে উঠলেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে ওকে।

কেনেল থেকে ফিরে দুপুরের খাবারটা বাংলোতেই সারল রানা ও লিমা। বিকেলের দিকে টিভি খুলে পাশাপাশি বসল ওরা।

ফোন যখন বেজে উঠল, ধরল লিমা। আধমিনিট ওদিকের কথা শুনে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল ওর, 'জী, আসব,'

বলে রেখে দিল ফোন। রানার চোখে প্রশ্ন দেখে বলল, 'হের হেইঞ্জের ফোন। উনি বললেন, রাত ন'টায় আমরা যেন ওঁর বাড়িতে যাই। ওখানে হের হেইঞ্জের বন্ধু প্রফেসর কার্ক ক্লস্টারবার্গও থাকবেন। অ্যাড্রেস বুকে ওটা সত্যিই কোড!'

কালো হর্ন রিমের ভারী চশমাটা করমচা রঙের প্রকাণ্ড নাকে তুলে ধীরেসুস্থে খয়েরী অ্যাটাশে কেস থেকে কয়েকটা হোয়াইট প্রিন্ট কাগজ বের করলেন প্রফেসর কার্ক ক্লস্টারবার্গ, কাগজগুলো সাবধানে নামিয়ে রাখলেন কফি-টেবিলের উপর। চশমার উপর দিয়ে তৃতীয়বারের মতো মনোযোগের সঙ্গে দেখে নিলেন রানা ও লিমাকে। ভদ্রলোকের ভাব দেখে মনে হলো, বহুদিন পর সুযোগ পেয়েছেন, এ-সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না তিনি—সুদীর্ঘ লেকচারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কপাল থেকে আরেকবার সরিয়ে দিলেন অবাধ্য চুলগুলোকে। দু'সেকেন্ড পেরোবার আগেই যথাস্থানে ফিরে এলো তামাটে চুলের গোছা।

চেহারায় প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ নিপাট ভদ্রলোক। হাবভাবে বিনয়ের ছাপ। চোখ দুটোয় মাঝেমধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠছে প্রখর বুদ্ধিমত্তা। দৃষ্টিতে নম্র, দয়ালু একটা ভাবও আছে। রানার ধারণা হলো, দয়াটুকু বোধহয় ওর মতো অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের প্রতি। তাঁর টুইডের কোঁচকানো স্পোর্টস কোট-এর ল্যাপেলগুলো সরু, ফ্যাশনটা সত্তরের দশকে খুব জনপ্রিয় ছিল। রং-ওঠা ধূসর ব্যাগি প্যান্টটা ব্যবহার করা হয়েছে অন্তত এক যুগ। প্রফেসর ক্লস্টারবার্গকে দেখে মনে হয়, ভদ্রলোক কাপড়-চোপড়ের বেহাল অবস্থা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ওয়াকিফহাল নন, হয়তো খেয়ালই করেননি কোনদিন যে দশ বছর আগেই বাতিল হয়ে গেছে ওগুলো।

'তা হলে শুরু করা যাক,' সবাই বসবার পরে গাম্ভীর্যের

সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক। 'প্রথমেই ব্যাখ্যা করছি, কোড কীভাবে ভাঙা হয়েছে। তাতে বুঝতে সুবিধে হবে আপনাদের। পল হাইনরিখের কোডটা ক্রিপটোগ্রাফি ক্যাটাগরিতে পড়ে। তার মানে হলো, তথ্যটা গোপন করা হয়নি, কিন্তু অক্ষরগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, প্রথমদৃষ্টিতে কী লেখা আছে সেটা বোঝা হয়ে পড়েছে অসম্ভব। ক্রিপটোলজি আবার দু'রকম, ট্র্যান্সপোযিশন আর সাবস্টিটিউশন। ট্র্যান্সপোযিশনের বেলায়,' লিমার দিকে আঙুল তাক করলেন প্রফেসর, 'ধরা যাক আপনার নাম পলা, তা হলে নামটা হয়ে যাবে Aluap, অথবা ওই পাঁচ অক্ষর দিয়ে তৈরি অন্যকিছু। সেক্ষেত্রে অক্ষরগুলোকে পরপর ঠিকমত বসালেই ভাঙা যাবে কোড। কিন্তু সাবস্টিটিউশন মেথডে অক্ষরগুলোকে বদলে নেয়া হবে সংখ্যা, সিম্বল বা অন্য অক্ষর দিয়ে। পলা নামটা হয়ে যেতে পারে ৬-১৩-৯-৩-৮, বা NZAQE।

ট্র্যান্সপোযিশনের সময় অক্ষরগুলো তাদের পরিচয় হারায় না, কিন্তু স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে। আবার সাবস্টিটিউশনের বেলায় অক্ষরগুলো থাকে একই স্থানে, কিন্তু হারিয়ে বসে পরিচয়। শুনলে প্রথমে মনে হয়, তা হলে তো কোড ভাঙা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধাঁধাটাকে দুর্বোধ্য করে তুলতে প্রতিটা অক্ষরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অসংখ্য ভ্যারিয়্যান্ট। হোমোফোনস, নালস, মন্যালফাবেটিক কোড, পলি-অ্যালফাবেটিক কোড—জটিলতা বৃদ্ধি পাবে বলে এসব নিয়ে আপাতত আর কথা বলব না আমরা। যে-কারণে আমরা সবাই আজ এখানে সমবেত হয়েছি, সরাসরি সেটা নিয়েই বরং কথা বলা যাক।

'শুরু থেকেই বলি। সেদিন সকালে হের হেইঞ্জ যখন আমাকে অ্যাড্রেস বুকটা দিলেন, দেরি না করে অ্যাড্রেস বুকের প্রথম চার পৃষ্ঠায় যে সংখ্যাগুলো আছে, সেগুলো পড়ে

ফেললাম। বুঝলাম, এই সামান্য ক'টা সংখ্যা কোড ভাঙার জন্যে যথেষ্ট নয়। সাধারণত কয়েকশো পৃষ্ঠার কোড নিয়ে কাজ করি আমি।

'কোডটা যদি আধুনিক নিয়মে তৈরি করা হতো; বা এক্ষেত্রে যা হয়েছে, সেভাবে আগের কোনও রেফারেন্স না থাকত, বক্তব্যও যদি এত কম হতো, তা হলে কোড ভাঙতে পারার সম্ভাবনা ছিল এক কোটিতে এক ভাগ। কিন্তু কপাল ভাল,. পল হাইনরিখের কোড ছিল অত্যন্ত সহজ। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আর্মি যে-ধরনের কোড ব্যবহার করত, তার চেয়েও অনেক সোজা। ...অবশ্য, প্রথমে তা জানা যায়নি। অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি আর গ্রামারের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার মেমোরি ব্যাঙ্কে রেখে প্রতি সেকেন্ডে দু'লাখ অ্যাডিশন করতে সক্ষম, এরকম একটা কম্পিউটারে ইনফর্মেশনগুলো ফিড করাই আমি। বলে রাখা ভাল, কোড ভাঙতে ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিসের এখন পর্যন্ত জুড়ি নেই কোনও। অক্ষরগুলো কতবার ব্যবহার করা হয়েছে, কতটা বিরতি নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, এসব মেমোরিতে রাখে কম্পিউটার। এই জরুরি কাজটা হয়ে গেলে তখন মেসেজটাকে সামনে থেকে বা পিছন থেকে বারকয়েক ম্যাথমেটিকাল অ্যানালিসিসের মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে বোঝা যায়, তথ্যটা আসলে কী।'

দম নিতে থামলেন প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ। এবং এই প্রথম বুঝতে পারলেন, একটু আগের আগ্রহী শ্রোতাদের সত্যিকারের মনোযোগ নিশ্চিত ভাবেই হারাতে বসেছেন তিনি। অক্ষমতা মেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'দুঃখিত, প্রায়ই মনে রাখতে পারি না যে, ক্লাস-রুমে নেই আমি। আসলে এতদিনের অভ্যেস, থামতে পারি না চেষ্টা করেও। তবে আপনাদের কথা দিচ্ছি, যা বললাম, তার ওপর পরীক্ষা দিতে হবে না।'

রিনিঝিনি আওয়াজ হলো লিমা হেসে ফেলায়। হের হেইঞ্জ

গম্ভীর চেহারায় বললেন, 'তুমি বলে যাও, প্রফেসর, পরীক্ষা দিতে হবে না সেটা যখন জেনে গেছি, তো আর ভয় কীসের আমাদের!'

'তা হলে কোডটা আসলে কী নয়, সেটা কীভাবে বের করলাম, তা বরং বাদই দিই,' শ্রোতাদের আশ্বস্ত করতে বললেন ক্লুস্টারবার্গ। শুকনো মুখগুলো দেখে টের পেলেন, ব্যর্থ হয়েছে তাঁর প্রচেষ্টা। 'আসল কথায় আসি।' কফি-টেবিল থেকে কাগজগুলো নিয়ে বেছে বের করলেন তিনি একটা, ওটা রাখলেন অন্যগুলোর উপরে। 'কোডে যা আছে, সেগুলোর অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনও কাজে আসেনি ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস। আসলে পল হাইনরিখ যে-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, সেটা আমি ব্যবহার করি খেয়ালের বশে। ব্যাপারটা স্রেফ আমাদের সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। কোড সৃষ্টি অনেক আগের শিল্পকলা, সেটা বলে রাখি এখানে। দু'হাজার বছরেরও আগে গ্রিক লেখক পলিবিয়াস প্রথমে সরল কোড ব্যবহার করেন।

'একটা চতুর্ভুজকে উপর নীচে পাঁচ ভাগে ভাগ করে, পাশাপাশি পাঁচ ভাগে ভাগ করলে পঁচিশটা ঘর পাওয়া গেল। তারপর ওগুলোতে বসানো হলো অক্ষরগুলো। চতুর্ভুজের পাশাপাশি সারি আর উপর-নীচ কলামগুলোকে নম্বর দেয়া হলো এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত। আই আর জে অক্ষর দুটোকে একটা স্কয়ার-এ রাখা হলো, যেন অ্যালফাবেটের সবগুলো অক্ষর ঠিকঠাক মতো বসে। প্রতিটা অক্ষর দুটো নম্বর দিয়ে বোঝানো হলো—একটা নেয়া হবে সারি থেকে, অন্যটা কলাম থেকে। আসল কথা হচ্ছে, অক্ষরগুলোকে নম্বরে পরিণত করা। কৌশলটা পলিবিয়াস পদ্ধতি বা চেকারবোর্ড নামে পরিচিত।'

কফি-টেবিলের মাঝখানে একটা পেপার রাখলেন প্রফেসর ক্লুস্টারবার্গ, রানা ও লিমাকে ওটা দেখালেন তর্জনী তাক করে। 'এবার আসা যাক মূল বিষয়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ফ্রিকোয়েন্সি

অ্যানালিসিস কেন কাজ করল না। করল না, তার কারণ, এই কোড-এ কোনও মেসেজ নেই, কোড করে রাখা হয়েছে শুধু কয়েকটা নাম।

সামনে ঝুঁকে নামগুলো পড়ল রানা ও লিমা।

হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল (মৃত)
↓
ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল
২১৩ মেরিল্যান্ড অ্যাভিন্যু
ফিনিক্স, অ্যারিযোনা

জর্জ গ্রুসাক (মৃত)
↓
ফ্রেডারিক গ্রুসাক
১৪০০ ব্রিনটন্স ব্রিজ রোড
শ্যাড্‌স্ ফোর্ড, পেনসিলভেনিয়া

লিউট হ্যামিলটন গেট্‌স্‌বি (মৃত)
↓
স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেট্‌স্‌বি
৫৮৫০ ওয়েসাইড অ্যাভিন্যু
সিনসিনাটি, ওহাইয়ো

ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক
সেন্টার আইল্যান্ড, অয়েস্টার বে,
লং আইল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক

তৃতীয় নামটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল লিমার। সিনসিনাটিতে বড

হয়েছে ও, গ্র্যাজুয়েশন করেছে ভাসার থেকে, সিনসিনাটি পোস্ট-এ চাকরি করেছে প্রায় এক বছর। অবাক মায়াবী চোখ দুটো রানার চোখে রাখল লিমা। 'স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেট্স্বি ওহাইয়ো স্টেট সুপ্রিম-কোর্টের জাস্টিস। চার বছর আগে আমার দাদীর জন্মদিনের পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

'আমি বোধহয় আরেকটা নামের ব্যাপারে সাহায্যে আসতে পারব,' বললেন প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ। 'ফ্রেডারিক গ্রুসাক পেনসিলভেনিয়া স্টেট-এর সিনেটর। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি তাঁর যেরকম, তাতে ভবিষ্যতে তাঁর পার্টি তাঁকে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'আচ্ছা!' অস্ফুট শোনাল লিমার কণ্ঠ। গত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া নানান বিচ্ছিন্ন, রহস্যময় অঘটনগুলোকে বিদ্যুৎ-গতিতে পরপর সাজাল ও, বুঝতে চাইল অঘটন ঘটবার কারণ। বুদ্ধিমতী মেয়ে, কোনও সূত্র না থাকায় ক্ষান্ত দিল শীঘ্রি।

সাজানো কাগজের উপর থেকে আরেকটা কাগজ টেনে নিলেন প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ। 'আগের পদ্ধতি ব্যবহার করে ডিকোড শেষে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়নি শেষ-পৃষ্ঠার নীচের দিকে দু'সেট নম্বরে। ২৫-২২-৩৩-৩৫-১৩-৩২ আর ০৩৮-১৯৩৮৬২। আমার মতে, দুটো সম্ভাবনা আছে সংখ্যাগুলোর তাৎপর্য বের করতে না পারার। এক, এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা কোনও কোড। যদি তা-ই হয়, তা হলে এগুলোকে ডিকোড করার মতো যথেষ্ট ডেইটা নেই, সুতরাং ডিকোড করা অসম্ভব। দুই, সংখ্যাগুলো হয়তো একসারি নম্বর, কোডের অংশ নয় আসলে। তবে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে সম্ভাবনা দুটোর মধ্যে কোনটাকে আমি গুরুত্বের সঙ্গে নেবঃ আমি বলব, এগুলো একসারি নম্বর, কোডের অংশ নয়। কোড করা নামগুলো থেকে এক লাইন ফাঁক রেখে লেখা হয়েছিল এই সংখ্যাগুলো। আর এ থেকে আন্দাজ করছি, নামের লিস্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এগুলোর।'

আরেকটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়লেন প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ। 'নামের লিস্টির মতো একই পদ্ধতিতে ডিকোড করা গেছে প্রথম সেট নম্বর। জচেন বা ইয়োচেন লেখা হয়েছে সংখ্যাগুলো দিয়ে। আপনাদের বোধহয় মনে আছে, পলিবিয়াস স্কয়ারে আই আর জে অক্ষরগুলোকে একই নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়?'

'জচেন,' বললেন হের হেইঞ্জ। 'ব্যাপটিযমের সময় দেয়া জার্মান পুরুষদের নামগুলোর একটা।'

'হতে পারে,' আপত্তি করলেন না প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ, 'কিন্তু পরক্ষণেই বললেন, 'তবে দ্বিতীয় সারি সংখ্যা কোনও নামের শেষ অংশ দিচ্ছে না আমাদের। ডিকোডিং প্রসিডিউর অনুযায়ী ফল আসছে উল্টোপাল্টা। পলিবিয়াস স্কয়ারে কখনোই পাঁচের বেশি বা একের কম কোনও সংখ্যা ব্যবহার করা হয় না। কাজেই ০৩৮-১৯৩৮৬২ থেকে ব্যবহার করা যাবে, এরকম সংখ্যা শুধু ৩-১৩২, বা ওগুলোর অন্য কোনও ক্রম। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, ৩১-৩২ ডিকোড করলে দাঁড়ায় **XN**। আমার ধারণা, এই এক্সএন কোনওভাবেই কোডের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। ওগুলো এমন কোনও সংখ্যা, যেগুলোর ব্যক্তিগত তাৎপর্য ছিল শুধু পল হাইনরিখের কাছে।'

কাগজটা লিমার বাড়ানো হাতে দিলেন প্রফেসর, তারপর তুলে দিলেন নামের লিস্ট ও অ্যাড্রেস বুক। এবার বললেন, 'আরেকটা তথ্য দেয়া বাকি আছে শুধু। কালকে আমি যখন কলোরাডো ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে রিসার্চ-এর কাজ করছিলাম, তখন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। কোড লিখতে যে-কাগজ-কালি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোকে রেডিও কার্বন টেস্ট আর সেই সঙ্গে অন্য কয়েকটা কেমিকেল টেস্ট করি আমি। অ্যাড্রেস বুকের কাগজ পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর আগের। তবে কয়েক দফায় লেখা হয়েছে সংখ্যাগুলো। প্রথমবার অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে লেখা হয় কালো কালিতে। দ্বিতীয়বার লেখা হয়

পনেরো থেকে বিশ বছর আগে। আর শেষবার তারও পরে, অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো বছর আগে, যখন প্রথম নামগুলোর পাশে "মৃত" লেখা হয়।' রানা ও লিমার উপর আরেকবার ঘুরে এলো প্রফেসরের দৃষ্টি। 'আর কিছু বলার নেই আমার। ...এখন আমি যা জানি, আপনারাও তা-ই জানেন।'

'ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না আপনাকে, প্রফেসর,' বলল রানা। হের হেইঞ্জের দিকে তাকাল। 'আপনার বেলাতেও ওই একই কথা বলব, হের হেইঞ্জ।'

'সত্যি,' সায় দিল লিমা, 'আপনাদের সাহায্য না পেলে কখনোই হয়তো আমরা জানতাম না কী লেখা আছে ওই অ্যাড্রেস বুকে। ...ঋণী হয়ে রইলাম আমরা।'

'আমাকে দরকার পড়লে হের হেইঞ্জকে জানালেই জেনে যাব আমি,' লিমার কথার জবাবে বিনয়ের সঙ্গে বললেন প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ। হের হেইঞ্জের কাছ থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে যোগ করলেন, 'বুঝতে পারছি, এবার আপনারা বের করতে চাইবেন ওই নামগুলো কেন লেখা হয়েছে। যদি জানতে পারেন, তা হলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না, তাতেই আমার দেনা-পাওনার হিসেব চুকেবুকে যাবে।'

'আর আমার কাছে তোমাদের কোনও ঋণ নেই,' বললেন হের হেইঞ্জ। 'তোমাদের কাজে আসতে পেরেছি বলে ভাল লাগছে। সত্যি বলতে কী, বেশ কৌতূহলও বোধ করছি। আমিও কার্ক-এর মতো জানতে চাই, নামগুলো পল হাইনরিখ তার অ্যাড্রেস বুকে লিখেছিল কেন।'

'আমিও জানতে চাই,' মনে মনে বলল রানা।

'আমরা কিছু জানলে আপনারাও জানবেন,' প্রফেসর ও হের হেইঞ্জকে কথা দিল লিমা।

'শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে আপনাদের,' তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঝিলিক দিল প্রফেসরের চোখের তারায়। 'প্রাক্তন এক নাৎসি

লেফটেন্যান্ট কর্নেলের অ্যাড্রেস বুকে পাওয়া কয়েকটা নাম ছাড়া আপাতত আর কোনও তথ্য নেই আপনাদের কাছে। নামগুলো লেখার পেছনে কোনও রহস্য নেই, এমনও কিন্তু হতে পারে।'

লিমা মুখ খুলবার আগেই প্রশ্ন করল রানা, 'তা হলে ওগুলোকে এনকোড করতে গেলেন কেন পল হাইনরিখ?'

'জানি না,' প্রফেসরের দৃষ্টি দেখে মনে হলো রানার মাথায় খানিকটা ঘিলু থাকতেও পারে, সেটা প্রথমবারের মতো ভাবতে শুরু করেছেন তিনি।

'তা ছাড়া, গত সপ্তাহে যা ঘটেছে, সেগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই কারও কোনও স্বার্থ আছে,' বলল লিমা।

'স্বার্থ আছে; কিন্তু কার, বা কাদের, তা জানেন না আপনারা,' বললেন প্রফেসর, আগের চেয়ে সতর্ক, 'এ নিয়ে চিন্তার খোরাক অবশ্য রয়েছে তো বটেই।'

'খোঁজ নিয়ে যা-ই জানতে পারি, আপনাদের জানাব আমরা,' মৃদু হেসে আবারও বলল লিমা।

'সেই শুভ কামনায়,' ওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন প্রফেসর ক্লস্টারবার্গ, চুমুক দিলেন ওয়াইনে।

হের হেইঞ্জ জোর করে ধরে রাখলেন সবাইকে, রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না। খাওয়া শেষে কিছুক্ষণ গল্প করবার পর বিদায় নিল রানা ও লিমা।

বাংলোয় ফিরবার পথে কয়েক মিনিট কোনও কথা হলো না ওদের দু'জনের মাঝে, তারপর নীরবতা ভাঙল লিমা: 'লিস্টে যে নামগুলো আছে, এখানে যা ঘটেছে তার জন্যে ওই লোকগুলোই যদি দায়ী হয়, তা হলে বলতে হবে, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কয়েকজন মানুষের সঙ্গে টক্কর লেগে গেছে আমাদের।' একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল লিমা। 'কিন্তু, বুঝতে পারছি না, নামের এই লিস্ট তাদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন। এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা পাবার জন্যে খুনখারাবিও করা যায়?'

'এখানে যা ঘটছে, তার সঙ্গে লিস্টের লোকগুলোর কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে,' বলল রানা। 'যদি ওটা পাবার জন্যে সেই দু'জনকে তারা পাঠিয়ে না থাকে? পাঠিয়েছে কি না তা কিন্তু আমরা জানি না। তা ছাড়া, লিস্টটাই সেই দু'জন খুঁজছিল, তা না-ও তো হতে পারে।'

'আমার অন্তর বলছে, লিস্টের ওই লোকগুলোর সঙ্গে এখানে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোর সরাসরি যোগাযোগ আছে,' জোর দিয়ে বলল লিমা। 'ওই লোকগুলোই পাঠিয়েছিল সেই খুনি দু'জনকে। ...আগামীকাল নিউ ইয়র্কে ফিরে যাব আমি, সামান্য কিছু কাজ আছে; ঠিক করেছি, সেগুলো সেরে পুরোটা সময় দেব এই রহস্য উদ্ঘাটনের পেছনে।'

রানার মন সঙ্গে সঙ্গে বলল, এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবে লিমা? থাক না ও আরও কিছুদিন! কিন্তু মুখ ফুটে এ-ব্যাপারে কিছু বলল না ও। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে ওর, লিমা যদি ব্যস্ততার কারণে না-ও পারে, হান্টার একটু সুস্থ হয়ে উঠবার পর ওই লোক তিনজনের ব্যাপারে ভালমত খোঁজ নেবে ও।

কিছুক্ষণ পর লিমার দিকে তাকাল রানা। অনিশ্চিত শোনাল ওর কণ্ঠ: 'এদিকে কী করতে পারি দেখব আমি। ...তুমি কি নিউ ইয়র্কে গিয়ে যোগাযোগ রাখবে এখানে আমার সঙ্গে?'

'অবশ্যই রাখব, রানা!' প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল লিমা। ড্যাশবোর্ডের সবুজ, আবছা আলোয় একবার ওর মনে হলো, নিষ্পাপ কোনও উদ্গ্রীব শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, তবে নিশ্চিত হতে পারল না। 'কিছু জানলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করব তোমাকে।'

কল্পনায় ডানা মেলে দিয়েছে লিমা, সেটা টের পেল রানা সে-রাতে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে।

পরদিন সকালে প্রথমেই দুপুরের ফ্লাইটে ডেনভারের প্লেনে সিট বুক করল লিমা। ওখান থেকে কানেকটিং ফ্লাইটে নিউ ইয়র্কে

ফিরবে ও। লিমার বুকিং দেয়া হয়ে যেতেই তিনটে ফোন করল রানা। প্রথম দু'বার ব্যর্থ হতে হলো ওকে, কৌশলে কাজ হলো না। হতাশ হলো লিমা। সিনেটর গ্রুসাক ও জাজ গেট্স্‌বিকে পাওয়া গেল না ফোনে।

তৃতীয়বার ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের বাড়ির নম্বরে ডায়াল করল রানা, ওদিক থেকে স্প্যানিশ টানে এক মহিলাকে 'হ্যালো' বলতে শুনে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ক্যাসলের সঙ্গে কথা বলতে পারি, প্লিয?'

'উনি বাড়িতে নেই,' নিরাসক্ত স্বরে জানাল মহিলা। 'ওঁকে অফিসের নম্বরে পাবেন।'

'কোন্ অফিসে ফোন করব, বলুন তো?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'জরুরি দরকার।'

'অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্সের অফিসে পাবেন, আর কোথায়,' মনে হলো রানার প্রশ্নে বেশ বিরক্ত হয়েছে হাউস-কিপার।

'তা-ই তো, তা-ই তো,' ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল রানা।

অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্সের সুইচবোর্ড রানাকে পৌঁছে দিল ব্যারি ক্যাসলের অফিসে। সেক্রেটারি জানাল, মিস্টার ক্যাসল মিটিঙে আছেন, এখন তাঁকে কিছুতেই বিরক্ত করা যাবে না।

'কিন্তু অত্যন্ত জরুরি দরকারে ফোন করেছি,' তাগাদার সুরে বলল রানা। 'হাতে একদম সময় নেই আমার।'

'বিষয়টা কী, সেটা যদি বলেন, তা হলে উনি ফ্রি হলেই জানাব আমি। উনিই হয়তো ফোন করবেন আপনাকে।'

'বিষয়টা তাঁর হেলিকপ্টার নিয়ে,' বলল রানা। 'তবে তিনি ফোন করবেন, বিষয়টার গুরুত্বের কারণে সে-অপেক্ষায় থাকতে পারছি না।'

'এয়ারপোর্টে আমাদের হ্যাঙ্গারে আছেন মিস্টার জন্সটন, উনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন,' বলল মহিলা

সেক্রেটারি। 'এয়ারক্র্যাফটের দায়িত্বে উনিই আছেন।'

সেক্রেটারির কাছ থেকে মিস্টার জন্সটনের ফোন নম্বর লিখে নিল রানা, তারপর ফোন রেখে দেবার আগে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। দেখি উনি কোনও সাহায্য করতে পারেন কি না।' দেরি না করে ফোন করল রানা হ্যাঙ্গারের নম্বরে।

'রিচি জন্সটন বলছি,' ওদিকের কণ্ঠস্বর প্রায় তলিয়ে গেল যান্ত্রিক গর্জনের বিকট আওয়াজে।

'অ্যাসপেন, কলোরাডো থেকে বলছি,' গলার স্বর কয়েক পর্দা উঁচু করল রানা, 'মুন-রেকার এভিয়েশনের টনি হিউবার্ট, মিস্টার জন্সটন।'

'এক মিনিট!' গর্জনের উপর দিয়ে চেঁচাল জন্সটন।

ইঞ্জিনের বিশ্রী আওয়াজটা বাড়তে শুনল রানা। তীক্ষ্ণ হলো আরও শব্দটা, তারপর মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

'দুঃখিত,' লাইনে আবার শোনা গেল চার্লি জন্সটনের কণ্ঠ। 'এইমাত্র একটা প্লেন টেকঅফ করল। কী বলেছেন কিছুই শুনতে পাইনি।'

দ্বিতীয়বারের মতো বলল রানা, 'ফোন করেছিলাম মিস্টার ক্যাসলের হেলিকপ্টারের ব্যাপারে।'

'কোন্‌টা?'

এ-ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ভাবেনি রানা, দ্রুত সামলে নিতে চেষ্টা করল, 'ওই যে, কালো-রুপালি কপ্টারটা।'

'ও, বেল জেট রেঞ্জারটা? ওটার আবার কী সমস্যা?'

'শুনলাম ওটা বিক্রি হবে?'

'ওরকম কিছু তো শুনিনি!' বিস্মিত হয়ে বলল চার্লি জন্সটন। 'বিক্রি হবে? আশ্চর্য! ওটা কেনাই তো হলো ছ'মাস হয়নি!'

'বিক্রি হবে না? ...ঠিক জানেন তো? আমি তো শুনলাম বিক্রি হবে!'

অনিশ্চয়তায় ভুগল এবার জন্সটন। 'দুঃখিত, এ-ব্যাপারে কিছু

জানি না আমি। ব্রিম হার্টসেল হয়তো জানে। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।'

'ব্রিম... কে?' শেষের কথাগুলো শুনতে পায়নি রানা।

'হার্টসেল,' আবারও বলল জন্সটন। 'মিস্টার ক্যাসলের চিফ পাইলট ও। তাঁর লিয়ার জেট আর কপ্টার দুটো ও-ই চালায়।'

'তাঁর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে, বলতে পারেন?'

'না। গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে ওর দেখা প্রায় হয়নি বললেই চলে। হার্টসেলের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন, সেটা হয়তো মিস্টার ক্যাসলের সেক্রেটারি জানাতে পারবে।'

'হার্টসেলকে বোধহয় দেখেছি আমি,' বলল রানা। পাহাড়ি কেবিনের সামনে দেখা দু'জনের একজন হবে লোকটা, কাজেই ঝুঁকি নিল ও, 'লম্বা মানুষ হার্টসেল? চুলগুলো কালো?'

'হ্যাঁ। ও-ই।'

কঠোর হয়ে গেল রানার চেহারা। 'তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তার সঙ্গীর সঙ্গেও। বেশ ভারী গড়নের মানুষ সে। একটু বেঁটেমত। সে-ই আমাকে বলেছে, কপ্টারটা বিক্রি হবে। ভদ্রলোকের নামটা এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না... কী যেন নাম তাঁর, মিস্টার জন্সটন?'

'জেসন ট্রটম্যান,' জন্সটনের বলবার সুরে মনে হলো ট্রটম্যানকে মোটেই পছন্দ করে না সে, 'সবসময় হার্টসেলের সঙ্গেই থাকে ও।'

'হ্যাঁ, ট্রটম্যান,' সায় দেবার সুরে বলল গম্ভীর রানা। 'ধন্যবাদ, মিস্টার জন্সটন, রাখি তা হলে।'

'অফিসে ফোন করে দেখুন, ওরা হার্টসেলের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখবার পর কৌতূহলী চোখে তাকাল লিমা। ফোনালাপ থেকে বুঝতে পেরেছে, কী জেনেছে রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কেবিনের সামনে যে দু'জনকে দেখেছিলে, তাদের তুমি

পেয়ে গেছ বোধহয়, রানা?'

রানার গম্ভীর চেহারায় তিক্ততার ছাপ পড়ল। 'হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ নেই।'

'কী করবে ভাবছ?'

'কিছুই না... আপাতত। ওরা দাবার সৈন্য, যা বলা হয়েছে, তা-ই করেছে। আমি জানতে চাই সেনাপতি কারা। ধারণা করছি, তাদের একজন হচ্ছে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। অন্যদের ব্যাপারেও জানতে হবে, বুঝতে হবে আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ কতটা ক্ষমতাশালী, তারপর ঠিক করা যাবে কী করা যায়। তুমিও খোঁজ-খবর নাও, জানতে চেষ্টা করো এদের সম্বন্ধে। এখন থেকে সমস্ত তথ্য শেয়ার করব আমরা। ঠিক আছে?'

কপ্টারের ব্যাপারে কেউ একজন সেক্রেটারির কাছে ফোন করেছিল জানবার পর থেকেই মেজাজটা খারাপ হয়ে ছিল ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের, এয়ারপোর্ট থেকে চার্লি জন্সটনের ফোন পেয়ে মেজাজ আরও চড়ে গেল তাঁর। ব্রিম হার্টসেল রিপোর্ট দেবার আগেই মনটাকে তৈরি করে নিলেন তিনি খারাপ খবর শুনবার জন্য।

'পল হাইনরিখ একটা খাতা রাখত সঙ্গে, ওটাতে এনকোড করা ছিল আপনাদের নামের তালিকা।' রানার বাংলোয় বসানো ছারপোকাগুলোর রেকর্ড করা ট্র্যান্সমিশন একটু আগে বাজিয়ে শুনে এসেছে হার্টসেল। 'ডেযমন্ড হেইঞ্জের এক প্রফেসর বন্ধু, নাম কার্ক ক্লস্টারবার্গ, ওগুলোকে ডিকোড করে। তালিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু জানে না অবশ্য তারা। ...আর মেয়েটা চলে গেছে নিউ ইয়র্কে, ওখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করতে চায়।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারি ক্যাসল, ভাল করেই জানেন, ফিনিক্সে মাসুদ রানার ফোন করবার ব্যাপারটা অজানা নেই ব্রিম হার্টসেলের।

'একটু ঝামেলাই হয়ে গেল,' সামান্য দ্বিধা করে বলল হার্টসেল। 'মাসুদ রানা আমাদের নাম জানে, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে, সেটাও এখন আর ওর অজানা নেই। পল হাইনরিখের কেবিনের কাছে আমাদের দেখেছিল লোকটা, ওকেই পিটিয়ে অজ্ঞান করেছিলাম আমরা। ফোন করে ও...'

'জানি আমি,' নিজের মুখরক্ষা করতে তথ্য গোপন করছে না হার্টসেল, ফলে সন্তুষ্ট হলেন ব্যারি ক্যাসল। 'জন্সটনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। অ্যাসপেনের মুন-রেকার এভিয়েশন-এ ফোন করেছিলাম, ওদের ওখানে টনি হিউবার্ট নামে কোনও লোক চাকরি করে না।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, সার, জানতাম না পাহাড়ে এই মাসুদ রানাই দেখে ফেলেছিল আমাদের। আপনি যদি বলেন, তা হলে এক্ষুনি ওর একটা ব্যবস্থা করে ফেলি আমি।'

'না!' কর্কশ হয়ে গেল ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের কণ্ঠস্বর। 'নামটা চেনা চেনা লাগায় আমাদের সিআইএ কন্ট্যাক্টকে ওর ব্যাপারে ওদের কম্পিউটারে সার্চ করে দেখতে বলেছিলাম, যদি কিছু পাওয়া যায়। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে জাত গোক্ষুর বেরিয়ে এসেছে। আমাদের কন্ট্যাক্ট ওর ব্যাপারে যে-রিপোর্ট পাঠিয়েছে, সেটা অফিসে গিয়ে কম্পিউটার খুললেই পেয়ে যাবে তুমি। বাধ্য না হলে ওই লোককে ঘাঁটাব না আমরা। ও একাই একশো, তার ওপর ওর দলবল-শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। যেচে ঝামেলায় জড়াতে যাব না আমরা কিছুতেই। ...আরেকটা ব্যাপার, আমাদের তরফ থেকে একের পর এক ভুলের পরেও এখন পর্যন্ত কাকতালীয় ঘটনা আর সন্দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে সমস্ত ব্যাপারটা। সে-রকমই থাকুক, সেটাই চাই আমি। মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসন ছাড়া আরও কয়েকজন জড়িয়ে গেছে ঘটনাচক্রে, ওই দু'জনের কিছু হলে নানান প্রশ্ন তুলবে তারা। দেখা যাক অসুস্থ মাসুদ রানা আর অনভিজ্ঞ লিমা সোরেনসনের

দৌড় কতটা, তারপর প্রয়োজন হলে কী করা উচিত, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব আমি। মাসুদ রানার ওপর সার্ভেইলান্স রাখবে শুধু তুমি, যা-ই ঘটুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে। নিজে থেকে ভুলেও কিছু করতে যাবে না।'

বস্ ওর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না বুঝে অপমানিত বোধ করল ব্রিম হার্টসেল, শান্ত স্বরে বলল, 'জেসনকে নিউ ইয়র্কে পাঠাতে চাই। মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টেও ট্র্যান্সমিটার বসানো দরকার।'

'ভাল। কিন্তু ভুলেও যেন কোনও ঝামেলায় নিজেকে না জড়ায় ও। কিছু করার আগে যেন অবশ্যই যোগাযোগ করে তোমার সঙ্গে। আর ওকে কোনও নির্দেশ দেবার আগে আমার সঙ্গে আলাপ করে কী করতে হবে সেটা জেনে নিতে ভুল কোরো না তুমি।'

'জী, সার,' রূঢ় আচরণে বিব্রত বোধ করে শুকনো স্বরে বলল ব্রিম হার্টসেল।

হাতের ইশারায় তাকে বিদায় করে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন ব্যারি ক্যাসল, সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন, 'আজকে আর কেউ যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে সেটা দেখো।' গ্লাসে দু' পেগ শিভাস রিগাল ঢেলে এক ঢোকে গিলে নিলেন তিনি, স্বস্তি এলো না মনে। খেয়াল করলেন, হাত দুটো কাঁপছে মৃদু মৃদু। ভ্রূ কুঁচকে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ব্যারি ক্যাসল।

আজ থেকে অর্ধ-শতাব্দীরও আগে ব্যাপারটা যখন ঘটে, খুব সহজ ভাবেই ঘটেছিল। নিখুঁত একটা অপরাধ ছিল ওটা। তর্কে না গিয়ে কেউ যদি মেনে নেয়, আইন বাঁকা পথে চলতেই পারে, তা হলে বলবার কিছু ছিল না কারও। কিন্তু অন্যায়টা গোপন থাকেনি, একটা সময় প্রতিঘাত এসেছে। সেটা সহ্য করা খুব কঠিন ছিল, তা নয় গত প্রজন্ম প্রায় নির্বিঘ্নেই তাঁদের সাম্রাজ্য ভোগ-দখল

করে গেছেন, এসেছে তাঁদের নিজেদের পালা। এখন যদি অর্ধ-শতাব্দী আগে পূর্বপুরুষদের সেই সামান্য অপরাধের মাশুল গুনতে হয় সব হারিয়ে, তা হলে কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারবেন না তাঁরা কেউ। না তিনি, না ফ্রেডারিক গ্রুসাক, না স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেট্স্বি।

গভীর অস্বস্তির কারণটা খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন ব্যারি ক্যাসল।

আসলে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসেনি বলেই তাঁর এই অস্থিরতা। সমস্যা যেদিকেই মোড় নিক, কী করবেন সে-সিদ্ধান্ত যদি একবার নিয়ে ফেলতে পারেন, তা হলে আর কোনও দ্বিধায় ভুগবেন না তিনি, দূর হয়ে যাবে সমস্ত অস্বস্তি। সে-রকম বুঝলে হার্টসেলকে চূড়ান্ত নির্দেশই দিতে হবে... কিন্তু আসেনি তেমন পরিস্থিতি। দুঃস্বপ্নের মাঝে আছেন বলে মনে হচ্ছে তাঁর। দুঃস্বপ্নে খারাপ কিছু ঘটলে নিয়ন্ত্রণে থাকে না কিছুই, সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না; ঠিক তেমনই লাগছে তাঁর, মনে মনে আশা করছেন, ঠিক হয়ে যাবে সব, কিন্তু সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নিতে পারছেন না নিজে থেকে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, সমস্যাটাকে একেবারে মূল থেকে উৎপাটন করতে হবে এবার। তাড়াহুড়ো করা যাবে না, অসতর্ক হওয়া চলবে না। তাঁর বিপক্ষ বলতে স্মৃতি হারানো এক অসুস্থ লোক, আর অনভিজ্ঞা এক মহিলা সাংবাদিক। তবে পথ থেকে এদের সরিয়ে দিতে গিয়ে ভুল পদক্ষেপ নেয়ার অর্থ হবে আরও শক্তিশালী শত্রু তৈরি করা। অপেক্ষা যতই চাপ সৃষ্টি করুক মনের উপর, ধৈর্য ধরাই আপাতত সবচেয়ে ভাল। নিজের স্বাভাবিক খাতে বইতে থাক ঘটনা-স্রোত, বাধ্য না হলে সামনে কোনও বাঁধ দেবেন না তিনি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল।

বারো

অ্যাসপেনের শান্ত, নীরব, দূষণমুক্ত প্রকৃতির মাঝে কয়েকটা দিন কাটিয়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে সজীব, তরতাজা লাগল লিমা সোরেনসনের। রানার সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করেছে ও, পল হাইনরিখের কোড ওকে দিয়েছে বহুদিন আগের কোনও রহস্যের মোড়ক উন্মোচনের অনুসন্ধিৎসা। স্টেট কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টের দুর্নীতির সেই রিপোর্টের পর এরকম জটিল কোনও সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়ে ওঠেনি ওর।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আধবেলা কাটিয়েই মহা-ব্যস্ত শহরটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ও। নিউ ইয়র্কের চাঞ্চল্য আসলে রক্তে উন্মাদনা জাগায়, মানুষকে করে তোলে উদ্যমী, সতর্ক। এরকম অনুভূতি সিনসিনাটিতে থাকতে কখনও হতো না লিমার।

আন্সারিং মেশিনে রেকর্ডকৃত মেসেজগুলো ওকে নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল, অ্যাসপেনে যাবার আগে কী কী করা হয়ে ওঠেনি। মেসেজগুলোর মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী দাঁতের ডাক্তারের অফিসে না যাওয়াটা সবচেয়ে গুরুতর। একটা মেসেজ আছে গিলবার্ট ম্যাসনের। ফিরেই ওকে ফোন করতে বলেছে ম্যাসন অনুযোগের সুরে। গিলবার্ট ম্যাসনের কথা ভেবে মৃদু হাসল লিমা। শোধবোধ হয়ে গেল ওর সঙ্গে। গত মাসে লাঞ্চের ডেট দিয়েও আসেনি ম্যাসন।

টাইমের সিনিয়র এডিটর গিলবার্ট ম্যাসন, সত্যিকারের বিশ্বস্ত

একজন ভাল বন্ধু। টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল বিক্রি করতে গিয়ে ম্যাসনের সঙ্গে পরিচয় হয় লিমার। কয়েকদিনের পরিচয়ে দু'জনই ওরা বুঝেছে, ভাল বন্ধু হতে পারবে ওরা। আগামীকাল সকালে ম্যাসনকে ফোন করবে, ঠিক করল লিমা। একসঙ্গে লাঞ্চ করবে, সেই সঙ্গে জানাবে পল হাইনরিখের রহস্যময় কোডের কথা। সন্দেহ নেই, আগ্রহী হয়ে উঠবে ম্যাসন।

আন্সারিং মেশিনে আরও আছে ওর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মার্থা মেরিনার মেসেজ। বলেছে, লিমা যদি আজকেই ফিরে আসে, তা হলে একসঙ্গে যেতে পারে ওরা ব্যালে দেখতে, দুটো টিকেট কিনে রেখেছে সে।

এস্কয়ার পত্রিকাকে কথা দিয়ে রেখেছে লিমা, ফিচার লিখে দেবে, কিন্তু কার্ক ক্লস্টারবার্গ পল হাইনরিখের কোড ভাঙবার পর থেকে ফিচারটা লিখতে মোটেই আগ্রহ বোধ করছে না লিমা। সিদ্ধান্ত নিল, পরে দেখা যাবে ফিচার নিয়ে কী করা যায়; আগে ফোন করা যাক মার্থাকে।

কুশল বিনিময়ের পর দুই বান্ধবী ঠিক করল, সন্ধ্যার পর একসঙ্গে ডিনার সেরে ব্যালে দেখতে যাবে ওরা।

এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট-এ চোখ বুলিয়েই বুঝে গেল জেসন ট্রটম্যান, লিভিংরুম আর বেডরুমের টেলিফোনে ট্র্যান্সমিটার বসানোই যথেষ্ট। কাজ সেরে বেডরুমে ড্রেসারের উপর প্লাস্টিক ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলোর দিকে মনোযোগ দিল ট্রটম্যান। একটা ছবি মনে ধরল তার। সমুদ্র-সৈকতে বিকিনি পরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে লিমা সোরেনসন ও মার্থা মেরিনা। ছবিটা সরিয়ে রেখে ড্রেসারের উপরের ড্রয়ারটা খুলল সে। হাত থেকে গ্লাভস্ খুলে ড্রয়ার থেকে রেছে বের করল পছন্দের একটা প্যান্টি। 'তুমি হবে আমার, সোনামণি,' প্যান্টিতে নাক ঘষতে ঘষতে বলল ঘড়ঘড় করে। 'আগে অথবা পরে, তোমাকে আমার হতেই হবে!'

ছবি ও প্যান্টি নিয়ে বাথরুমে চলে এলো ট্রটম্যান, টয়লেটের উপরের একটা তাকে ওগুলো রেখে ছবিতে লিমার সুডৌল শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ, শ্বাস হয়ে উঠল দ্রুত। এবার প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল সে হ্যাঁচকা টানে।

চওড়া, বিকৃত হাসিতে প্রসারিত হলো জেসন ট্রটম্যানের কুৎসিত ঠোঁট জোড়া।

লিমা কোনার একটা টেবিল দখল করে বসবার পনেরো মিনিট পর রেস্টুরেন্টে ঢুকল গিলবার্ট ম্যাসন।

টেবিল পাবার জন্য যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে দেখা গেল গিলবার্ট ম্যাসনের কাঁধ। বরাবরের মতোই চেহারায় অন্তত দু'রকমের মিশ্র অনুভূতির ছাপ তার। লিমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে লোকজনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে এলো সে কোনার টেবিলের দিকে, ভাব দেখে মনে হলো, আর কেউ ধারেকাছে আছে, সেটা জানে না মোটেই।

'ওয়েলকাম হোম,' লিমার গালে হালকা একটা চুমো দিল সে, উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'দারুণ লাগছে তো তোমাকে দেখতে! মনে হচ্ছে, অ্যাসপেনের আবহাওয়া তো তা হলে সত্যিই ভাল!'

'চমৎকার সময় কেটেছে ওখানে আমার,' রানার সঙ্গে একান্ত মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মৃদু হাসল লিমা। ...আর, ওখানে কৌতূহলী হয়ে ওঠার মতো দারুণ এক রহস্যও পেয়েছি।'

কপট বিস্ময়ের ভান করল ম্যাসন। 'ওরকম একটা সংস্কৃতি-বর্জিত নব্য-বড়লোকদের সার্কাস-তাঁবুতে এমন কী ঘটতে পারে, যেটা আমাকে কৌতূহলী করে তুলবে, লিমা?'

বয় এসে লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে যাবার পর লিমা বলল, 'প্রাক্তন এক নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সঙ্গে কয়েকজন নামী লোকের

সম্পর্ক ছিল, সেটা লুকানোর জন্যে সেসব নামী লোকরা যদি মানুষ খুন করায়, তা হলে কী ঘটছে জানতে আগ্রহ বোধ করবে তুমি?'

পুরু কালো গোঁফে তা দিল গিলবার্ট ম্যাসন। 'নির্ভর করে নামী লোকগুলো কারা, মানুষ খুনের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা কতখানি, তার ওপর।'

'যদি সেসব লোকদের একজন হয় ইউএস সিনেটর, আরেকজন এক রাজ্যের স্টেট সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস, আর অন্যজন আরেক রাজ্যের মাল্টি-বিলিওনেয়ার ব্যবসায়ী?'

একটা ভ্রূ উঁচু করল গিলবার্ট ম্যাসন, গম্ভীর চেহারায় লিমাকে দেখল। 'তুমি আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছ, মিস সোরেনসন, মাই লাভ!' ভাল করেই সে জানে, ফালতু কথা বলবার মেয়ে নয় লিমা। ও যদি বলে বড় স্টোরি নিয়ে কাজ করবে, তা হলে ঘটনা আসলেই বড় হবে।

এবার লিমা বলল, 'পুরো ইনডেপথ রিপোর্ট শুধু টাইমের। খরচ-খরচা বাবদ প্রথমে অগ্রিম দিতে হবে মাত্র পনেরো হাজার ডলার—যা বাঁচে, ফেরত পাবে। আর রিপোর্টের জন্যে আমার সম্মানী কত হবে সে ব্যাপারে আমরা পরে আলাপ করতে পারি। কী বলো... রাজি?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা-ভাবনা করল গিলবার্ট ম্যাসন। 'কীভাবে কাজ শুরু করতে চাইছ তুমি?'

'প্রথমে যাব ওয়াশিংটনে, ন্যাশনাল আর্কাইভে খোঁজ নেব সেই নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ব্যাপারে। ওখানে এসব ব্যাপারে তথ্য থাকার কথা। যদি আগ্রহী হও তা হলে লেখাটা তোমাদের পত্রিকাকে আগে দেখতে দেব।'

'ভাল একটা রিপোর্ট হতে পারে,' চোখ পিটপিট করে লিমাকে দেখল গিলবার্ট ম্যাসন। 'তবে তোমার সঙ্গে আমাদের একজন সিনিয়র রিপোর্টার থাকলে আমরা খুশি হবো।'

কথাটা শুনে মাথায় রক্ত উঠে গেল লিমার, খেপে গিয়ে বলল, 'তা হলে তো চুক্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি আমার ঘাড়ে আর কাউকে চাপিয়ে দেবে, তা আমি কিছুতেই মেনে নেব না। আগেও এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আগেও তোমাদের পত্রিকার সঙ্গে কাজ করেছি আমি, কাজেই তোমরা জানো, আমি কী পারি, আর কী পারি না। তোমরা যদি আমার শর্তে রাজি না থাকো, তো বেশ, আমি না হয় নিউয উইক-এ যোগাযোগ করব। ওদের সঙ্গে হয়তো টাইম-এর চেয়ে ভাল কোনও চুক্তি করতে পারব আমি।'

'এটা কিন্তু ব্ল্যাকমেইল,' প্রশ্রয়ের হাসি হাসল গিলবার্ট ম্যাসন। 'অগ্রিম পাঁচ হাজার ডলার আর একা কাজ করার সুযোগ—প্রস্তাবটা কেমন লাগছে, বলো তো?'

মৃদু হাসল লিমা। 'তুমি ভাল করেই জানো, টাকা যথেষ্টই আছে আমার। ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে চাইছি না বলে খরচের টাকাগুলো অগ্রিম চাইছি। চোদ্দো হাজার দিলে হয়তো রাজি হয়ে যাব আমি। যেরকম ভাবছি, কাহিনিটা যদি অতটা বড় হয়, তা হলে সম্মানী দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে তোমাদের পত্রিকা।'

'আমেরিকান-ইযরায়েলি ফরেন পলিসিকে চোখ বুজে সাপোর্ট দেয়ায় বহির্বিশ্বে বিক্রি কমে ইদানীং প্রায় নিঃস্বই হয়ে গেছি আমরা,' চেয়ারে হেলান দিয়ে পেটের উপর দু'হাত রাখল ম্যাসন। 'আর্থিক ভাবে না হলেও, মানসিক ভাবে আমরা আসলেই নিঃস্ব। ...সে যাক, ছয় হাজার?' কৌতূহলী চোখে লিমার দিকে তাকাল ম্যাসন।

মাথা নাড়ল লিমা। 'তেরো।'

'সাত।'

'বারো।'

'আট।'

'দশ। এর চেয়ে যদি কমাতে চাও, তা হলে আমি বরং নিউয

উইকের সঙ্গেই যোগাযোগ করব।'

হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল গিলবার্ট ম্যাসন। 'বিরক্তিকর আর্থিক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা যখন শেষই হলো, পুরনো দিনের কথা ভেবে সামান্য কয়েকটা পরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে। ...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছু ফাইল এখনও আর্কাইভে আছে, যেগুলো ক্লাসিফায়েড।' সেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল, বা যাদের ব্যাপারে খোঁজ নেবে তুমি, তাদের ফাইলগুলোও যদি ক্লাসিফায়েড হয়, তা হলে যাতে চোখ বোলাতে পারো, সে-ব্যবস্থা করা যাবে হয়তো। মেরিল্যান্ডের সুইটল্যান্ড ন্যাশনাল রেকর্ড সেন্টার-এ আমার পরিচিত এক লোক আছে। প্যাট্রিক হাওয়েল নাম ওর। খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করবে ও তোমাকে, তা বোধহয় হবে না, তবে ব্যাটা দরজাটা সামান্য ফাঁক করলেই তো যথেষ্ট, কি বলো? একটা পা দরজার ওপাশে রেখে রূপ দিয়ে ওকে পটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে তুমি।'

'খুব ভাল হয় তুমি ফোন করে বলে দিলে,' সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে যাওয়ায় নড়েচড়ে বসল লিমা।

'আরেকটা কথা, মাঝে মাঝে ফোন করে আমাকে জানিয়ো কী করছ,' বলল ম্যাসন। 'হাওয়ার্ড হিউয়েস কেলেঙ্কারির মতো কোনও কিছুতে আবারও জড়িয়ে পড়তে চাই না আমরা।'

'প্রমিয়,' কথা দিল লিমা।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা দু'জন রেস্টুরেন্ট থেকে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ওয়াশিংটন যাত্রার জন্য ব্যাগেজ গোছগাছ করল লিমা, তারপর মনভরা দ্বিধা নিয়ে বসল এস্কয়ার পত্রিকার লেখাটা শেষ করতে। লিখতে পারল না। মনটা উড়ুউড়ু করছে ওর। মনোযোগ একদম নেই।

ফোন করল অ্যাসপেনে, রানার বাংলোয়। বাংলোয় ফিরে কী কাণ্ড করছে হান্টার, তার প্রাঞ্জল বর্ণনা শুনে আন্তরিক খুশিতে হাসল প্রাণ খুলে। অনুভব করল, রটওয়াইলারটাকে সত্যি সত্যিই

ভালবেসে ফেলেছে ও। কল্পনায় দেখতে পেল, প্রাচীন কোনও জাহাজের কাঠের পা-ওয়ালা ক্যাপ্টেনের মতো গম্ভীর চেহারায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে হান্টার। রানাকে জানাল ও গিলবার্ট, ম্যাসনের সঙ্গে কী কথা হয়েছে। বলল, ওয়াশিংটনে যাচ্ছে খোঁজ-খবর নিতে। তারপর যখন ফোন রেখে দেবার সময় এলো, অবাক হয়ে গেল নিজের মুখ দিয়ে 'সত্যি খুব মিস করছি তোমাকে, রানা' কথাটা বের হতে শুনে। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ফোন রেখে চোখ রাঙাল নিজেকে: খবরদার, লিমা, মাসুদ রানাকে সংসারের মায়াজালে বেঁধে রাখতে পারবে না তুমি, কাজেই কষ্ট পেতে না চাইলে মনটাকে এভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে দিয়ো না!

লিমাকে বলে দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও তথ্য দরকার হলে মিলিটারি আর্কাইভ ডিভিশনের মডার্ন মিলিটারি ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে হবে।

রিসার্চ রুমের প্রবেশ-পত্রের জন্য দরখাস্ত করতে প্রথমে ওকে যেতে হলো রুম দুইশো এক-এ। কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না প্রবেশ-পত্র পেয়ে যেতে। এবার ওকে পথ-নির্দেশনা দিয়ে পাঠানো হলো রুম ১৩-ডব্লিউ-তে, মডার্ন মিলিটারি ব্রাঞ্চের অফিসে।

নিখুঁত-ভাবে ছাঁটা দাড়িওয়ালা মধ্যবয়স্ক আন্তরিক ভদ্রলোক সেখানে ওকে বললেন, 'আমার ধারণা পল হাইনরিখের ব্যাপারে বেশ বড় একটা ফাইল আছে আমাদের কাছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে নুরেমবার্গে ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের পরপর আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে যে ট্রায়াল হয়েছিল, সেগুলোর একটাতে বিবাদী ছিল পল হাইনরিখ। সম্ভবত পোল কেস-এ।'

'তা হলে পল হাইনরিখ যুদ্ধাপরাধী ছিলেন?' বিস্মিত হয়ে

জিজ্ঞেস করল লিমা।

'যতদূর মনে পড়ে, হ্যাঁ,' সামান্য দ্বিধা করে জানালেন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। 'তবুও নিশ্চিত হয়ে নিন, আসুন।'

পরবর্তী ছ'ঘণ্টা মাইক্রোফিল্ম রিডিং-রুমে কাটাল লিমা। পোল কেস-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে আটত্রিশটা মাইক্রোফিল্ম। সেগুলোতে আছে একুশটা শুনানির বর্ণনা। সবমিলিয়ে আট হাজার পৃষ্ঠার বেশি। লিমার কপাল ভাল, সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে নেই পল হাইনরিখ। স্ক্যান করে যা দরকার, সেগুলো পড়ল ও।

তেরো জানুয়ারি, উনিশশো সাতচল্লিশ সালে মামলার কার্যক্রম শুরু হয়, শেষ হয় এগারো আগস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ-এ।

পোল-এর কেস পরিচালিত হয় এসএস-এর ওবার-গ্রুপেনফুয়েরার (জেনারেল) অসওয়াল্ট পোল-এর বিচারের জন্য। ওয়ার্টস্‌শ্যাফট্‌স্ আন্ড ফারওয়াল্টাংস হওপ্ট্যাম্প-এর চিফ ছিলেন উনি। অর্থাৎ এসএস ইকোনমিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বে ছিলেন। ডব্লিউভিএইচএ-র আরও সতেরোজন অফিসারও অভিযুক্ত হন অসওয়াল্ট পোল-এর সঙ্গে। অভিযোগগুলো ছিল, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নিয়ম-শৃঙ্খলায় অমানবিক সব পরিবর্তন বাস্তবায়ন, বন্দিদের উপর নির্মম অত্যাচার, বন্দিদের অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে গুরুতর অসুস্থ করে ফেলা, বন্দিদের উপর অবৈধ, পৈশাচিক ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিনা বিচারে বন্দি হত্যা।

ডব্লিউভিএইচএ বিভক্ত ছিল পাঁচটি সেকশনে, প্রতিটা সেকশনের কাজ ছিল আলাদা। 'অ্যাম্‌স্‌গ্রুপে এ' ছিল এসএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্বে। 'অ্যাম্‌স্‌গ্রুপে বি' ছিল এসএস-এর বাসস্থান, খাবার ও রসদের দায়িত্বে। বন্দি-শিবিরেও ওই একই দায়িত্ব পালন করত অ্যামসগ্রুপে বি। 'অ্যামসগ্রুপে সি'-এর দায়িত্ব ছিল জমিজমার

দেখভাল করা ও দালান তৈরি। বন্দি-শিবিরের দালান-কোঠাও অ্যামস্গ্রুপে সি-ই তৈরি করেছিল। 'অ্যামসগ্রুপে ডব্লিউ' ছিল এসএস-এর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে। 'অ্যামসগ্রুপে ডি'-র কাজ ছিল বন্দি-শিবিরের শৃঙ্খলা রক্ষা। এই শাখার প্রধান জেনারেল কার্ল শ্যুট যুদ্ধের পর আত্মগোপন করেন, পরে আর কখনোই খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন *লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ*।

পোল কেস-এর আঠারোজন অভিযুক্ত আসামীর তিনজনকে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হয়, দু'জনের হয় মৃত্যুদণ্ড ও অন্য তেরোজনকে দেয়া হয় দশ বছর থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল পল হাইনরিখকে, কিন্তু পরে শাস্তি কমিয়ে দশ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সাত বছর কারাদণ্ড ভোগ করেই উনিশশো পঞ্চান্ন সালে মুক্তি পান পল হাইনরিখ।

মামলার রায়ে লেখা পল হাইনরিখের যুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত জীবনী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ল লিমা। বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এই লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওয়্যাফেন এসএস-এর একটা প্যাঞ্জার ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন। ওই প্যাঞ্জার ডিভিশন পোলান্ড, হল্যান্ড, ইউগোস্লাভিয়া, গ্রিস ও রাশিয়া আক্রমণ করে। হল্যান্ডে যুদ্ধ করবার সময় বীরত্বের কারণে পল হাইনরিখকে নাইট্স্ ক্রস পদকে ভূষিত করা হয়। ইউগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহসী অবদানের জন্য পল হাইনরিখ পান ওক লিভ্স্ মেডাল। উনিশশো একচল্লিশে রাশিয়ান ফ্রন্টে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করায় অন্য দুটো পদকের সঙ্গে যোগ হয় জোড়া তলোয়ার। রোস্তোভের কাছে রাশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পল হাইনরিখের প্যাঞ্জার ডিভিশন। প্রথমবারের মতো পিছু হটতে বাধ্য হন তিনি।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের জুন মাসে তাঁর ছিন্নভিন্ন

ডিভিশনটাকে নতুন করে সাজানোর উদ্দেশ্যে ফেরত আনা হয় রাশিয়া থেকে। বার্লিনে ছুটি কাটাচ্ছিলেন পল হাইনরিখ, সেসময় জেনারেল অসওয়াল্ট পোল তাঁকে প্যাঞ্জার ডিভিশনের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। পল হাইনরিখের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন তিনি, নতুন গড়ে তোলা ডব্লিউভিএইচএ-তে নিয়ম-শৃঙ্খলা তৈরি ও সেগুলো বজায় রাখবার ব্যাপারে পল হাইনরিখের সাহায্য কামনা করেন। পোল-এর ডায়রি অনুযায়ী, হাইনরিখ তাঁর ডিভিশন ছেড়ে সরে আসতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তবে রাশিয়ায় পরাজিত হয়ে হাইনরিখ বুঝে গিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে। দ্বিধায় ভুগছিলেন তিনি। জেনারেল অসওয়াল্ট পোল রাইখ্স্ফুয়েরার হিমলারকে অনুরোধ করে পল হাইনরিখকে ডব্লিউভিএইচএ-তে ট্র্যান্সফার করান।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয়ে যাবার পর অস্ট্রিয়ান সীমান্তে, দক্ষিণ জার্মানির ড্যাজিং শহরের কাছে আত্মগোপন করেন পল হাইনরিখ। এগারো মাস পর আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়েন তিনি, বিচারের আগে পর্যন্ত নুরেমবার্গ ডিটেনশন সেন্টারে কারাবন্দি করে রাখা হয় তাঁকে।

মামলার লিখিত বিবরণে চোখ বুলাল লিমা। দিন শেষে ব্যথায় টনটন করল ওর ঘাড়, মনে হলো দু'চোখে মরিচ ডলে দিয়েছে কেউ। খিঁচ ধরল পাগুলোতে। সারাদিন পড়ালেখা করেও ওই নামগুলোর সঙ্গে পল হাইনরিখের কী সম্পর্ক থাকতে পারে সে-ব্যাপারে সামান্যতম সূত্র পেল না ও। ঘড়ি দেখল একসময় ক্লান্ত হয়ে। আর পনেরো মিনিট পর বন্ধ হয়ে যাবে রিসার্চ রুম। জেদের বশে আবারও মাইক্রোফিল্মের প্রথম রোল-এ চোখ রাখল লিমা।

এবার যা দেখল, তার মর্মার্থ বুঝতে খানিকটা দেরি হলো ওর। ফিল্মের ওই সেকশনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লিমা। পড়ল আরেকবার. তারপর বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ

অজান্তেই থাবড়া মারল ও টেবিলে। আশপাশের টেবিলে যারা রিসার্চের কাজে ব্যস্ত, ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত চোখে দেখল ওকে।

চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল লিমা, বিড়বিড় করে বলল, 'পেয়েছি!' রাগ হলো ওর নিজের উপর। ভেবে পেল না এই সহজ জিনিসটা কী করে চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ওর। বোধহয় খুব দ্রুত পড়ে গিয়েছিল ও আগেরবার।

প্রিযাইডিং জাজ
লিউট হ্যামিলটন গেট্‌সবি

জাজ অভ দ্য সুপিরিয়র কোর্ট ফর
দ্য ফোর্থ জুডিশিয়াল
ডিসট্রিক্ট অভ ওহাইয়ো

চিফ কাউন্সিল ফর দ্য প্রসিকিউশন,
হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল

অ্যাটর্নি, ইউনাইটেড স্টেটস
ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিস

হোটেলে ফিরে রুম-সার্ভিসের পৌঁছে দেওয়া খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে টুকে আনা নোটগুলোতে চোখ বোলাল লিমা। ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক বা জর্জ গ্রুসাকের কোনও উল্লেখ নেই মামলার বিবরণীতে। তাদের ব্যাপারে হয়তো কোনও তথ্য থাকতে পারে ন্যাশনাল রেকর্ডস্ সেন্টারে। যেটুকু জেনেছে, সেটা নিয়ে গিলবার্ট ম্যাসনের সঙ্গে আলাপ করবে, ঠিক করল ও। সিনিয়র এডিটরের অ্যাপার্টমেন্টের নম্বরে ফোন করল দেরি না করে।

ইযি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেবার ফাঁকে লিমার বক্তব্য শুনল গিলবার্ট ম্যাসন। দামি একটা সিগার ধরিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ছাদের দিকে ছুঁড়ে দিল একরাশ ধোঁয়া। তার মনে পড়ল, লিমা একবার বলেছিল, খুব কম মানুষই স্টাইল করে সিগার টানতে পারে। সে তাদেরই একজন।

লিমা থেমে যাবার পর সে বলল, 'পল হাইনরিখ যাদের নাম লিখেছিল তার কোডে, মনে হয় ওয়ার-ক্রাইম ট্রাইবুনালের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে তাদের। আজ সকালে কৌতূহল বোধ করায় আমাদের অফিসের ফাইলগুলো ঘেঁটেছি। দেখলাম, জর্জ গ্রুসাকও জড়িত ছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে। পরে নির্বাচনী প্রচারণায় নিজের অতীত রেকর্ড কাজে লাগান তিনি, নামটা মানুষের মন থেকে মুছে যাবার আগেই নির্বাচিত হন কংগ্রেসম্যান হিসেবে। তাঁর ছেলেও রাজনীতির মাঠে নামে। জানোই তো, ফ্রেডারিক গ্রুসাক বেশ প্রভাবশালী একজন সিনেটর।'

'আর ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক?' জিজ্ঞেস করল লিমা, 'তার ব্যাপারে কিছু জেনেছ?'

'জেনেছি। পরে বলছি।'

'আরও তথ্য আছে তা হলে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ। ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের ব্যাপারে। আমার এক বন্ধু ফরচুন পত্রিকার এসোশিয়েট এডিটর, ওর কাছ থেকে কিছু তথ্য পেয়েছি। ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ফিনিক্সের একটা বড় ইলেক্ট্রনিক্স ফার্ম-এর প্রেসিডেন্ট। পদটা পান তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে। তাঁর বাবা হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিসের বড় চাকুরে ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের পর চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামেন তিনি। দ্রুতই উন্নতি করেন। ফরচুনের প্রথম পাঁচশো বড় কম্পানির মধ্যে নেই ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের কম্পানি, তবে শীঘ্রি হয়তো চলে আসবে। ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে ভদ্রলোকের সম্পর্ক ভাল, যে-কারণে প্রচুর টপ সিক্রেট সরকারী প্রজেক্ট পেতে ঝামেলা হয় না তাঁর কম্পানির। অবশ্য পল হাইনরিখের সঙ্গে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল বা তাঁর বাবার কোনও রকমের কোনও সম্পর্কের লেশমাত্র আভাস পাওয়া যায়নি।'

'আর ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক?'

'কাগজ-কলম নাও,' পাশের টেবিল থেকে একটা নোটপ্যাড তুলে নিল গিলবার্ট ম্যাসন, লিমা কাগজ-কলম নেবার পর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল:

'ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক থ্রী, ক্যান্টোরেক টয় কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হিমেলস্টোস ক্যান্টোরেকের প্রপৌত্র। কম্পানিটা জার্মানির হ্যামবার্গ-এ এস্টাবলিশ করা হয়। ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক এখনও ওই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও মালিক। ভদ্রলোক উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে, সতেরো বছর বয়সে ব্যবসার দায়িত্ব নেন। এখন তাঁর বয়স সাতাশি। তাঁদের কম্পানি বিগত দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে যান্ত্রিক খেলনা বানিয়ে আসছে। হিটলার বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন বলে উনিশশো আটত্রিশ সালে জার্মানি ত্যাগ করে পরিবার-পরিজন নিয়ে আর্জেন্টিনা চলে যান ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক। যুদ্ধের বছরগুলোয় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে ব্যবসা করেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাঁর হ্যামবার্গ ও হ্যানোভারের ফ্যাক্টরিগুলো দখল করে যন্ত্রপাতি বদলে নেয় জার্মান সরকার, ওখানে তখন ল্যান্ড-মাইন ও হ্যান্ড-গ্রেনেড তৈরি করা হতো। যুদ্ধের পর ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের কাছে ফেরত দেয়া হয় ফ্যাক্টরিগুলো। উনিশশো বায়ান্ন সালে লং আইল্যান্ডে নতুন আরেকটা ফ্যাক্টরি খোলেন তিনি। তখন থেকে অয়েস্টার বে'র প্রাসাদোপম বাড়িতেই কাটাতে থাকেন বেশিরভাগ সময়। বছরে দু'বার বুয়েনস আইরিস ও হ্যামবার্গ-এ ব্যবসায়িক কনফারেন্সে যোগ দেবার কথা বাদ দিলে বাড়িতে থেকেই চালান গোটা ব্যবসা।'

ম্যাসন থামতেই জিজ্ঞেস করল লিমা, 'পল হাইনরিখের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক?'

'ছিল বলে কোনও তথ্য নেই। তবে আমার মনে হয়, একটা কারণে পল হাইনরিখের লিস্টে ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের নাম থাকতে পারে। সম্ভবত ওই একই কারণে লিস্টে অন্যদের নামগুলোও আছে।'

'বলো, শুনি তোমার থিওরি।'

'শুনতে ভাল লাগবে না তোমার।'

'তবুও শুনি।'

'যুদ্ধকালীন সময়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে বন্দিদের দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করাত এসএস বাহিনী। এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব যে, ক্যান্টোরেক টয় কম্পানির ফ্যাক্টরিতেও তৈরি হতো ওসব। পরে যুদ্ধ শেষে ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক হয়তো অবৈধ ভাবে তাঁর ফ্যাক্টরি ব্যবহারের কারণে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন পল হাইনরিখের বিরুদ্ধে।'

'সম্ভাবনাটা বাদ দিতে পারো,' আপত্তির সুরে বলল লিমা। 'ট্রায়ালের সময় পল হাইনরিখের বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষ্য দেননি ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক। বাদী-বিবাদী, কোনও পক্ষের সাক্ষীর ভেতরে নাম নেই তাঁর। ...আর, অন্যদের নাম কেন তাঁর কোডে লিখেছিলেন পল হাইনরিখ, ম্যাসন? ...শুনি তোমার থিওরি?'

'প্রতিশোধ নেবার জন্যে,' গম্ভীর সুরে বলল গিলবার্ট ম্যাসন। 'ঈশ্বর জানেন, কেন কাকে শত্রু মনে করতেন পল হাইনরিখ। কিন্তু লিস্টে লিউট হ্যামিলটন গেটস্বি আর হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের নাম থাকাটা খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। এঁদের একজন পল হাইনরিখের বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে তুলেছেন, অন্যজন দিয়েছেন শাস্তি তার ওপর বিচার করা হয়েছে এরকম ভেবে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার ঘটনা জেলখাটা কয়েদীর বেলায় আগেও ঘটেছে অনেক। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জেল থেকে বেরিয়ে ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে প্রাক্তন কয়েদীরা. বাস্তব দুনিয়ার নানান কাজে জড়িয়ে পড়ে বলে প্রতিশোধ নেয়া আর হয়ে ওঠে না তাদের। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, লিমা, এরকমটা ঘটতে পারে কিন্তু পল হাইনরিখের বেলাতেও। পল হাইনরিখ জার্মান আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলেন, ধরে নিতে পারি বুদ্ধির ঘাটতি

ছিল না তাঁর, কাজেই সহজেই তাঁর বুঝে নেবার কথা যে, খামোকা অলস চিন্তার পেছনে ছুটে সময় ও শক্তি অপচয় করে লাভ নেই কোনও। আমার তো ধারণা, মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পেরে এক সপ্তাহের মধ্যেই মাথা থেকে ও-ধরনের সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছিলেন উনি। অ্যাড্রেস বুকের নামগুলো নিয়ে পরে আর একদমই মাথা ঘামাননি।'

'আরও গূঢ় কোনও রহস্য আছে,' দ্বিমত পোষণ করল লিমা। 'না হলে অ্যাসপেনে খুন করা হতো না চার্লস রবিনসনকে।'

'সেটা ভেবেই তোমার অগ্রিম টাকার চেক আটকে দিইনি,' চট্ করে বলল ম্যাসন।

'আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের পরিমাণ জেনে বুকটা ভরে গেল,' শুকনো স্বরে জানাল লিমা।

'ব্যবসা,' খুকখুক করে কাশল ম্যাসন।

'কালকে তোমার সোর্স-এর কাছে যাচ্ছি,' কাজের কথায় এলো লিমা, '...আর ঠিক করেছি, ব্যারি ক্যাসলের ব্যাপারেও চোখ খোলা রাখব। কেন যেন মনে হচ্ছে, ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক সমস্ত কিছুতে একটু অন্যভাবে জড়িয়ে আছেন, রহস্যের জট খুলে গেলেই ধাঁধার ওই টুকরোটাও মিলে যাবে ঠিকমত। ...পরে যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।'

'মিস্টার হাওয়েল?' অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল লিমা।

'জী, আসুন প্লিয,' হড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার দেখাল প্যাট্রিক হাওয়েল। একবারের জন্যও তার চোখ সরল না লিমার কমনীয় মুখের উপর থেকে। বসে পড়েও তাকিয়ে থাকল হাওয়েল। 'এক্সকিউয মি, মিস...'

'সোরেনসন,' মিষ্টি করে বলল লিমা। 'লিমা সোরেনসন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ঘনঘন মাথা দোলাল প্যাট্রিক হাওয়েল।

'গিলবার্ট ম্যাসন আমাদের দু'জনেরই পরিচিত, কি বলেন? হাহ্-হাহ্-হাহ্!' কোটের পকেট থেকে স্টাইল করে সিগারেট বের করতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে গেল সে, হড়বড় করে বলল, 'মনে হচ্ছে যেন আগেও আপনার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে আমার, মিস সোরেনসন!'

'বোধহয় ভুল করছেন,' অতীত স্মৃতি ঘাঁটবার ফাঁকে বলল লিমা। 'দেখা হলে নিশ্চয়ই মনে থাকত আমার।' প্যাট্রিক হাওয়েলের বিব্রত চেহারা দেখে অপ্রস্তুত হলো ও, মিথ্যেটা বুঝি বা ধরা পড়ে গেল ওর। স্বল্প পরিচয়ে মনে থাকবে, সে-ধরনের চিড়িয়া নয় প্যাট্রিক হাওয়েল। বেঁটে, অতিরিক্ত মোটা, উচ্ছৃঙ্খল প্রাণশক্তিতে ভরপুর হোঁৎকা এক বিদঘুটে লোক।

ওই প্রাণশক্তি কমার্শিয়ালি খাটানো গেলে ইলেকট্রিসিটির চাহিদা অর্ধেকটা মিটে যেত ওয়াশিংটন ডিসির, মনে মনে বলল লিমা।

ফোন বেজে উঠল প্যাট্রিক হাওয়েলের ডেস্কে। রিসিভার তুলতে গিয়ে পাশ থেকে ওটা ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল হাওয়েল, মাথা নাড়ল বিরক্ত হয়ে। কপালে জমে উঠল তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। ফোনে কথা শেষ করে লিমার দিকে আগ্রহী চোখে তাকাল সে।

যা বলবার সহজভাবে বলে ফেলবে, ঠিক করল লিমা। মিথ্যে বলবে না পারতপক্ষে, দরকারে একটু যোগ করবে, বা একটু বাদ দেবে। হাওয়েলের লোলুপ দৃষ্টি গ্রাহ্য না করে বলল, 'একটা ফিচার নিয়ে কাজ করছি আমি। এক প্রাক্তন নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ওপর ফিচার। যুদ্ধ শেষে নুরেমবার্গের ওয়ার-ক্রিমিনাল কোর্টে বিচার হয় তার। ন্যাশনাল আর্কাইভে গিয়েছিলাম, ওখানে দরকারী বেশিরভাগ তথ্যই পেয়ে গেছি, তবে জর্জ গ্রুসাক নামের এক ভদ্রলোকের ব্যাপারে কোনও তথ্য পাইনি অনেক খুঁজেও। কয়েকটা ফুটনোট থেকে জানতে পেরেছি, ওই লেফটেন্যান্ট

কর্নেলের মামলার সঙ্গে জর্জ গ্রুসাক নামের এক ভদ্রলোকও কোনওভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু কীভাবে জড়িত ছিলেন, সেটা জানতে পারিনি কিছুতেই।'

'নাম ছাড়া আর কোনও কিছু নেই খুঁজবার মতো?' জিজ্ঞেস করল হতাশ হাওয়েল।

'না।' অনেকদিন আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করা 'ভীষণ অসহায় বোধ করছি' হাসিটা ঝেড়ে দিল লিমা। 'শুধু জানি, কোনও না কোনও ভাবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের মামলার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওঁর।'

এ-কথায় ভ্রূ কুঁচকে ফেলল প্যাট্রিক হাওয়েল, চিন্তিত ভঙ্গিতে তবলা বাজাল চেয়ারের হাতলে। 'ওই লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ট্রায়ালটাকে ক্রস রেফারেন্স করে দেখতে পারি আমরা কী পাওয়া যায়। যতদূর জানি, প্রসিকিউশনের স্টাফদের অনেকেই ছিলেন মিলিটারি অফিসার। মিলিটারি ইউনিটগুলোর কোনওটায় নাম থাকতে পারে হয়তো জর্জ গ্রুসাকের।'

'এভাবে সাহায্য করছেন বলে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, মিস্টার হাওয়েল,' কোকিল কণ্ঠে মধু ঝরাল লিমা। 'কোনও ভাবে যদি এই ঋণ শোধ করতে পারি...' একটু দেরিতে বুঝল লিমা ওর কথার প্রতিক্রিয়া কী ধরনের হতে পারে। মনে মনে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ও।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, কথাটা সঙ্গে সঙ্গে খপ করে ধরল প্যাট্রিক হাওয়েল, হাসিমুখে বলল, 'চিন্তা করবেন না, ঋণ কীভাবে শোধ করবেন, সেটা না হয় আমিই ভেবে বের করে ফেলব, কেমন? ...লাঞ্চ দিয়ে শুরু করতে পারি আমরা। আপনি যখন এলেন, তখন লাঞ্চে যাচ্ছিলাম আমি। আপনার কাজে এক্ষুনি একজনকে লাগিয়ে দিচ্ছি, লাঞ্চ শেষে ফিরে আমরা হয়তো দেখব দারুণ কিছু জেনে গেছে ও। এখন ফাইলটা ক্লাসিফায়েড না হলে হয়!' কোটের পকেটে হাত ভরে দিল সে

কলম খুঁজতে। রাখবার সময় বলপয়েন্ট কলমের খাপ আটকায়নি হাওয়েল, কলম বের করতে গিয়ে আঙুলগুলোতে কালি মাখামাখি হয়ে গেল তার। একটা একটা করে আঙুল চেটে পরিষ্কার করল সে, তারপর যেটুকু কালি ওঠানো গেল না কিছুতেই, সেগুলো মুছল প্যান্টে।

'ঈশ্বর!' মনে মনে কাতরোক্তি করল লিমা।

ফোনের রিসিভার তুলে অফিসের অন্য সেকশনে ডায়াল করল প্যাট্রিক হাওয়েল, অধীনস্থ কাউকে জানিয়ে দিল, কী খুঁজতে হবে'।

লাঞ্চে যতটা বিরক্ত করবে লোকটা, ভেবেছিল লিমা, ততটা করল না প্যাট্রিক হাওয়েল।

অফিসে ফিরে ডেস্কের উপর একটা নোট দেখতে পেল ওরা। সিকিউরিটি সেকশনের কোনও এক মিস্টার রনসনের সঙ্গে প্যাট হাওয়েলকে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ওটাতে।

ফোনে কথা বলে লিমার দিকে তাকাল প্যাট্রিক হাওয়েল। 'সাধারণ ফাইল, ক্লাসিফায়েড নয়। আমি যাব আর আসব। ফাইলটা নিয়ে আসছি।'

আধঘণ্টা পর হাতের ভাঁজে মোটা একটা ফাইল নিয়ে আবার ফিরে এলো প্যাট্রিক হাওয়েল, ফাইলটা লিমার সামনে ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল। 'করিডরের ওদিকে একটু যেতে হবে আমাকে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে। দশ মিনিটের মধ্যে ফিরব।'

প্যাট্রিক হাওয়েল বেরিয়ে যেতেই ফাইলে মনোযোগ দিল লিমা। জর্জ গ্রুসাক তাঁর কর্মজীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন ওএসএস, অর্থাৎ অফিস অভ দ্য স্ট্র্যাটিজিক সার্ভিসেস-এর সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরোটা সময় ওএসএস-এর সঙ্গেই ছিলেন তিনি। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের আগে যেসব অ্যাসাইনমেন্টে গিয়েছিলেন জর্জ গ্রুসাক, সেগুলোয় চোখ বুলাল লিমা। এনিমি

লাইনের পিছনে প্যারাশুট-ড্রপ করা হয় তাঁকে, পোল্যান্ডে আন্ডারগ্রাউন্ড-এর এক ডাবল-এজেন্টকে হত্যা করেন তিনি, এ ছাড়াও সুইডেন ও সুইটযারল্যান্ডে কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টে যান। এবার ফাইলের যুদ্ধপরবর্তী সময়ে চলে এলো লিমা। যা খুঁজছে, সেটা পেয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না ওর।

ছাব্বিশ বছর বয়সে অফিস অভ স্ট্র্যাটিজিক সার্ভিসেস-এর রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ব্রাঞ্চে যোগ দেন জর্জ গ্রুসাক, জার্মান ভাষা ভাল জানতেন বলে ওয়ার ক্রাইম ট্রাইবুনালে কাজ করতে পাঠানোর আগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁকে। একইসঙ্গে বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে কেস সাজানোর দায়িত্বও পালন করেন তিনি। ওয়্যাফেন এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের মামলার প্রস্তুতিও তিনিই সম্পন্ন করেন। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন ওএসএস ভেঙে দিলেন, জর্জ গ্রুসাক রয়ে গেলেন আমেরিকান অফিসারদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে। পরে হাই কমিশনারের অফিসে যোগ দেন তিনি। এরপর উনিশশো আটচল্লিশ সালে আমেরিকায় ফিরে এসে শ্যাড্স্ফোর্ড, পেনসিলভেনিয়াতে স্থায়ী হন।

লিমার পড়া শেষ হবার কয়েক সেকেন্ড পর অফিসে ঢুকল প্যাট্রিক হাওয়েল। 'আমি না থাকায় সময়টা একা নিশ্চয়ই খুব খারাপ কাটেনি আপনার? পেয়েছেন, যা খুঁজছিলেন?'

'পেয়েছি,' বলল লিমা। 'জানলাম অনেক কিছু। সত্যি, এভাবে এতটা সাহায্য করেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার হাওয়েল।' ভদ্রতার হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেরি না করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লিমা প্যাট্রিক হাওয়েলের অফিস থেকে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওর।

নিউ ইয়র্কে ফিরে অপরাধবোধ থেকে আসা তাগাদা লিমাকে বাধ্য

করল বিকেলবেলা থম মেরে বসে এস্কয়ার পত্রিকার জন্য আর্টিকেলটা লিখে ফেলতে। কাজটা সেরে স্বস্তি অনুভব করল ও। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, এখনও যদি লেখা শেষ না করে, তা হলে পরে আর কখনোই শেষ করা হয়ে উঠবে না।

পল হাইমরিখের ব্যাপারে ওর অগ্রগতি বেশ উৎসাহিত করে তুলেছে গিলবার্ট ম্যাসনকে। হতাশ করার মত একটা কথাও বলেনি সে। এরপর লিমা কী করতে যাচ্ছে শুনে সায় দিয়ে বলেছে, 'চালিয়ে যাও। আমার মনে হয় ঠিক পথেই আছো তুমি।'

চারবার রিং করবার পর শেষপর্যন্ত রানাকে ফোনে পেল লিমা, উচ্ছ্বসিত হয়ে জানাল, এ পর্যন্ত যা জেনেছে।

'জার্মানি!' লিমার সিদ্ধান্ত শুনে বিস্মিত হলো রানা, 'হঠাৎ জার্মানিতে কেন?'

'বলব, আগে চলে এসো তুমি আমার এখানে,' বলল লিমা। উদ্বেগ চাপা থাকল না ওর কণ্ঠে, 'আসছ তো, রানা?'

দ্বিধায় ভুগল রানা, তারপর বলল, 'হান্টারকে রাখা যাবে ডক্টর জেঙ্কিন্সের কেনেলে। ভদ্রলোক পছন্দ করেন হান্টারকে, তাঁর ওখানে অসুবিধে হবে না ওর। অ্যাসপেনে জরুরি কোনও কাজও নেই আমার। ...কয়দিনের জন্যে?'

'এক, বা বড়জোর দু'সপ্তাহ,' বলল লিমা। 'কবে আসতে পারবে তুমি?'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'কবে যেতে চাও তুমি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব? কবে আসতে পারবে তুমি?'

'কাল।'

'চলে এসো তা হলে, রানা, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকছি,' ফোন রেখে মনে মনে স্বীকার করল লিমা, আবারও রানার সঙ্গ পাবে ভাবলেই পুলকিত হয়ে উঠছে ও।

ফিনিক্সে গিয়ে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ও তার লোকদের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা নেবার জোরালো তাগিদ অনুভব করছে রানা, যদিও জানে, মাথা গরম করে ফিনিক্সে যাওয়া উচিত হবে না ওর মোটেও।

লিমার ফোন সাহায্য করল ওকে মনস্থির করতে। পল হাইনরিখকে ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করত ও, কিন্তু ভদ্রলোকের রেখে যাওয়া ধাঁধাটার ব্যাপারে তেমন কোনও কৌতূহল কাজ করছে না ওর মনে। ধাঁধা জাহান্নামে যাক, যারা ওর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, যারা ওর বন্ধু আত্মভোলা, সরল-সোজা চার্লস রবিনসনকে বিনা কারণে হত্যা করেছে, তাদের ছাড়বে না ও। বন্ধু হিসেবে তুলনা ছিল না চার্লির। চার্লির মৃত্যু ওকে দায়বদ্ধ করেছে। মনের প্রশান্তি ফিরে পেতে হলে চার্লি-হত্যার প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে। কীভাবে নেবে, তা এখনও স্থির করেনি রানা। তবে ভাল করেই জানে, প্রভাবশালী একদল নিষ্ঠুর, স্বার্থান্ধ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ওকে, কাজেই যা করবার, করতে হবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে। অনেকগুলো উপায় নিয়ে ভেবেছে ও, একটা একটা করে সবগুলো পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে শুধু একটা কারণে, ওগুলোর কোনওটারই আইনগত গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তারপর আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে একসময় স্বীকার করে নিল, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বে-আইনী কিছু করতে বাধবে না ওর, আসলে নিজেকে আইনের প্রতি যতটা শ্রদ্ধাশীল, নিরীহ মানুষ ভাবত, ততটা সহজ লোক আসলে নয় ও। তবুও, যা করবে, করতে হবে ভেবেচিন্তে, নিজেকে বাঁচিয়ে।

লিমার সঙ্গে জার্মানিতে যেতে রাজি হয়েছে রানা দুটো কারণে। এক, অস্থির মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে দূর থেকে পরিস্থিতি বিচার করে দেখলে পরিষ্কার একটা ধারণা জন্মাবে ওর মনে। দুই, লিমার সঙ্গ সত্যিই উপভোগ করবে ও। তা ছাড়া, হান্টারকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, ডক্টর জেঙ্কিন্সের হেফাজতে ভাল থাকবে ও।

সে-রাতে ডেযমন্ড হেইঞ্জকে ফোন করল রানা, লিমার সঙ্গে

যা কথা হয়েছে, জানাল তাঁকে, তারপর এ-ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে ও নিজেও জার্মানি যাচ্ছে জানিয়ে বিদায় নিয়ে ফোন রাখল।

রাতেই কথা বলে রেখেছে, পরদিন সকালে হান্টারকে ডক্টর জেঙ্কিন্সের অফিসে পৌঁছে দিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এলো ও; রওনা হলো আধঘণ্টা পর, ডেনভার ফ্লাইটে।

ডেনভার থেকে কানেকটিং ফ্লাইটের বিরক্তিকর যাত্রা শেষে একসময় পৌঁছে গেল ও নিউ ইয়র্কে।

রিসেপশনে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল লিমা, হাসিমুখে এগিয়ে এসে রিসিভ করল ওকে। ছোট্ট বুইক গাড়িটাতে ব্যাগেজ তুলে রওনা হয়ে গেল ওরা দেরি না করে। ওর অ্যাপার্টমেন্টে রানাকে নিয়ে চলেছে লিমা।

'জার্মানি কেন?' এয়ারপোর্ট পার্কিং-এরিয়া থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'লিস্টের সবাই তো আমেরিকাতে থাকে।'

'থাকে, কথাটা ঠিক,' নরম স্বরে বলল লিমা। 'লিস্টে যাদের নাম আছে, তাদেরকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করাই যৌক্তিক মনে হয়, এটাও ঠিক। কিন্তু অ্যাসপেনের ঘটনাগুলোর পেছনে যদি তারাই থেকে থাকে, তা হলে আমরা কী করতে যাচ্ছি, সেটা ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল বা তার প্রভাবশালী সঙ্গীদের জানানো উচিত হবে না মোটেই।' স্টিয়ারিং হুইলে টোকা মারল লিমা। 'পল হাইনরিখের অ্যাড্রেস বুক যেভাবে আমাদের হাতে এসেছে, তাতে এটা খুবই সম্ভব, আমরা কয়েকজন ছাড়া ওটার অস্তিত্বের কথা জানে না আর কেউ।'

পাশ থেকে লিমার কমনীয় মুখটা দেখল রানা। 'পল হাইনরিখের মামলার সঙ্গে জড়িত নয় একমাত্র ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক। তার ব্যাপারে খোঁজ নিলে হয়তো সহজেই খুলে যাবে রহস্যের জট।'

'হয়তো,' ট্রাফিক বাতি লাল হয়ে যাওয়ায় গাড়ির গতি কমাল

লিমা। 'তবে পল হাইনরিখকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নিচ্ছি আমি। তাঁর ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানতে চাইছি। আমার ধারণা পল হাইনরিখের অতীত জানলে ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের নাম লিস্টে থাকার কারণটাও বেরিয়ে আসবে আপনা-আপনি। ইন্টারনেটে সার্চ করে জার্মান সরকারের ওয়ার ক্রাইম বিষয়ক ওয়েব সাইটে কিছুই পাইনি, না হলে হয়তো যেতেই হতো না জার্মানিতে। ...তোমার কী মনে হয়, রানা, জার্মানিতে গিয়ে সফল হবো আমরা?'

নিজের পাসপোর্টটার কথা মনে পড়ল হঠাৎ রানার। ওর পাসপোর্ট একেবারে নতুন, চার মাস আগে ইশ্যু করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসবার ভিসা ছাড়া আর কোনও দেশের ভিসা নেই ওটাতে। কিন্তু ওর স্পষ্ট মনে পড়ল, জার্মানিতে বেড়াতে গেছে ও। নাকি ব্যবসায়িক কাজে গিয়েছিল? ঠিক কোথায় কোথায় ঘুরেছে তখন, মনে পড়ল না কিছুতেই। টুকরো টুকরো স্মৃতি ঝড়ো বাতাসের তাড়া খাওয়া ছিন্ন মেঘের মতো বিদায় নিল দ্রুত। তবে মনে রয়ে গেল স্থির একটা ধারণা।

লিমার প্রশ্নের জবাবে রানা বলল, 'পল হাইনরিখের অতীত জানতে পারবে ভেবে জার্মানিতে যাচ্ছ তুমি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলতে পারবে তেমন বয়স্ক যাঁরা জার্মানিতে আছেন, তাঁরা যুদ্ধ বা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত কোনওকিছু নিয়ে কথা বলতে চাইবেন কি না সন্দেহ। ...তবে জার্মান সরকারের অফিশিয়াল কয়েকটা এজেন্সি আছে, ওই সময়ের বিস্তারিত ইতিহাস সংরক্ষণ করে ওগুলো। আমেরিকান সরকারী আর্কাইভের ফাইলে পল হাইনরিখের নাম পেয়েছ, কারণ মামলাটা পরিচালনা করে আমেরিকান সরকার। জার্মান রেকর্ড আরও অনেক নিখুঁত হবে। কবে জন্মেছিলেন পল হাইনরিখ সেটা তো থাকবেই, ক'দিন পর পর মোজা পাল্টাতেন, সে-তথ্য থাকলেও অবাক হবো না জার্মানবা সব কাজ নিখুঁত ভাবে করতে অভ্যস্ত।'

তথ্যের উৎস পেয়ে আগ্রহের সঙ্গে রানার দিকে তাকাল লিমা। 'বাইরের লোকের কাছে ফাইল দিতে গড়িমসি করে ওরা আমাদের সরকারী কর্মচারীদের মতো?' গাড়ি ছেড়ে দিল বাতি সবুজ হয়ে যাওয়ায়।

'আবছা ভাবে যা মনে পড়ছে, তাতে অসহযোগিতা পারতপক্ষে মোটেই করে না,' মৃদু হাসল রানা। 'গড়িমসি করার উপায় নেই ওদের। কেউ যদি অভিযোগ তোলে, জার্মানরা তাদের অতীত গোপন করছে, তা হলে সেটা খুব খারাপ ভাবে নেয়া হয় গোটা পশ্চিমা বিশ্বে।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল রানা, 'তারপরও সরকারী ফাইল ঘেঁটে যদি তেমন কোনও উপকার না-ও হয় আমাদের, তা হলেও পল হাইনরিখের উকিল কে ছিলেন, সেটা জানা যাবে। ভদ্রলোক যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে বলতে পারবেন মামলা চলার সময় বা পরবর্তীতে পল হাইনরিখ কী ধরনের মানসিক অবস্থায় ছিলেন। তাঁর সে-সময়ের ফাইলে মামলার বিবরণ আছে নিশ্চয়ই। ওটাও কাজে আসবে আমাদের।'

চিন্তিত স্বরে বলল লিমা, 'তা হলে উনি এটাও বলতে পারবেন, পল হাইনরিখের জীবনে হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, লিউট হ্যামিলটন গেটসবি আর জর্জ গ্রুসাক কখন এলেন।'

'যদি বেঁচে থাকেন, যদি কথা বলতে রাজি হন,' লিমাকে মনে করিয়ে দিল রানা।

'ওঁর খোঁজ না করলে তো কিছুই জানা যাচ্ছে না, কি বলো?' রহস্যময় হাসল লিমা। 'আমার মনে হয় হঠাৎ করে হাজির হলে ভাল ফল পাব আমরা।'

'কী জানো তাঁর সম্বন্ধে?' চট্ করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুধু তাঁর নাম আর ঠিকানা,' চেপে রাখল না আর লিমা, 'আর্কাইভের ফাইলে পেয়েছি। আলবার্ট হিমেলস্টোস, ঠিকানা ফারস্টেনফেল্ডব্রাক। ফারস্টেনফেল্ডব্রাক কোন্ জাহান্নামে, কে জানে!'

অ্যাসপেন থেকে রওনা হবার আগে অন্তত দেড়টা ঘণ্টা অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস ঘেঁটে অবিভক্ত নতুন জার্মানির মানচিত্র দেখে এসেছে রানা, সদ্য শেখা বিদ্যেটা কাজে লাগাল এখন। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'ওটা অ্যামপার নদীর তীরে ছোট্ট একটা শহর। মিউনিখ থেকে মাইল দশেক পশ্চিমে।'

'আগে তো বলোনি জার্মানি তুমি এত ভাল করে চেনো!' অবাক চোখে রানার দিকে তাকাল লিমা। 'ম্যাপে খুঁজতে বললেও তো মনে হয় না খুঁজে পাব আমি!'

'ওদিকটা অল্পস্বল্প চিনি,' গাম্ভীর্য আরও বেড়ে গেল রানার।

চট্ করে রানার ঠোঁটে চুমু খেল লিমা। 'তা হলে আগামীকাল রাতের ফ্লাইটে রওনা হচ্ছি আমরা, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

পরস্পরের সান্নিধ্যে সে-রাতটা চমৎকার কাটল ওদের।

তেরো

'ওরা জার্মানিতে যাচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল।

'পল হাইনরিখের অতীত জানতে, সেই সঙ্গে তার উকিলের সঙ্গে আলাপ করতে,' বলল হার্টসেল। 'লুফথানসায় রিযার্ভেশন করেছে মেয়েটা, ওপেন এন্ডেড টিকেট কেটেছে মিউনিখের। আগামীকালকের জন্যে মিউনিখ হিলটনে একটা সুইটও বুক করেছে।'

আলবার্ট হিমেলস্টোসের কথা মনে করে মৃদু হাসলেন ব্যারি ক্যাসল। পল হাইনরিখের উকিলের কাছে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। সুতোর ওদিকে গিঁঠ দেয়া হয়ে গেছে ভালমতই। 'তুমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'নিউ ইয়র্কে। মাসুদ রানার পিছু নিয়ে এসেছি। আপনি কি চান জার্মানিতেও আমরা ওর ওপর চোখ রাখি?'

'হ্যাঁ। তবে ওর সামনে পোড়ো না। নজর রাখো, দেখো কী করে। আমাকে জানাতে থাকো। খেয়াল রেখো, ওই দু'জনের মনে যেন কোনও কারণে সন্দেহ না জাগে।'

'সার,' ব্যারি ক্যাসল যেন রেগে না যান, সেজন্য কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব নরম করল হার্টসেল, 'কী নিয়ে কাজ করছি সেটা আমাকে জানালে মনে হয় ভাল হতো। সমস্যাটা জানি না বলে ওরা কী করতে যাচ্ছে, বা কী ওদের খুঁজে পাওয়া চলবে না, সেসব ব্যাপারে আগে থেকে কোনও পরিকল্পনা করতে পারছি না আমি।'

'তোমার জানা দরকার মনে করলে জানাব,' কড়া স্বরে বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'আপাতত কিছু জানার দরকার নেই তোমার। ওরা কী করছে, সেটা আমাকে জানালেই চলবে।'

'জী, সার,' বসের বলবার সুরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা ঠিকই বুঝল ব্রিম হার্টসেল। 'নতুন কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে রিপোর্ট করব আমি।'

ফোনে কথা সেরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। ভ্রূ কুঁচকে গেল তাঁর গভীর চিন্তায়। টাইমের এডিটরের উপস্থিতি তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলছে। রক্তের গন্ধ পেলে ছোঁক-ছোঁক শুরু করবে ব্লাডহাউন্ডের পাল। আগের সিদ্ধান্তই বহাল রাখলেন তিনি সাংবাদিক মেয়েটা কী ধরনের তথ্য খুঁড়ে বের করবে, সেটা বিচার করে দেখবেন তিনি, যদি তার মধ্যে শক্ত কোনও প্রমাণ থাকে তাঁদের তিনজনের বাবাব বিরুদ্ধে নষ্ট

করে ফেলবেন তা। মনে মনে হাসলেন ব্যারি ক্যাসল। বুকের খাঁচা আঁকড়ে আসবার মতো সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা এখন আর বোধ করছেন না। সমস্ত সমস্যা চিরতরে মাটিচাপা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে তাঁর। দরকার হলে মাটিচাপা দেয়া হবে লিমা সোরেনসন আর মাসুদ রানাকেও।

বাবার দেয়া বর্ণনা স্পষ্ট মনে পড়ল তাঁর। বছর পঞ্চাশেক আগে নুরেমবার্গের প্যালেস অভ জাস্টিস-এ প্রথমবারের মতো লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর বাবার।

পল হাইনরিখের ব্যক্তিগত সমস্ত কিছু কেড়ে নেয়া হয়েছিল। কমদামি একটা সুট দেয়া হয় তাকে পরতে। কয়েক সাইয বড় আর্মি ইশ্যু বুট জুতো ঢলঢল করছিল তার পায়ে। হাঁটতে গেলে দু'হাতে প্যান্টের কোমর ধরে রাখতে হচ্ছিল তাকে। দু'জন বন্দি আত্মহত্যা করবার পর জুতোর ফিতে ও কোমরের বেল্ট কেড়ে নেয়া হয়েছিল সমস্ত বন্দির কাছ থেকে।

তারপরেও, এমপিরা পল হাইনরিখের হ্যান্ডকাফ খুলে দেবার পর হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের মনে হয়েছিল, এই লোক অন্য ধাতুতে গড়া। আর যা-ই করুক, আত্মহত্যা করবে না এ। নোংরা সুট পরনে ছিল তখন পল হাইনরিখের; ফ্যাকাসে, ক্লিষ্ট মুখে ছিল না-কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কিন্তু ওই দুরবস্থার মধ্যেও, আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল তাকে। ঋজু ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, শান্ত চোখে ছিল কঠোর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মৃত্যুদণ্ড হতে পারে জেনেও সামান্যতম ভেঙে পড়েনি পল হাইনরিখ, বদলে যায়নি তার নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের উদ্ধত, বেপরোয়া ভঙ্গি।

ইন্টারোগেশনের তৃতীয় দিন দর কষাকষি করতে চায় পল হাইনরিখ। প্রথমদিকে তার প্রস্তাবটা হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলকে বিব্রত করছিল। গভীর ভাবে ভেবে দেখেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যে কী দুর্বলতা দেখেছে ওই বেয়াড়া নাৎসি অফিসার যে, ধরে নিয়েছে টাকার লোভে তিনি বিক্রি হয়ে যেতে পারেন! কয়েকরাত

চিন্তা করেছেন হ্যারি ক্যাসল, তারপর সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেরকম ভাল কোনও প্রস্তাব হলে আইনের ওপারে যেতে আপত্তি করবেন না তিনি। তার পরেও কয়েকটা সেশনে বসেছেন তিনি পল হাইনরিখের সঙ্গে। লোকটা আর আগের প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেনি। শেষপর্যন্ত অধৈর্য হয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করেছিলেন হ্যারি ক্যাসল, বলেছিলেন, প্রস্তাবটা ভাল হলে আরও যাদের সাহায্য দরকার হবে, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন তিনি। জবাবে মুচকি হেসেছিল পল হাইনরিখ, যেন তার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে, কেনা যাবে হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলকে।

এরপর হ্যারি ক্যাসল যে-চুক্তিটা করেন, যেভাবে পরিকল্পনা করেন, কোনও খুঁত রাখেননি তাতে। সে-পরিস্থিতিতে, সে-পরিবেশে পরিকল্পনাটা ছিল সত্যিই নিখুঁত। তারপরেও তাঁদের হাত ফস্কে বেরিয়ে যায় চতুর পল হাইনরিখ। লোকটা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হুমকি দিতেই আতঙ্কিত স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি চেয়েছিলেন তাকে খুন করিয়ে ফেলতে। আপনমনে মাথা নাড়লেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। কাজটা ঠিক হতো না। তাঁর বাবা তা হতে দেননি। যুক্তি দিয়ে অন্য দু'জনকে বুঝিয়েছিলেন তিনি, খুন হয়ে যেতে পারে ভেবে নিশ্চয়ই প্রতিশোধের নিশ্ছিদ্র কোনও ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে পল হাইনরিখ। তা ছাড়া, হত্যা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ভয়ঙ্কর শত্রু হিসেবে দেখা দিতে পারে লোকটা। শেষপর্যন্ত জর্জ গ্রুসাক, লিউট হ্যামিলটন গেটসবি ও তাঁর বাবা হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল সিদ্ধান্ত নেন, পল হাইনরিখের দাবি মেটানোই তাঁদের জন্য সবদিক থেকে ভাল হবে। এবং যতদিন জীবিত ছিলেন, পল হাইনরিখের দাবি মেটাতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। সমস্যাটা রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের সমাধানের জন্য।

একটা ড্রিঙ্ক মিক্স করে টেরেস পেরিয়ে বাগানে চলে এলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, বিশেষ ভাবে তৈরি মেডিটেশন বেঞ্চ-এ বসে দূরে তাকালেন। একটু পরে সিদ্ধান্তে এলেন, পরিস্থিতি

যেদিকে মোড় নিয়েছে, তাতে মিটিঙে বসা দরকার তাঁদের। ঠিক করলেন, আগামীকাল ফ্রেডারিক গ্রুসাককে ফোন করবেন তিনি।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতেই বিস্তৃত মরুভূমির দিকে চোখ ফেরালেন আবার। ডুবে যাচ্ছে রক্তলাল সূর্য, হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

ড্রাইভওয়েতে ঢুকবার মুখে পাথরের তৈরি গেটপোস্টগুলোর কাছে একটু থামলেন সিনেটর গ্রুসাক। এখান থেকে চারপাশের দৃশ্য দেখলে নিজেকে অত্যন্ত সফল একজন মানুষ মনে হয় তাঁর। মনে হয়, যে-অবস্থানে আসতে চেয়েছিলেন, সে-অবস্থানে পৌঁছে গেছেন তিনি, কম করেননি এক জীবনে। এখানে যা আছে তা তো আছেই, আমেরিকার এখানে ওখানে এরকম এস্টেট আরও কয়েকটা আছে তাঁর। তবে ওগুলোর মধ্যে এটাই সেরা।

সামনে তাকালে যতদূর দৃষ্টি যায়, চোখে পড়ে চেস্টার কাউন্টির সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢেউ-খেলানো জমি। এদিকের পুরো ষাট একর জমিই তাঁর। বেয়াল্লিশ বছর আগে তাঁর বাবা কংগ্রেসম্যান জর্জ গ্রুসাক যখন জায়গাটা কেনেন, তখন এখানে ছিল শুধু উনিশ শতকের একটা ভাঙাচোরা ফার্মহাউস, পড়ো একটা বার্ন এবং ধসে পড়া কয়েকটা আউটবিল্ডিং। খামারের রক্ষণাবেক্ষণ ও বাড়ি পরিবর্ধনের পিছনে আঠাশ লাখ ডলার খরচ করবার পর এখন আর আগের সেই খামারটাকে চেনা যায় না। এলাকার সেরা এস্টেট এখন এটা।

পুরনো আমলের স্থাপত্য-কলা একতিল না বদলে বাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন ওয়্যারিং, প্লামিং, সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং ও অন্যান্য সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। ঘোড়ার বার্নটা সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে, আগামী দুশো বছরের জন্য ওটার কাঠের খুঁটিগুলোর জায়গা নিয়েছে চকচকে স্টিল-এর বিম।

ফ্রেডারিক গ্রুসাক ভুলেই গেছেন তাঁর বাবা ও তিনি ক'লাখ

ডলার খরচ করেছেন কৃত্রিম জঙ্গল, পুকুর, টিলা ইত্যাদি তৈরি করতে। ষাট একর জমির এক বর্গ ইঞ্চি জায়গাও সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে নেই। মাটির তলা দিয়ে গেছে ওয়্যারিং, ফার্মহাউসের চিলেকোঠার ভিতরে জড় করে রাখা হয়েছে টেলিভিশন অ্যান্টেনাগুলো। ভিউইং রুমের সারি সারি স্ক্রিনে দেখা যায় পুরো এস্টেট।

খামারের সর্বশেষ সংযোজন একটা অলিম্পিক সাইয সুইমিং পুল। বাড়ির পিছনে, টিলার ওপারে ওটা। পুলটার কথা ভেবে মৃদু হাসলেন ফ্রেডারিক গ্রুসাক। তিনি ঠিক করেছেন, এ-বছর আপাতত আর কোনও নতুন সংযোজনের দরকার নেই এস্টেটে।

নিজেকে তিনি মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দেন, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়নি তাঁর। লিউট হ্যামিলটন গেটসবি, হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ও তাঁর বাবা জর্জ গ্রুসাক যে-সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, সেটাকে আরও বড় করে তুলতে হয়েছে তাঁদের এই পরবর্তী প্রজন্মকেই। স্থাবর সম্পত্তি দিয়ে ব্যবসা থেকে বোন দুটোকে সরিয়ে দেয়া ছিল তাঁদেরই সিদ্ধান্ত। খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। তারপরেও, তিন মহারথীর তিন পুত্র-সন্তান একজোট না থাকলে ধস নামতে পারত কম্পানির ব্যবসায়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা হয়তো সম্ভবই হতো না। কিন্তু পেরেছেন তাঁরা। আর পল হাইনরিখ নামের সেই পিশাচটা পথ থেকে চিরতরে সরে যাওয়ায় তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ এখন একেবারে নিষ্কণ্টক। পার্টির প্রভাবশালী গুটিকয়েক সিনেটরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখলে আগামীতে হয়তো সহজেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারবেন তিনি। ...তারপর নির্বাচনে জিতলে... না, কিছুই আর শেষপর্যন্ত তাঁর আওতার বাইরে থাকছে না।

ড্রাইভওয়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে গাড়ি ছোটালেন সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক। সবচেয়ে নিচু জায়গায় পাথরের সেতুর কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তাঁর গাড়ির গতি দাঁড়াল পঞ্চাশ মাইলেরও

বেশি। বিদ্যুদ্বেগে পুকুরের উপরের ছোট্ট সেতু পেরিয়ে গেলেন তিনি, অ্যাক্সিলারেটার দাবিয়ে ধরলেন গাড়ির মেঝের সঙ্গে। তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরেই ছুটলেন প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে।

এক কথায় বলতে গেলে সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাকের গাড়ি-চালনাকে বলতে হয়: উন্মাদনা।

বহুবার তাঁর স্ত্রী কাকুতি-মিনতি করেছেন, ফ্রেডারিক গ্রুসাক যেন সরু ড্রাইভওয়েতে গাড়ির গতিটা কম রাখেন। শোনেননি সিনেটর। খেসারতও দিতে হয়েছে তাঁকে সেজন্য। গত কয়েক বছরে স্ত্রীর শখের তিনটে পুডল, আদরের একমাত্র ছেলেটার পোষা দুটো রাজহাঁস, পাঁচটা বিড়ালের বাচ্চা চাপা দিয়েছেন তিনি। আরেকবার জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা এক কর্মচারীকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন গাড়ির গুঁতো মেরে। আঠারো ফুট উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল লোকটা। ভাগ্য ভাল ছিল, পড়েছিল সে খড়ের গাদায়।

চাপা পড়তে যাচ্ছিলেন সিনেটরের স্ত্রী জিনা গ্রুসাকের এক বান্ধবীও। এরপর চরম রেগে গিয়ে এর একটা বিহিত করতে চান জিনা গ্রুসাক। সিনেটর গ্রুসাক ইরাক দখলকারী আমেরিকান সৈন্যদের হাল-হকিকত পরিদর্শনে গেলে সে-সুযোগে পুকুরের উপরের সেতুর পর থেকে বাড়ি পর্যন্ত ড্রাইভওয়ের বিশ ফুট ব্যবধানে উঁচু স্পিড ব্রেকার তৈরি করান মহিলা। এরপর সিনেটর যখন ওয়াশিংটনে ফিরে স্ত্রীকে ফোন করে জানান সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরছেন তিনি, ড্রাইভওয়েতে কী কাজ করিয়েছেন, সেটা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি ভদ্রমহিলা।

বিকেলে অভ্যেসমত প্রচণ্ড গতিতে সেতু পেরিয়ে বাঁক নেন সিনেটর গ্রুসাক, বাড়ির দিকে ছোটেন। তারপর কী ঘটছে বুঝবার আগেই শূন্যে উঠে পড়েন তিনি গাড়ি নিয়ে। বিশফুট দূরের দ্বিতীয় স্পিড ব্রেকারে গিয়ে পড়ে গাড়িটা, আরেকটু হলেই দু'টুকরো হয়ে যেত মাঝখান থেকে। স্টিয়ারিং হুইলে মাথাটা মারাত্মক ভাবে

ঠুকে যায় সিনেটর গ্রুসাকের। এরপর চেস্টার কাউন্টির হাসপাতালে নেয়া হয় তাঁকে, চোদ্দোটা সেলাই দিতে হয়েছিল কপালে। একটা কথাও বলেননি তিনি। তিনদিন পর ড্রাইভওয়েটা আবার আগের সেই মসৃণ চেহারা ফিরে পায়।

বাড়ির সামনের কোবল পাথরের পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি থামিয়ে নামলেন সিনেটর গ্রুসাক, গাড়ি থেকে নেমে গায়ের জোরে বন্ধ করলেন দরজাটা। মিউনিসিপ্যালিটির এক কর্মকর্তার সঙ্গে লাঞ্চে গিয়েছিলেন তিনি। নতুন যোনিং ল' তাঁর অনুকূলে যাচ্ছে না মোটেই। যে হাউসিং ডেভেলপমেন্ট কম্পানিতে প্রচুর টাকা খাটিয়েছেন তিনি, আইনটা সে-কম্পানির উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

সবচেয়ে বড় পুকুরটার দিকে যে প্যাশিও, সেটাতে তাঁর এইড বিল রুবিনকে বসে থাকতে দেখলেন সিনেটর গ্রুসাক। এ সপ্তাহের ছুটির দুটো দিন গেস্ট হাউসে কাটাচ্ছে রুবিন, আগামী সপ্তাহে যে বিলটা তিনি কমিটির সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন, কাজ করছে সেটা নিয়ে।

বাড়ির মালিক উপস্থিত হয়েছেন দেখে ঝটপট উঠে দাঁড়াল বিল রুবিন, ত্রস্ত পদক্ষেপে সিনেটরকে অভ্যর্থনা জানাতে এগোল। জানতে চাইল ভদ্রতা করে, 'লাঞ্চের সময়টা ভাল কাটল নিশ্চয়ই, সিনেটর?'

'আগে এর চেয়ে ঢের ভাল কেটেছে বহুবার,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বললেন বিরক্ত সিনেটর গ্রুসাক।

'মিস্টার ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ফোন করেছিলেন আপনি যাওয়ার পর।'

'ওকে ফোন করো,' অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এসেছে জেনির শখের ইংলিশ শিপডগ, দুই পা তুলে দিয়েছে তাঁর বুকে, হাতের ঝাপ্টায় ওটাকে সরিয়ে দিলেন সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক। বিরক্তিতে মুখ কঁচকে গেল বেইয লিনেন সটে কাদা লেগে গেছে

দেখে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'হারামজাদা, নির্বোধ জানোয়ার!' ঘুরে দাঁড়িয়ে এইডকে বললেন, 'আমি সাঁতার কাটতে চললাম। এক্সটেনশন ফোনটা পুলে নিয়ে এসে প্লাগ-ইন করো তো, রুবিন!'

'মিসেস গ্রুসাক ফোন করে জানিয়েছেন, বিকেল পাঁচটায় বাড়ি ফিরবেন উনি,' পিছন থেকে নরম স্বরে বলল দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত বিল রুবিন। 'বান্ধবীদের সঙ্গে হান্ট ক্লাব-এ গেছেন উনি।'

কাদা-মাখা সুট সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাকের মেজাজ আরেক কাঠি চড়িয়ে দিয়েছে। সবসময় পরিপাটি পোশাকে থাকতে পছন্দ করেন তিনি, গর্ব বোধ করেন ওয়ার্ড্রোবে রাখা তাঁর কাস্টম টেইলরিং করা রক্ষণশীল, কিন্তু দামি পোশাকের প্রাচুর্যে। এগুলো তাঁর বহু যত্নে তৈরি রাজনৈতিক ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত দরকারী। বক্তৃতার সময়, জনারণ্যে চলাফেরার মুহূর্তগুলোয় সবসময় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিরাট এক অভিজাত পরিবারে জন্ম হয়েছে তাঁর, পেয়েছেন সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা। তবে পেটে দু'চার পেগ মদ পড়লে, বা রেগে গেলে মানুষকে প্রভাবিত করবার তোয়াক্কা করেন না কখনও তিনি, সেসময় বেরিয়ে আসে নোংরা মনের এক মুখ-খারাপ বদমাশ। সন্দেহ নেই, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিষ্ঠুর এক চরিত্রহীন লোক। তবে রাজনীতির স্বার্থে মানুষকে মুগ্ধ করতে সক্ষম এক চমৎকার বক্তাও তিনি, মিষ্টি হাসি দিয়ে প্রায় সবসময় জয় করে নেন প্রভাবিত শ্রোতার মন।

সিনেটে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। তার চেয়েও কম তাঁর বিরোধিতা করবার সাহস রাখে, এমন শত্রুর। বেশিরভাগ সিনেটর ভয় পায় তাঁর ক্ষমতাকে। জনতার বুকে তাঁর মতো দৃঢ় শিকড় গাড়তে পেরেছেন খুব কম সিনেটরই। নিজস্ব টাকার অভাব না থাকায় ফেডারাল সরকার প্রদত্ত সমস্ত দান-অনুদান ভোটারদের মধ্যে বিলি করেন তিনি আত্মসাৎ না করে, ফলে তাঁর ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত।

সিনেটর গ্রুসাক ভাল করেই জানেন, আবার নির্বাচিত হবার জন্য জনগণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তাঁকে। জনগণকে খুশি রাখবার অভ্যাসটা সচেতন ভাবে মজ্জাগত করে নিয়েছেন তিনি, ব্যাপারটাকে পরিণত করেছেন প্রায় শিল্পকলায়। প্রতি সপ্তাহে স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলোয় তাঁর উন্নয়ন-কর্মকাণ্ড প্রচারিত হচ্ছে। এ-ছাড়াও পথে-ঘাটে-পার্কে তাঁর প্রতিশ্রুতিসূচক বক্তৃতা-বিবৃতি, কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প প্রচার পাচ্ছে। এসব যদি বাদও দেয়া যায়, নানান ব্যক্তিগত উন্নয়নধর্মী প্রকল্পে যেখানেই তিনি নাক গলাতে পারছেন, সেখানেই প্রচার করছেন নিজের সদিচ্ছা। একটা মূলমন্ত্র আত্মস্থ করে নিয়েছেন সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক: যা দেবে বলে কথা দিয়েছ, জনগণকে তা দাও—অন্তত সান্ত্বনা পাবার মতো কিছু দাও।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবার মাপ-কাঠিতে যদি মাপা যায়, তা হলে সত্যিই তিনি শতকরা প্রায় একশো ভাগ সফল রাজনীতিক।

বুদ্ধিমান মানুষ, কলেজে ছিলেন সেরা ছাত্র, ল স্কুলেও সবার সেরা রেযাল্ট ছিল তাঁরই দখলে। রাজনীতিতে ঢুকবার আগেই বাবার কাছ থেকে পান দুর্নীতি-বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা। তারপর সিনেটর হবার পর থেকে নিজের জন্য লাভজনক প্রকল্পগুলো অনুমোদন করতে দ্বিধা করেননি কখনও। সিনেটের যেসব কমিটিতে তিনি আছেন, সেগুলোয় বড় কোনও কর্পোরেশন ব্যবসায়িক সুবিধা চাইলে বিরাট অঙ্কের টাকা ঘুষ নেন তিনি। সরকারী পে-রোল ফান্ড ব্যবহার করেন নিজের স্বার্থে, নির্বাচনী-প্রচারণার জন্য প্রাপ্ত অর্থ চলে যায় বিভিন্ন ব্যক্তিগত খরচের হিসাবে। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিতে তাঁর মতো দক্ষ রাজনীতিক প্রেসিডেন্ট বাদে গোটা আমেরিকায় আর একজনও নেই।

সাংবাদিকদের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তিনি,

নিজেকে উপস্থাপন করেছেন প্রচণ্ড পরিশ্রমী, সৎ, নীতির প্রশ্নে আপোষহীন এক উদারচিত্ত জননেতা হিসেবে। কাজটা সহজ ছিল না। জানতেন, সামান্য ভুলের মাশুলও গুনতে হতে পারে চরম মূল্য দিয়ে। ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টারদের চোখ এড়াতে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়েছে তাঁকে। এবং... শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন তিনি।

অবশ্য গুজব বন্ধ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি পুরোপুরি। বাজারে কথা চালু আছে, বিভিন্ন বে-আইনী চুক্তি করেছেন তিনি। তবে প্রমাণ নেই কোনও। নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে সেটা খুব ভাল করেই জানেন আইনজ্ঞ ফ্রেডারিক গ্রুসাক। তাঁর দলের সামান্য যে ক'জন সিনেটরের জানা আছে দুর্নীতিগুলো সম্বন্ধে, তাঁরা সিনেটের পুরনো নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের বৃত্তের বাইরে আলাপ করেন না ওসব বিষয়ে।

সিনেটে খুব কমই যান সিনেটর গ্রুসাক, তবে তিনি উপস্থিত হলে সেটা হয় দর্শনীয় একটা দৃশ্য। বহুল আলোচিত, বিতর্কিত বিষয়গুলোতে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন তিনি, সতর্ক নজর রাখেন, যাতে ভাল প্রেস কাভারেজ পেতে অসুবিধে না হয় তাঁর। সরলমনা এক নীতিবান, সাহসী রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন তিনি, দেখতেও তাঁকে সেরকমই লাগে। লম্বা-চওড়া মানুষ তিনি—প্রশস্ত কাঁধ, লম্বাটে মুখ ও কালো-রূপালীতে মেশানো ঢেউ-খেলানো চুল তাঁকে এনে দিয়েছে আভিজাত্য। একটু মোটাই হয়ে গেছেন, তবে সাতচল্লিশ বছর বয়সেও সাতাশ বছরের যুবকের মতো প্রাণবন্ত ভঙ্গি নেন ফ্রেডারিক গ্রুসাক, ক্ষমতা রাখেন সহজেই নারী-হৃদয় জয় করে নেবার। এবং লোকচক্ষুর আড়ালে ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে বিবেকের বিন্দুমাত্র দংশনে ভোগেন না কখনও।

ফ্ল্যাগস্টোন পাথ ধরে হাঁটবার ফাঁকে পোশাক খুলে ফেললেন সিনেটর গ্রুসাক, পুলের ধারের ড্রেসিং রুমগুলোর একটায় ঢুকে

পরে নিলেন সুইম সুট, বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নীল পানিতে। ছয়বার এদিক-ওদিক সাঁতরে থামলেন একটু বিশ্রাম নিতে। বিল রুবিনকে দেখতে পেলেন, এক্সটেনশন ফোন এনে পুল হাউসে কানেকশন দিল সে। কাজটা সেরে সিনেটরের দিকে ফিরল সে, বিনীত স্বরে বলল, 'সিনেটর, সেক্রেটারি জানাল মিস্টার ক্যাসল কনফারেন্স-এ আছেন। ফ্রি হলেই আপনাকে ফোন করার কথা তাঁকে জানাবে।'

'কনফারেন্স,' ঘড়ঘড়ে স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন সিনেটর, 'কচু! অফিসের টেবিলের ওপর ওই সেক্রেটারির সঙ্গে মৌজ মারছে ও, আর কিচ্ছু না।'

কর্তব্য পালন করতে মৃদু হাসল বিল রুবিন, সিনেটরের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে নিয়ে তারপর বলল, 'আমি এখানে আসার আগে আরেকটা কল এসেছিল, সিনেটর। কংগ্রেস-উওম্যান ডালিয়া ফোন করেছিলেন, বলেছেন, দেরি না করে যেন তাঁকে কল করেন আপনি। আমি অবশ্য বলেছি, আপনি আছেন কি না ঠিক জানি না, মোবাইলে আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ধমক দিয়েছেন আমাকে, বদমায়েশি বাদ দিয়ে যেন আপনাকে এক্ষুনি জানাই—খুব নাকি জরুরি ব্যাপার।'

লিবারালদের একদমই পছন্দ করেন না বর্তমান প্রেসিডেন্টের অন্ধ-সমর্থক ফ্রেডারিক গ্রুসাক, আর এই ডালিয়া মেয়েলোকটা তাঁর পেছনদিকের বেদনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাগের ছাপ পড়ল সিনেটরের চেহারায়। 'শালী কী চায়, সেটা জিজ্ঞেস করেছ? হোয়াইট হাউসে প্রভাব খাটিয়ে ওর ওই প্রতিবন্ধী ভক্তদের জন্যে তৈরি ওয়েলফেয়ার বিলগুলো যেন পাশ করিয়ে দিই, সেজন্যে আমার পেছনে লেগেছে শালী। রাতে কাপড় খুলে একা আসুক আমার কাছে, ভেবে দেখব।'

কাঁচুমাচু চেহারা করল বিল রুবিন। 'সিনেটর, আপনাকে বোধহয় মনে করিয়ে দেয়া দরকার, কংগ্রেসউওম্যান ডালিয়া

আভাস দিয়েছেন, বার্টান্ড ইশুতে আপনাকে সমর্থন দিতে পারেন উনি।'

তিক্ত হাসলেন সিনেটর গ্রুসাক। 'শালী একদম কাঁচা মিথ্যুক। একটা শর্তেও একমত হতে পারিনি আমরা। ও যদি পারত, তা হলে আমার পিঠে ছোরা ঢুকিয়ে মোচড়াত আর হাসত। ...ইয়ে করি আমি শালীকে!'

নির্বিকার চেহারায় সিনেটরের নোংরা কথা শুনল রুবিন, তারপর বলল, 'তা হলে উনি ফোন করলে আমি বলে দেব আপনাকে জানিয়েছি, বিষয়টা আপনি ভেবে দেখছেন।'

চোখের উপর থেকে ভেজা চুল সরালেন গ্রুসাক। 'তা-ই করো, বিল। আর, শালীকে এটাও জানিয়ে দিয়ো, আমি এতো ব্যস্ত যে আগামী কয়েকদিন তার সঙ্গে আলোচনা করার সময় পাব না।'

পরের প্রসঙ্গটা অবতারণা করতে গিয়ে দ্বিধায় ভুগল বিল রুবিন। তবে মিসেস গ্রুসাক বিকেলের আগে ফিরবেন না, কাজেই কেউ কান পেতে কথা শুনবে, সে-সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, কাজেই গলা নামিয়ে বলল সে, 'সিনেটর, আপনাকে একটা খবর জানাতে বলেছে সেক্রেটারিদের একজন। আপনার জর্জ টাউনের ম্যানশনে যে অতিথি আছেন, তিনি সেক্রেটারিকে ফোন করেছিলেন। তরুণী ভদ্রমহিলাটিকে বিচলিত মনে হয়েছে সেক্রেটারির। বোধহয় মাতাল ছিলেন। অথবা একইসঙ্গে মাতাল আর বিচলিত।'

গুঙিয়ে উঠলেন সিনেটর। 'মরুক শালী! হারামজাদিকে আমি বারবার বলেছি, অফিসে কল করলে যেন আমার প্রাইভেট ফোন ব্যবহার করে—কথাটা মাথায় ঢোকে না। সুযোগ পেলেই গাঁজা টানবে আর বাড়ির সমস্ত মদ গিলে শেষ করবে।' তরুণী প্রেমিকা মাতাল হয়ে টলতে টলতে শপিং-এ বেরিয়ে পড়ে মনে পড়তেই মুখটা কালো হয়ে গেল সিনেটর গ্রুসাকের। 'বিল, ওই শালীর

সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। এবার ওকে বিদায় করতে হয়। ঘাড় থেকে বোঝা নামাও।'

'বোঝা'টা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে বিল রুবিনের। সিনেটরের আদেশে কয়েকদিন স্বর্ণকেশী ওই তন্বী তরুণীর সঙ্গে লাঞ্চ করেছে সে। সময় দিতে হয়েছে কেট কেন্ডেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য। গত দশমাস ধরে সিনেটরের জর্জ টাউনের বিলাসবহুল ম্যানশনে বাস করছে মেয়েটা, সিনেটরের বন্ধুবান্ধবদের একান্ত সঙ্গ দিচ্ছে। প্রয়োজন পড়লেই সঙ্গ দিচ্ছে সিনেটরকেও। কেট কেন্ডেলের মতো ওরকম সেক্সি মেয়ে আগে কখনও দেখেনি বিল রুবিন, অতটা বোকা মানুষও কখনও দেখেনি। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মেয়েটাকে অফিশিয়াল সমস্ত কাজ থেকে দূরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিলেন সিনেটর। কিন্তু গত মাসে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠেছে কেট কেন্ডেল। সিনেটর গ্রুসাকের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার-এ অপূরণীয় কোনও ক্ষতি করে বসবে মেয়েটা, এটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

বিল রুবিন বলল, 'গত বুধবার যখন তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ করলাম, তখন উনি জোর দিয়ে বলছিলেন, ওই বাড়িতে আর আটকা থাকতে রাজি নন উনি।'

'আর কী চায় ও আমার কাছে?'

'আপনার অফিসে বড় কোনও পদে চাকরি।'

পানি থেকে উঠে পুলের কিনারায় ধীরেসুস্থে বসলেন সিনেটর গ্রুসাক। 'হাসতে পারলাম না, বিল। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের ওহাইয়োর সিনেটর বন্ধু নিজের অফিসে চাকরি দিয়েছিল তার রাতের সঙ্গিনীটিকে? ওই বেটি কম্পিউটার চালাতে পারত না বলে সন্দেহ গিয়ে পড়ে আমাদের বন্ধুর ওপর। তারপর নারী কেলেঙ্কারি প্রকাশ পেয়ে চিরতরে শেষ হয়ে যায় বেচারার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। বিরাট দুটো সোনালী স্তনের মোহে পড়ে ওরকম কোনও ভুল করব না আমি। আমার তো সন্দেহ হয়, কেট

কেন্ডেল পড়তেও জানে না! শালীকে চাকরিতে নিলে স্টাফদের কী ব্যাখ্যা দেব? মাথায় গু ভরা বেটির! শালীর খোঁজ পেলে কয়েকদিন পার হবার আগেই আমার হাড় থেকে মাংস খুবলে শেষ করে দেবে শকুনের দল।' লাউঞ্জ চেয়ারে রাখা তোয়ালে দিতে বিল রুবিনকে ইশারা করলেন ফ্রেডারিক গ্রুসাক। 'ওকে পথ থেকে সরাতে হবে, বিল। হাজার কয়েক ধরিয়ে দিয়ে বলে দাও নিজের রাস্তা মাপতে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন তিনি, 'লাস ভেগাসের রনি মার্টিনোকে ফোন করো। ওকে বলে দাও ওর মেয়েদের শোগুলোর কোনও একটাতে যেন কেট কেন্ডেলকে চাকরি দিয়ে দেয়।'

'ওয়াশিংটনে ফিরেই ব্যবস্থা নেব আমি, সিনেটর,' তোয়ালে এগিয়ে দিল বিল রুবিন। 'আপনি একটা ড্রিঙ্ক নেবেন, সার?'

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছেন বলে চাপা শোনাল সিনেটরের কণ্ঠস্বর: 'নেব। স্কচ। পানি ছাড়া।'

বিল রুবিন পুলহাউস থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে আসতেই বেজে উঠল টেলিফোন। যন্ত্রটা পুলের পাড়ে এনে সিনেটরের হাতের কাছে রাখল রুবিন। 'মিস্টার ক্যাসল, সিনেটর।'

'অপেক্ষা করিয়ে রাখতে হয়েছে বলে দুঃখিত, ফ্রেড,' ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের মার্জিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন সিনেটর গ্রুসাক: 'বোর্ড মিটিঙের মাঝখানে ছিলাম।'

'ডিফেন্স কন্ট্র্যাক্টটা বাগাতে পেরেছ?'

'কয়েকটা সমস্যা আছে এখনও, ওগুলো মিটলেই ওটা আমাদের,' জানালেন ব্যারি ক্যাসল। 'পেন্টাগনের কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের কম্পানির অতিরিক্ত খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, জেনারেল ওনিলও প্রয়োজনের সময় আমাদেরকে তার পুরো সমর্থন দেয়নি। লোকটাকে যখন টাকা খাওয়াতে বললে, তখনই আমি বলেছিলাম ফুটো পয়সা দাম নেই ওর। দেখা যাচ্ছে আমার

ধারণাটা ভুল নয়।'

কণ্ঠস্বর নরম করলেন সিনেটর গ্রুসাক। 'মানুষটার কাছে আমরা ঋণী। গত এগারো বছরে বড় বড় অনেকগুলো কন্ট্র্যাক্ট পাইয়ে দিয়েছে ও আমাদের।'

'সেটা অতীত, ফ্রেড। লোকটা এখন একটা ফালতু বোঝা।'

'তারপরেও, বোঝাটা ঘাড়েই রাখো,' চাপা রাগ প্রকাশ পেল সিনেটরের কণ্ঠে। 'আমাদের অফিস-ডেকোরেশন হিসেবে কাজে আসছে জেনারেল ওনিল।'

মাঝে মাঝে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের নাক-উঁচু, একনায়ক-সুলভ একরোখা ভাবভঙ্গি রাগিয়ে দেয় সিনেটর গ্রুসাককে। তবে তাঁকে স্বীকার করতেই হবে, চিতাবাঘের মতো ধূর্ত মানুষ ব্যারি ক্যাসল, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গণ্ডারের মতো একরোখা—কম্পানির স্বার্থে ঠাণ্ডা মাথায় করতে পারে যে-কোনও কিছু। সফল হতে হলে একজন বুদ্ধিমান মানুষের যা থাকা দরকার, তার সবই আছে ব্যারি ক্যাসলের মধ্যে—উদ্দেশ্য স্থির করে কাজে লেগে থাকা, আন্তরিকতা, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অপ্রভাবিত থেকে সবকিছু বিশ্লেষণ করে দেখবার ক্ষমতা, বিনা দ্বিধায় যে-কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কঠোর মানসিকতা—সব।

দৃঢ়চেতা ব্যারি ক্যাসলের ব্যবসায়িক বুদ্ধি, কাপুরুষ স্যামুয়েল গেটসবির সাবধানী আইনী পরামর্শ ও তাঁর নিজের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁদের কম্পানিটাকে পরিণত করেছে দেশের অন্যতম বড় ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স কন্ট্র্যাক্টিং ফার্ম-এ। স্পর্শকাতর টপ সিক্রেট স্পাই স্যাটালাইট ও মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে কাজ করবার সুযোগ তাঁদেরকে এনে দিয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। না, ব্যারি ক্যাসল ভয়ানক চতুর, সুযোগসন্ধানী, সাহসী এক শক্তমনের মানুষ—এক কথায়, বিজয় এনে দেবার মতো সুযোগ্য একজন নেতা। আর সে-কারণেই, পল হাইনরিখের ব্যাপারে ব্যারি ক্যাসলের অতিরিক্ত সতর্কতা অস্বস্তিতে ফেলে

দিয়েছে সিনেটর গ্রুসাককে। নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের মৃত্যুতে খুশি হয়ে উঠতে চাইলেও মনের মাঝে আনন্দের বুদ্বুদ অনুভব করছেন না তিনি।

'কীজন্যে ফোন করেছিলে, ব্যারি?' এবার প্রসঙ্গ পাল্টালেন সিনেটর।

'পল হাইনরিখের ব্যাপারে আরও এগিয়েছে ঘটনা,' জানালেন ব্যারি কুক। 'মনে হচ্ছে মিটিঙে বসে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার আমাদের সবার। শেষ যখন তোমার সঙ্গে কথা বলি, তার পরে পরিস্থিতির বেশ অবনতি হয়েছে। মারাত্মক কিছু নয় যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে সব, তবে প্রতিপক্ষ আমাদের গন্ধ পেয়ে ছোঁক-ছোঁক শুরু করেছে।'

'বলো কী!' আঁৎকে উঠলেন ফ্রেডারিক গ্রুসাক। সামলে নিলেন দ্রুত। 'কোথায় মিটিঙে বসতে চাও?'

'পেনসিলভেনিয়ায়, তোমার ওখানে হলেই সবদিক দিয়ে ভাল।'

গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি এক ঢোকে গিলে নিলেন সিনেটর, গ্লাসে আবার হুইস্কি দিতে ইশারা করলেন বিল রুবিনকে। 'আগামীকাল এমন কোনও কাজ নেই যেটা আমি ক্যান্সেল করতে পারব না।'

'তা হলে আগামীকাল,' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের। 'স্যামকে আমিই ফোন করব। আসার সময় সিনসিনাটি থেকে নিয়ে আসব ওকে।'

'কতটা জানিয়েছ ওকে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর গ্রুসাক। জাজকে ছোটবেলা থেকে চেনেন তিনি। অসম্ভব ভিতু আর নার্ভাস লোক স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি, ঠিক যেন বিপদের আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপা কোনও খরগোশ। তাঁদের শক্ত বর্মে জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি খুব দুর্বল একটা অংশ। চাপে পড়লে শুকনো কাঠির মতো মট করে ভেঙে যাবে গোবেচারা

কিসিমের লোকটা, তারপরও বাধ্য হয়েই দুর্বলচিত্তের জাজকে ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে রাখতে হয়েছে।

'শুধু বলেছি, অতীত ঘাঁটাঘাঁটি করছে কেউ কেউ,' সিনেটরের প্রশ্নের জবাবে জানলেন ব্যারি ক্যাসল। 'বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাইনি। স্যামকে তো চেনো, বোকাটা ভয় পেয়ে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কেঁদে পড়ে অতীতের সমস্ত ঘটনা বলে দিলেও অবাক হবার কিছু নেই। ওকে সামলাতেই একসঙ্গে বসতে হবে আসলে আমাদের।'

'তোমার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে ও?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'ঠিক বুঝতে পারিনি। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। মনে হয় ঘুম হারাম হয়ে গেছে ওর।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন ব্যারি ক্যাসল: 'ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টে নামতে চাই না, প্রাইভেট প্লেনের জন্যে ওদের সার্ভিস খুবই খারাপ। নিউ গার্ডেন, এভনডেল-এর এয়ারপোর্টের রানওয়েটা চার হাজার ফুট লম্বা। লিয়ার জেট-এর জন্যে নামা কঠিনই, তবু এভনডেলেই নামছি।'

'আমার এস্টেট থেকে এভনডেল এয়ারপোর্টে দশ মিনিটে পৌঁছতে পারি আমি ঠিকমত ড্রাইভ করলে,' বললেন গ্রুসাক। 'সিনসিনাটি থেকে রওনা হয়ে ফোন কোরো, এয়ারপোর্টে আমি নিজে রিসিভ করব তোমাদের।'

'তোমাদের সময় ঠিক ন'টায় রওনা হবো আমি,' জানালেন ব্যারি কুক, 'যদি পিছন থেকে একটানা হাওয়া পাই, আর সিনসিনাটিতে বেশিক্ষণ থামতে না হয়, তা হলে দুপুর একটা বা দেড়টার মধ্যে পৌঁছে যাব তোমার ওখানে। যদি দেরি হয়, জানিয়ে দেব কল করে।' বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিলেন তিনি।

রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে বিল রুবিনের দিকে তাকালেন সিনেটর গ্রুসাক। 'আগামীকাল আমার কয়েকজন অতিথি আসবে, বিল। আমি চাই না সে-সময় তমি এখানে থাকো।'

'নিশ্চয়ই, সিনেটর,' সামান্য ঝুঁকল বিল রুবিন। 'ব্র্যান্ডওয়াইন মিউযিয়ামের নতুন এক্সিবিটগুলো দেখতে যাব ভাবছিলাম কয়েকদিন ধরে, কালকে তা হলে ঘুরেই আসি ওখান থেকে।'

কিচেনে ঢুকবার আগে জুতোর তলা থেকে সাবধানে কাদা পরিষ্কার করলেন জাজ গেটসবি, খুব ক্লান্তি বোধ করছেন। পিঠ ব্যথা করছে তাঁর সারাটা বিকেল শখের সব্জি বাগানে উবু হয়ে কাজ করে। তবে সময়টা ভাল কেটেছে। অবসরের বেশিরভাগ সময় সব্জি বাগানেই কাটান তিনি। সেজন্য অবশ্য স্ত্রীর প্রচুর টিটকারি হজম করতে হয় তাঁকে। মিসেস গেটসবির ধারণা, গাছপালার পিছনে খাটুনি দেয়া একেবারেই অর্থহীন।

গত দশ বছর মিস্টার গেটসবি ও তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে ক্রমেই অবনতি ঘটেছে। অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন আর সম্পর্কটা জোড়া দেয়া সম্ভব নয়। বাগান হয়ে উঠেছে জাস্টিসের আশ্রয়। শার্লির সার্বক্ষণিক ঘ্যান-ঘ্যান থেকে বাঁচবার জন্য বাগানে সময় কাটান তিনি।

অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন যে-কেউ দু'জনের এই সম্পর্কের শুরুতেই বলে দিতে পারত, এ-বিয়ের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ভাবুক স্বভাবের চুপচাপ মানুষ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি, শার্লি গেটসবির তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তিতে অনেক উন্নত।

শার্লি গেটসবি স্বার্থপর এক উড়নচণ্ডি স্বভাবের মহিলা, এখানে ওখানে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ানো আর কান্ট্রি ক্লাবে গিয়ে টাকা উড়ানো যাঁর কাছে জীবনের সত্যিকার অর্থ। বিয়ের আগে যে প্লেবয়ের সঙ্গে প্রেম করতেন, তার সঙ্গে এখনও প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে তাঁর। জাজের কিনে দেয়া দামি গাড়িতে করে তাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যেতে পছন্দ করেন তিনি, তরুণীর মতো মেতে ওঠেন অবৈধ প্রেমে। সেই প্লেবয়ের তুলনায় জাজ গেটসবিকে তাঁর মনে হয় মিনমিনে স্বভাবের কাপুরুষ এক

অনাকর্ষণীয় লোক। এমন একজন মানুষ, যাকে তিনি দয়া করে বিয়ে করেছেন। গেটসবির প্রতি তাঁর একমাত্র আকর্ষণের কারণ, টাকা আছে তাঁর।

দু'জন তাঁরা দু'মেরুর বাসিন্দা। বেশ কয়েকবার ডিভোর্স নিয়ে আলাপও করেছেন তাঁরা, ডিভোর্সের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজেদের একান্ত নিজস্ব কারণে। মেয়ে দুটোর কথা ভেবে তালাকের বিরোধিতা করেছেন জাজ। শার্লি গেটসবি ডিভোর্স চাননি, কারণ স্টেট সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিসের স্ত্রী পরিচয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ানোটা তাঁর কাছে সত্যিই উপভোগ্য।

বিয়ের পর এমন একটা গোটা দিনের কথা মনে পড়ে না জাজের, যেদিন তাঁরা সুখে কাটিয়েছেন। সুখী একটা পরিবার গড়বার জন্য সবই করেছেন তিনি। এই সেদিন শার্লির আবদার রাখতে কিনে দিয়েছেন লিমিটেড প্রোডাকশন মার্সিডিয 16.9। একশো ষাট মাইল বেগে ঘুরেও যদি শান্তি পায় শার্লি, যদি একটু স্বস্তিতে থাকতে দেয় তাঁকে। নিজে জাজ ব্যবহার করেন উনিশশো ছিয়ানব্বুইয়ের একটা বুইক সেডান। এ নিয়ে স্ত্রীর কাছে কটু কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে অনেক।

এই বিয়েতে ভাল দুটো ঘটনা শুধু ঘটেছে। তারা জাজের দুই মেয়ে—এলিজাবেথ ও এমা। মিষ্টি দুই কিশোরী দেখতে হয়েছে মায়ের মতো রূপসী, তবে হাজারবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন জাজ, ওদের মন-মানসিকতা হয়েছে তাঁর মতো।

কিচেনে ঢুকে জাজ দেখলেন, কান্ট্রি ক্লাব থেকে টেনিস খেলে এসে মাত্র পোশাক বদলে কিচেনে বসেছেন শার্লি গেটসবি, হাতে দইয়ের কাপ।

'স্যাম!' বিরক্তির সঙ্গে স্বামীকে দেখে নিয়ে তিক্ত স্বরে বললেন শার্লি, 'তোমাকে একেবারে ফকিরের মতো দেখাচ্ছে। ডিনার গেস্টরা আসার আগেই পোশাক বদলে নিতে ভলো না।

এই পোশাকে তোমাকে কেউ দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার।'

'কারা আসছেন?' ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জাজ। বলবেন না বলবেন না করেও বলেই ফেললেন, 'প্রতিদিন ডিনার পার্টি না দিলে হয় না? গত দু' সপ্তাহে একটা সন্ধ্যাও একা একটু স্বস্তিতে বসতে পারিনি।'

'বিশ্রী সব বইয়ে নাক গুঁজে থাকার চেয়ে মানুষের সঙ্গে গল্প করলে সেটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্যেই ভাল,' ঝাঁজের সঙ্গে বললেন শার্লি।

'তুমি তো দেখছি ডাক্তার হয়ে গেছ!' নরম ভাবে বললেও জাজের কণ্ঠস্বরে টিটকারির ভাব চাপা থাকল না।

স্বামীর কথাটা শুনেও না শুনবার ভান করলেন শার্লি। 'লী ফ্যারো আর তাঁর স্ত্রী ডিনারে আসছেন। লী ফ্যারো জন ম্যালোরির ফার্ম-এর নতুন অ্যাটর্নি। ক্লাবে ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। চমৎকার মহিলা। তাঁর স্বামী তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ দেখিয়েছেন।'

জন ম্যালোরির ল ফার্মটা ভাল করেই চেনেন জাজ গেটসবি। অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে ছুটে বেড়ানো একদল উকিলের ফার্ম ওটা। আহত মানুষকে পটিয়ে ক্ষতিপূরণের মামলা নেয়। উকিল সমাজে যাদের দুর্নাম সবচেয়ে বেশি, তারাই ওই ফার্মে কাজ করে। দীর্ঘশ্বাস চাপলেন জাজ গেটসবি। মন খুলে আলাপ করা যায় এমন কাউকে শার্লি নিমন্ত্রণ করবে; সেটা আশা করা যায় না। শার্লি যাদের সঙ্গে মেশে, আলাপ সম্বন্ধে তাদের ধারণা হচ্ছে: আরেকজনের চেয়ে গলার আওয়াজ চড়িয়ে কথা বলতে হবে।

এক গ্লাস কমলালেবুর রস ঢেলে নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ালেন জাজ গেটসবি।

'আরেকটা কথা, স্যাম,' পিছন থেকে বললেন শার্লি, 'দয়া করে ডিনারে তোমার সব্জি বাগান নিয়ে কথা বলতে শুরু কোরো

না আবার। তুমি জানো না, তবে তোমার গাজর আর শসা দিনে কয় মিলিমিটার বাড়ে, সেটা জানার আগ্রহ নেই কারও।'

তিক্ত হাসলেন জাজ, দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরালেন। 'শেষ মুহূর্তের আর কোনও নির্দেশ, শার্লি?'

'একটা,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন মিসেস গেটসবি, 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও; হতচ্ছাড়া নপুংসক কাকতাড়ুয়া!'

এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না জাজ, বেরিয়ে গেলেন কিচেন থেকে। উপরে গিয়ে পোশাক পাল্টালেন, স্পোর্টস কোট গায়ে চাপিয়ে টাই সিধে করে আবার নেমে এলেন নীচে, চলে এলেন লাইব্রেরিতে—ডিনার গেস্টরা আসবার আগে কিছুক্ষণ পড়াশোনা করতে চান। ডব্লিউ. এইচ, অওডেন-এর একটা কবিতার ভলিউম নিয়ে বসে পড়লেন জানালার ধারে, পছন্দের আর্মচেয়ারে। প্রথম কবিতাটা পড়ে শেষ করবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোন।

'আগামীকাল পেনসিলভেনিয়ায় সিনেটরের ওখানে মিটিঙে বসব আমরা সবাই,' কোনও ভূমিকায় না গিয়ে জাজকে জানালেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। 'গত সপ্তাহে তোমাকে যা বলেছিলাম ওই ব্যাপারে আলাপ আছে।'

'কী ঘটেছে?' গলা কেঁপে গেল জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবির।

'ফোনে আলাপ করব না,' শীতল স্বরে বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েনি, কাজেই অত নার্ভাস হবার কিছু নেই তোমার। কালকে বারোটার দিকে লাঙ্কেন এয়ারপোর্ট থেকে তোমাকে তুলে নেব। লাল-সাদা রঙের একটা লিয়ার জেট-এ থাকব আমি। ওটার আইডেন্টিফিকেশন নম্বরের শেষ তিনটে সংখ্যা হচ্ছে ০৯৭। এয়ারপোর্টে ঠিক সময় হাজির থেকো, স্যাম।'

আর একটা কথাও না বলে লাইন কেটে দিয়েছেন ব্যারি

উইলহ্যাম ক্যাসল। রিসিভারের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন জাজ গেটসবি, দুর্বল বোধ করছেন। মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে হঠাৎ করেই। বিড়বিড় করে বললেন, 'এবার সব শেষ হয়ে যাবে!'

দরজায় টোকার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি, আস্তে করে দরজা খুলে লাইব্রেরিতে ঢুকল তাঁর মেয়ে এলিজাবেথ। নিঃশব্দ পায়ে বাবার কাছে চলে এলো মেয়েটা, চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি। ইতস্তত করে বলল, 'আম্মুর মেজাজ দেখে বুঝলাম... তোমরা আবার ঝগ... ইয়ে... তোমাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে।'

আর্মচেয়ারের হাতলে আলতো চাপড় মারলেন জাজ, মেয়েকে ওখানে বসতে ইশারা করলেন। এলিজাবেথ বসতেই ওকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরলেন এক হাতে, নরম সুরে বললেন, 'অবস্থা এর চেয়ে আর কখনোই ভাল হবে না, মা।'

'জানি, আব্বু,' বাবার গালে চুমু দিল মেয়ে। 'বুঝি, তোমার আসলে কিছুই করার নেই।'

'দেরি হয়ে গেছে অনেক,' দীর্ঘশ্বাস চাপলেন জাজ, প্রসঙ্গ পাল্টে মেয়ের প্রিয় ঘোড়াটার কথা তুললেন, 'আজকে তোমার বিগ জিম কেমন দৌড়াল, মা?'

'দারুণ!' গর্বের সঙ্গে বলল তরুণী এলিজাবেথ। 'লুইভিলের শো-তে পুরস্কার পেয়ে যেতে পারি।'

'এমার কী অবস্থা?'

'খারাপ নয়,' খানিকটা দমে যাওয়া স্বরে বলল এলিজাবেথ, 'তবে আরও ভাল করতে হবে ওকে। থান্ডারের পায়ের সমস্যাটা এখনও দূর হয়নি। এমা ভাবছে লুইভিলের প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে ইন্ডিয়ানাপোলিসের জন্যে তৈরি করবে থান্ডারকে।'

তাঁর মেয়ে দুটো পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ, জানেন জাজ। ছোটবেলাতেও কখনও কোনও রেষারেষি দেখেননি তিনি ওদের মধ্যে। সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'এমা বাড়ি ফিরলেই ওর সঙ্গে কথা

বলব। থান্ডারকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা কমবয়সী ঘোড়া নিতে পারে ও।'

'খুব ভাল হয় তা হলে, আব্বু,' খুশিতে ঝলমল করে উঠল এলিজাবেথের মিষ্টি চেহারা। 'আহত থান্ডারকে দৌড় করাচ্ছে বলে মন ছোট হয়ে আছে ওর।'

আবার প্রসঙ্গ বদলালেন জাজ। 'কলেজে তোমাদের দু'জনের কেমন কাটছে, মা?'

'খুব ভাল। বিশেষ করে এমা সঙ্গে থাকায় মনেই হয় না আমি বাড়িতে নেই। তা ছাড়া প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তো বাড়ি এসে ঘোড়দৌড় করতে পারছি।'

মেয়ের চোখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জাজ গেটসবি, হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আবেগ জড়িত স্বরে বললেন, 'মা, তোমাকে আর এমাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সবসময় তোমরা মনে রেখো কথাটা—যা-ই ঘটুক না কেন।'

বিচলিত বোধ করল এলিজাবেথ, বাবার কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আচ্ছা, আব্বু।'

লাইব্রেরির দরজায় এসে দাঁড়ালেন শার্লি গেটসবি, ওখান থেকে বললেন, 'ফ্যারো দম্পতি পৌঁছে গেছেন।' কথাটা শেষ করে চলে গেলেন দরজাটা খোলা রেখে।

'আম্মু বোধহয় খুব রেগে আছে,' বলল এলিজাবেথ। 'সবচেয়ে উঁচু হিলের স্যান্ডেল পরেছে দেখলাম!'

মৃদু হাসলেন জাজ গেটসবি। পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি লম্বা তিনি। শার্লি পাঁচ ফিট সাড়ে আট। স্বামীকে যেন খাটো না দেখায় সেজন্য সাধারণত ফ্ল্যাট হিলের স্যান্ডেল পরেন তিনি, তবে রেগে গেলে অপদস্থ করতে ব্যবহার করেন হাইহিল।

'ওয়েলশ্‌দের ওপর অভিশাপ আছে,' মেয়েকে চোখ টিপলেন জাজ। 'সেন্ট ডেভিস-এর মিছিল দেখেছ কখনও? চার মাইল লম্বা, পাঁচ ফুট উঁচু।'

'তারপরও, তোমাকেই আমরা বেশি ভালবাসি, আব্বু,' মিষ্টি করে হাসল এলিজাবেথ।

মেয়েকে হাসতে দেখে হাসলেন জাজ নিজেও, 'পার্টি জমিয়ে তুলবে নিশ্চয়ই তুমি তোমার হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক দিয়ে?'

'হয়তো তার প্রয়োজন পড়বে না, আলাপ জমে যাবে,' বলল লিজা।

'এসো, ছোট অঙ্কের একটা বাজি ধরে ফেলি?'

বিনা দ্বিধায় মাথা নাড়ল মেয়ে। 'অসম্ভব!'

এক হাতে এলিজাবেথের কাঁধ জড়িয়ে ধরে লিভিংরুমে চলে এলেন জাজ স্যামুয়েল গেটসবি। ইতিমধ্যেই অতিথিদের ড্রিঙ্ক দিচ্ছেন শার্লি গেটসবি।

লিভিংরুমে ঢুকবার আগে বাবার কানে ফিসফিস করল এলিজাবেথ, 'আব্বু, ওদের খুলে বোলো তোমার টমেটো কীরকম দারুণ ফলছে। তাড়াতাড়ি ভাগুক জান নিয়ে।'

হো-হো করে হেসে ফেললেন জাজ গেটসবি। ওরকম আন্তরিক হাসি শুধু তাঁর মেয়ে দুটোর কথাতেই হাসতে পারেন তিনি। রাগী চোখে তাঁর দিকে তাকালেন শার্লি গেটসবি।

চোদ্দো

হাত তুলে মিউনিখ-এর অলিম্পিক পার্ক দেখাল ট্যাক্সি ড্রাইভার, বামপাশের ঘাসে ছাওয়া বিরাট ঢিবিটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করল চলনসই ইংরেজিতে।

অ্যালাইড ফোর্সের বম্বিঙের ফলে গোটা মিউনিখ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে এখানে নিয়ে এসে জড় করা হয় বিধ্বস্ত শহরের সমস্ত ইঁট-বালি-সিমেন্ট, তৈরি করা হয় ওই ঢিবি। তারপর ঢিবিটা ঢেকে দেয়া হয় উর্বর মাটি দিয়ে, ছড়িয়ে দেয়া হয় ঘাস ও ফুলের বীজ। মিউনিখের মৃত নাগরিকদের স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি করা হয়েছে এই ওয়ার মেমোরিয়াল।

শহরটা দেখে রানার একটা কথাই মনে হলো, বদলে গেছে মিউনিখ। নতুন জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছাপ চারপাশে। গড়ে উঠেছে বড় বড় দালান।

মিউনিখ হিলটন কংক্রিটের হাইরাইয বিল্ডিং, ইসার নদীর তীরে ইংলিশ গার্ডেনের কাছে একটা বেঢপ, বেমানান আকৃতি।

হোটেলের টপ ফ্লোরে সুইট নিয়েছে লিমা। লিভিংরুম, কিচেনেট ও বার আছে সুইটে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দেখা যায় চারপাশের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য।

ঝটপট আনপ্যাক করে লিভিংরুম-ব্যালকনিতে এসে লিমার পাশে দাঁড়াল রানা। ওরা ঠিক করেছে, আজকের দিনটা শুধু বিশ্রাম নেবে। জেট ল্যাগ দূর করা দরকার। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে কাল সকাল থেকে শুরু করবে কাজ।

ওদের নীচে মিউনিখ শহরটা ছড়িয়ে গেছে চারপাশে। দক্ষিণ দিগন্তে দেখা যায় সুদূর বাভ্যারিয়ান আল্পস্-এর তুষার-ধবল চূড়া। হোটেলের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নীলচে ইসার নদী, একটু পরেই ঝাঁপ দেবে সামান্য দূরে ছোট্ট একটা জলপ্রপাত হয়ে। ডানদিকে তাকালে ইংলিশ গার্ডেনের আকাশ-ছোঁয়া সবুজ অরণ্য। হোটেলের প্রাঙ্গণ ছুঁয়েছে ওই বিশাল বাগিচার সীমানা। এতটা উচ্চতা থেকে না তাকালে প্রকৃতিকে এভাবে দেখা যেত না, হোটেলের স্থপতি নীরস দানব তৈরি করেছেন, সে-দোষটা ক্ষমা করে দেয়া যায় বিনা দ্বিধায়।

বিরাট টাব-এ একসঙ্গে স্টিমবাথ সেরে দেড় ঘণ্টা কাটাল

ওরা হোটেল-লবির শপিং আর্কেড-এ ঘুরে। সঙ্গে আনতে ভুলে যাওয়া টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনল লিমা। কনসিয়ার্জ-এর ডেস্কে একটু থামল রানা, পরদিন সকালের জন্য ভাড়া করল একটা অওডি সেডান। লাঞ্চ শেষে সুইটে ফিরে বিকেল পর্যন্ত টানা ঘুম দিল দু'জন, তারপর হাঁটতে বের হলো বিকেলের নরম রোদে।

ইংলিশ গার্ডেন একদম কাছে, ওখানে চলে গেল ওরা। বনের মাঝ দিয়ে গেছে সরু ফুটপাথ, নির্জন। জঙ্গলের নিজস্ব আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। বিকেলের শীতল হাওয়ায় গাছগাছালির বিচিত্র বুনো গন্ধ। পাশাপাশি কিছুক্ষণ হাঁটল ওরা। তারপর হঠাৎ থমকে গিয়ে লিমার দিকে তাকাল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'বাজনা শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল লিমা, তারপর বলল, 'পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন কোনও মার্চিং ব্যান্ড।'

আরও খানিক হাঁটবার পর বিভিন্ন দিকে চলে গেল ফুটপাথ। বাজনা যেদিক থেকে আসছে মনে হলো, সেদিকে এগোল ওরা। কিছুক্ষণ পর মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল দু'জন—হাসি-গানে মেতে আছে অনেক লোক।

আরও দু'মিনিট পর আওয়াজের উৎসে পৌঁছে গেল ওরা। পার্কের মাঝখানে রয়েছে একটা বিয়ার গার্ডেন, ওখানে জড় হয়েছে উৎসবমুখর জনতা। তাদের সবাই জার্মান নয়, টুরিস্টও আছে কিছু। গাছপালার মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা হয়েছে টেবিল ও বেঞ্চি। খোলা জায়গাটার মাঝখানে প্যাগোডা আকৃতির একটা দালান। দালানের চারদিকটা খোলা। দু'দিকে রয়েছে বড় একটা বার ও ফুড-কাউন্টার। আরেকদিকে বাজনার সঙ্গে বাভ্যারিয়ার লোক-সঙ্গীত ও মদ্যপানের প্রচলিত গীতি গাইছে জার্মান একটা ব্যান্ড। উৎসবমুখর পরিবেশে হৈ-চৈ, গল্পগুজব করছে সবাই।

মৃদু হেসে রানার কনুইয়ের ভাঁজে ডানহাতটা গুঁজে ভিড়ের দিকে ওকে টেনে নিয়ে চলল লিমা। মানুষের যেন ঢল নেমেছে।

মহা-আনন্দে নাচছে-গাইছে, আড্ডা মারছে তারা। নতুন গানটা ধরবার আগে হাত তুলে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল ব্যান্ডের নেতা। বাজনা শুরু হতেই গানটা চিনে ফেলল বেশিরভাগ শ্রোতা। টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিতে লাগল তারা, গাইতে শুরু করল গায়কের সঙ্গে। টেবিল নড়তেই গ্লাস উপচে টেবিলের উপর ছলকে পড়ল বিয়ার।

লিমাকে অবলীলায় গানটা হুবহু গাইতে শুনে অবাক হয়ে গেল রানা। গান শেষে জনতার হুল্লোড় কমলে ভ্রূ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও, 'তুমি জার্মান জানো, জানতাম না তো!'

'জানি না,' হাসল লিমা, রানার বিস্ময়টা উপভোগ করছে। 'কলেজের এক জার্মান এক্সচেঞ্জ ছাত্রীর কাছ থেকে শিখেছিলাম এক বিকেলে। ওর রুমে বিয়ার খাচ্ছিলাম আমরা, গানটা তখনই শেখায় ও আমাদের। বলেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক বহুল প্রচলিত গান এটা। তবে গানের মানেটা সেই জার্মান ছাত্রী অনুবাদ করে বলেনি আমাদের।'

এক মুহূর্ত ভেবে গানের শব্দগুলো সাজিয়ে বলে গেল রানা:

তুমি আছো, প্রিয়া, অন্তর জুড়ে ভালবাসা সুরে সুরে
এ-হৃদয় ভেঙে যদি কোনদিন চলে যাও বহু দূরে;
হয়ে সে রিক্ত, ব্যথায় সিক্ত, কেঁদে যাবে দিবানিশি
তবু চিরদিন বলে যাবে, প্রিয়া, তোমাকেই ভালবাসি ॥

'মানে না জানলেই বোধহয় ভাল লাগত,' বলল লিমা ভ্রূ কুঁচকে। 'কেউ কাউকে সত্যি সত্যি ভালবেসে আঘাত পেলে সেটা নিশ্চয়ই খুব কষ্টকর।' চট্ করে রানার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভিড়ের দিকে তাকাল ও। ওর মনে হলো, টুরিস্ট খুব কমই আছে, বেশিরভাগই এরা স্থানীয় জার্মান। সিযন শেষ হয়ে যাওয়ায় বাড়ির পথ ধরেছে টুরিস্টরা।

লিমার কথায় পার্টিতে যোগ দিল অনিচ্ছুক রানা। জাগ-ভরা ফেনা-ওঠা বিয়ার কিনে লিমাকে নিয়ে এগোল ও। ডায়েটিং-এর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দুটো পেটমোটা প্রেটজেল কিনল লিমা। ভিড় থেকে খানিক দূরে, একটু আগে খালি হওয়া একটা টেবিলে, গাছের নীচে বসল ওরা দু'জন।

পাশের টেবিলের হাস্যরত তরুণ জার্মান দম্পতি মনোযোগ কেড়ে নিল আনমনা লিমার। অজান্তেই বারবার রানার দিকে আড়চোখে তাকাল ও। ভাবল: রানা আর আমাকে কি ওরকম মানাবে?

কিছুক্ষণ পর মনোযোগ সরিয়ে নিল লিমা অন্যদিকে। এক জার্মান যুবকের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করল, ওই যুবকের বয়সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখও নিশ্চয়ই দেখতে অনেকটা ওরকমই ছিলেন। এরকম কোনও বিয়ার গার্ডেনে হয়তো কখনও এসেছেন তিনি। হয়তো এখানেও এসেছেন, গেয়েছেন ওই একই গান। চিন্তার মোড় ঘুরে গেল লিমার, এই জার্মান যুবকের সঙ্গে সে-সময়ের সেই পল হাইনরিখের চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য কতটুকু?

ব্যান্ডের গানের তালে তালে রানাকে টেবিলে তাল ঠুকতে দেখে মৃদু হাসল লিমা, রানা পরিবেশটা উপভোগ করছে ভাবতেই ভাল লাগল ওর নিজেরও। আবার ও মনোযোগ দিল জার্মান যুবকের দিকে। ভাবল, ঠিক কী আছে এদের মধ্যে, যে-কারণে জার্মানদের অত্যন্ত সন্দেহ আর অপছন্দ করে ও? ...ঔদ্ধত্য? ...আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গি?

সম্ভবত তা-ই। জার্মানদের চরিত্র যদি দু'কথায় প্রকাশ করতে বলা হয়, বলতে হবে, জার্মান জাতি উদ্ধত, আক্রমণাত্মক। এতটাই যে, অন্যের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতেও দ্বিধা করে না তারা।

নিজের ভাবনায় বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল লিমা আপনমনে। কলেজে জার্মান জাতির ইতিহাস পড়েছে ও, পড়তে হয়েছে বেশ

কিছু বই। ওগুলোতে লেখা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা কী ধরনের নৃশংসতা করেছে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোয় যা ঘটেছিল, শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু পল হাইনরিখের ট্রায়াল পড়ে এখন ও জানে, একটা বর্ণ মিথ্যে নেই ওসব ভয়ঙ্কর বর্ণনায়। দেশ-প্রেমের নামে নাৎসি সমর্থকরা যে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, সেটাকে কোনও বিবেকবান মানুষের কাজ তো বলা যায়-ই না, যে-কোনও পশুকেও ভয়ানক ছোট করা হবে নাৎসি বলে অপবাদ দিলে।

সত্যটা জানবার পর থেকে জার্মানদের প্রতি একটা বিদ্বেষ অনুভব করছে লিমা। তবে এটাও বুঝতে পারছে, একটা জাতির বেশিরভাগ লোক কোনও একসময় ক্ষমতার লোভে উন্মাদ-পিশাচ হয়ে উঠেছিল বলেই তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে অকারণে দায়ী করা উচিত নয়। কাঁধে রানার হাতের আলতো স্পর্শে বাস্তবে ফিরল লিমা।

'কী ভাবছ? মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনও গ্রহে চলে গেছ?'

'গিয়েছিলাম,' রানার দিকে চেয়ে হাসল লিমা। 'এইমাত্র ফিরে এলাম।'

'...কী ভাবছিলে?'

'ভাবছিলাম, জার্মানরা কী ভয়ানক নিষ্ঠুর সব কাজ করেছে অবলীলায়।'

'ওই একই কাজ তো করছে আমেরিকানরাও, বিবাদমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে,' লিমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রানা।

'করছে,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিল লিমা। 'যা করছে, সেটা সহ্য করা যায় না, তবে এখনও এই জার্মানদের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেনি বোধহয়।'

তর্কে না গিয়ে লিমার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'এসো, পেট ভরে বিয়ার গিলে টলতে টলতে হোটেলে ফিরে যাই। জার্মানরা বুঝুক, অন্য দেশের মানুষও মাতাল হতে জানে।'

হেসে ফেলল লিমা। 'একবারও তোমাকে মাতাল হতে দেখিনি আমি!'

'দেখলে বুঝবে, না দেখাই ভাল ছিল,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'তবে গলা পর্যন্ত বিয়ার গিলতে হলে আরেক জাগ আনতে হবে আমাদের। ...দাঁড়াও, আনছি।' কথা শেষে একপা এগিয়েই জমে গেল রানা জায়গায়।

'কী হলো, রানা?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল লিমা। '...মাতাল হয়ে গেছ?'

জাগটা লিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রানা শুধু বলল, 'এটা রাখো। আমি না ফেরা পর্যন্ত নড়বে না এখান থেকে।' ওর কণ্ঠস্বরে নির্দেশের সুরটা স্পষ্ট।

চমকে রানার দিকে তাকাল লিমা, কঠোর, নিষ্ঠুর চেহারাটা বুকে কাঁপন ধরাল ওর। মানুষটা যেন একটু আগের সেই হাসি-খুশি মাসুদ রানা নেই।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে প্যাগোডার দিকে রানাকে হেঁটে যেতে দেখল লিমা, অবাক হলো রানার সাবলীল, দ্রুত, আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ দেখে—ঠিক যেন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে কোনও চিতাবাঘ। উঠে দাঁড়াল লিমা রানা কোথায় যাচ্ছে দেখবার জন্য, তবে একটু পরেই হারিয়ে ফেলল ওকে দোদুল্যমান ভিড়ের মধ্যে।

হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গানের তালে দুলতে থাকা একদল জার্মানের পিছনে চলে গেল রানা, লোকগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে প্যাগোডা বার-এ দাঁড়ানো লোকটাকে লক্ষ করল আরও ভালভাবে।

ওর দিকে পিছন ফিরে আছে লোকটা। যে-দু'জনকে পল হাইনরিখের পাহাড়ি কেবিনে দেখেছিল ও, যারা অকারণে হামলা করেছিল ওর উপর, রবিনকে যারা খুন করেছে, হান্টারকে মেরেছে এ তাদেরই একজন। জেসন ট্রটম্যান। লোকটাকে

চিনতে কখনও ভুল হবে না ওর।

ঠিক তখনই চোখের কোণে লিমাকে দেখতে পেল জেসন ট্রটম্যান, বুঝতে তার দেরি হলো না, নির্দিষ্ট কাউকে খুঁজছে মেয়েটা। সুন্দরী মেয়েটিকে অতিরিক্ত কৌতূহলী মনে হলো তার, ফলে সন্দেহ জাগল মনে। বিয়ার না কিনে ঘুরে অন্যদিকে হাঁটা ধরল ট্রটম্যান।

আড়াআড়ি ভাবে তাকে অনুসরণ করল রানা, আগের চেয়ে আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে, চাইছে না লোকটা দেখে ফেলুক ওকে। মিনিট দুয়েক দ্রুত পা চালিয়ে পৌঁছে গেল ও ট্রটম্যানের বিশ ফুটের মধ্যে।

লিমা যে-টেবিলে বসে আছে, সেদিকে আবারও তাকাল ট্রটম্যান। লোকটাকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে দেখল রানা। আরও ভাল করে লিমাকে দেখবার জন্য একটু সরে দাঁড়াল বেঁটে পিশাচ। রানা নেই সেটা নিশ্চিত হতে সময় নিল সে কিছুক্ষণ, তারপর সন্দেহ হতেই পিছনে ঘুরে তাকাল হঠাৎ। বারো ফুট পিছনে রানাকে দেখে তার জ্বলন্ত, কুতকুতে চোখ দুটোতে অনিশ্চয়তা দেখা দিল এক মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই ঝেড়ে দৌড় দিল সে জঙ্গলের দিকে।

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে গরিলা-মানব জেসন ট্রটম্যান, ধাওয়া করে টের পেল রানা। হরিণের মতো বারবার বাঁক নিয়ে মানুষজনের মাঝ দিয়ে ছুটছে শয়তানটা। দৌড়ের গতি আরও বাড়াল রানা। ওর সামনে পড়ল একদল বিয়ার-প্রেমী জার্মান। রানার ধাক্কা খেয়ে তাদের দু'জনের হাত থেকে পড়ে গেল বিয়ারের মগ। হুড়মুড় করে পড়ে গেল আরেকজন তাল হারিয়ে। গালাগালির তুফান ছোটাল লোকগুলো।

রানাকে ল্যাং মারল একজন। লাফ দিয়ে এড়াতে চাইল রানা, পুরোপুরি সফল হলো না। হোঁচট খেয়ে আবার ভারসাম্য ফিরে পেয়ে জঙ্গলের প্রান্তে দেখতে পেল ও জেসন ট্রটম্যানকে।

জঙ্গলের ভিতরের ফুটপাথ ধরে দৌড়াচ্ছে লোকটা।

লোকজনের বিরূপ মন্তব্যের তোয়াক্কা না করে উড়ে চলল রানা। ফুটপাথে পৌঁছে দেখল, সামনের বাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে ট্রটম্যানের বাদামি জ্যাকেট। বাঁক ঘুরে হতাশ হতে হলো ওকে। পনেরো ফুট দূরে তিন ভাগ হয়ে জঙ্গলের তিনদিকে চলে গেছে ফুটপাথ। জেসন ট্রটম্যানের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কান পাতল রানা পায়ের শব্দ পাবার আশায়। নেই। দ্রুত কমে আসছে শেষ-বিকেলের আলো, জঙ্গলের এখানে ওখানে গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার ছায়া। বেশিদূর দেখা যায় না। হারিয়ে ফেলেছে ও জেসন ট্রটম্যানকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা, হতাশার সঙ্গে অনুভব করল শীতল ক্রোধ।

'কাকে ধরতে চেয়েছিলে?' রানা পাশে বসতেই জিজ্ঞেস করল লিমা।

'জেসন ট্রটম্যান,' বলল রানা। 'জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছি।'

ভ্রূ উঁচু হয়ে গেল লিমার। 'এখানেও আমাদের অনুসরণ করে এসেছে লোকটা? ক্রাইস্ট!'

'অনুসরণ করছে, সন্দেহ নেই,' বলল গম্ভীর রানা। 'তার মানে, আবারও ওই দু'জনের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের। এর পরেরবার হয়তো পালানোর সুযোগ পাবে না ওরা।'

'তুমি *দু'জন* বললে।'

'ওর সঙ্গী ব্রিম হার্টসেলও নিশ্চয়ই এসেছে।'

'তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না,' রানার ঠোঁটের কোণে শীতল, নিষ্ঠুর, বাঁকা ভাবটা দেখে বলল লিমা। 'মনে হচ্ছে না ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে বলে তুমি ভয় পাচ্ছ।'

'ভয়?' মাথা নাড়ল রানা। 'না, তা পাচ্ছি না। তবে সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করছি।' উঠে দাঁড়াল ও বিয়ারের জাগ হাতে প্যাগোডার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আরেক মগ বিয়ার

শেষ করেই হোটেলে ফিরব আমরা।'

'যদি লোকটাকে ধরতে পারতে, তা হলে কী করতে, রানা?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল লিমা।

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল রানা; বরফের মতো ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'চার্লি-হত্যার প্রতিশোধ নিতাম। খুন করতাম। আগে হাত-পা ভাঙতাম। ঠিক যেভাবে মেরেছে ওরা আমার হান্টারকে।'

পরদিন সকালে তৈরি হয়ে নেমে এলো ওরা লবিতে, রাজকীয় নাস্তা সারল হোটেলের রেস্টুরেন্টে, এরপর চলে এলো কনসিয়ার্জের ডেস্কে, প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রে সই শেষে ওখান থেকে সংগ্রহ করল অওডির চাবি। কনসিয়ার্জ জানাল, হোটেলে ঢুকবার মুখে পোর্টিকোর তলায় পার্ক করে রাখা হয়েছে ওদের অওডি। মোটা টিপস্ পেয়ে তেলতেলে হেসে বিনয়ের সুরে বলল, 'আপনাদের ভাল লাগবে মনে করে সেডানের বদলে স্পোর্টস কনভার্টিবল আনিয়েছি, সার।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

শহর ছাড়ানোর পর দু'পাশে বাভ্যারিয়ার গ্রামাঞ্চলের ঢেউ-খেলানো সবুজ মাঠ দেখতে পেল রানা ও লিমা। দারুণ মজা পেল রানা সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তায় বিদ্যুৎ-গতিতে অওডি স্পোর্টর্স কনভার্টিবল ছুটিয়ে। একটু সোজা রাস্তা পেলেই অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল ও মেঝের সঙ্গে। সাধারণ গাড়ি আশি কিলোমিটার স্পিডে বশে রাখা যতটা কঠিন, অওডিটা একশো ষাট কিলোমিটারেও তার চেয়ে সহজে নিয়ন্ত্রণে রাখল রানা।

পঁচিশ মিনিট পর একটা টিলার উপরে উঠে সামনে ফারস্টেনফেল্ডব্রাক দেখতে পেল ওরা। ছোট্ট শহরের মাঝখানে একটা গ্রোসারি স্টোরের সামনে থেমে আলবার্ট হিমেলস্টোস-এর বাড়ি কোনদিকে, সেটা জানতে চাইল রানা। লালচে চেহারার হাসি-খুশি বেঁটে-মোটা দোকানি জানাল, শহরে ঢুকবার মুখে যে-

সেতুটা আছে, সেখানে ফিরে যেতে হবে ওদের, সেতু থেকে ডানদিকের প্রথম বাঁক নিতে হবে। ওটাই হিমেলস্টোসদের বাড়ির ড্রাইভওয়ে। এক কিলোমিটার দীর্ঘ ড্রাইভওয়ের শেষে বামদিকে বাঁক নিলেই হিমেলস্টোস রেসিডেন্স।

মোটামুটি ভাল ইংরেজি বলে দোকানি, রানা ও লিমা গাড়িতে উঠবার পর চেঁচিয়ে জানাল, 'ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে এখন বাড়িতেই পাবেন।'

'আমি তাঁর স্বামীর কাছে এসেছি,' ধন্যবাদ জানিয়ে বলল রানা।

ফাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল দোকানি, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন!'

কথাটা শুনতে পায়নি রানা, খুশিমনে রওনা হয়ে গেল ও। বাভ্যারিয়ায় বাইরের কারও কাছে মুখ খোলে না সাধারণত কেউ। দোকানি যতটুকু তথ্য দিয়েছে, সেটা যথেষ্ট।

সেতু থেকে ডানদিকে প্রথম বাঁক নিয়ে খানা-খন্দ ভরা কাঁচা রাস্তাটার দু'পাশে ঘন জঙ্গল দেখতে পেল ওরা। এক কিলোমিটার পার হবার পর দোকানির কথামত বামদিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল পথ, দেখা গেল তিন একর জমির মাঝখানে দাঁড়ানো পাথরের বিরাট ম্যানশনটাকে।

ম্যানশনের চারপাশের বাগান একসময় নিশ্চয়ই যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, কিন্তু এখন মালীর অভাবে জংলা, অগোছাল হয়ে গেছে। বেশ কিছু মেরামতি দরকার প্রাচীন ম্যানশনেও। ফাটল ধরেছে দেয়ালের এখানে-ওখানে, রং চটে গেছে শাটার-জানালাগুলোর, ম্যানশনের দু'দিকে দোতলার জানালা ছেয়ে ফেলেছে বাড়ন্ত আইভি লতার ঝোপ। ড্রাইভওয়েটা বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে বাঁক নিয়ে পানা-ভরা একটা মজা-পুকুরের পাশ দিয়ে ম্যানশনের পিছনে চলে গেছে।

নক্সা করা ভারী ওক কাঠের দরজায় রট আয়ার্নের নকার আছে। দরজায় ওটা ঠুকল রানা। পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, সাড়া দিল না কেউ। আবার নক করল ও।

'আসছে কেউ,' দরজার পাশের সরু, অস্বচ্ছ কাঁচের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস করল লিমা।

ওরকম দুবলা-পাতলা, বয়স্কা কেউ এতো ভারী, প্রকাণ্ড দরজা খুলতে পেরেছেন দেখে বিস্মিত হয়ে তাকাল রানা। ফ্রাউ হিমেলস্টোস লম্বায় পাঁচ ফুটও হবেন না। বয়স আশির উপরে। বয়সের তুলনায় শক্ত আছেন এখনও, মনে মনে বলল রানা। কোনও রোগ আছে ভদ্রমহিলার, যে-কারণে মাথাটা ঘন-ঘন উপর-নীচ হচ্ছে।

'মিসেস হিমেলস্টোস?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'হ্যাঁ,' মিষ্টি হাসির রেখা দেখা গেল বৃদ্ধার ঠোঁটে।

'আমি লিমা সোরেনসন।' রানাকে দেখাল লিমা, 'ইনি মাসুদ রানা।'

'আচ্ছা! খুব খুশি হলাম।' হাসিটা চওড়া হলো বৃদ্ধার। '...ভাল তো তোমরা?'

'জী, ভাল,' ইতস্তত করে জবাব দিল লিমা, আন্দাজ করল, ভদ্রমহিলার মাথা ঠিকমত কাজ করে না। ধরে নিয়েছেন, ওদের চেনেন উনি।

হাসিমুখে রানাকে দেখলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। 'তুমি খুব সুন্দর। তোমাকে দেখে আমার ভাই ডেটারিঙের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অবশ্য, তোমার মতো এতটা লম্বা ছিল না ও।' দু'জনকে আরেকবার দেখে নিলেন বৃদ্ধা। '...তোমরা কি আমেরিকান?'

'আমি আমেরিকান,' বলল লিমা। 'ও বাংলাদেশি।' কাজের কথা পাড়ল এবার, 'আমরা হের হিমেলস্টোসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'আলবার্ট?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা মিষ্টি হাসিটা আস্তে

আস্তে মুছে গেল ঠোঁট থেকে, কোঁচকানো চেহারায় পড়ল বিষণ্ন ছায়া।

রানা আন্দাজ করল, কোনও কারণে দুঃখ পেয়েছেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস।

মাথা নাড়লেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। 'দুঃখিত, ফ্রয়লাইন, সাত বছর আগে মারা গেছে আমার আলবার্ট।'

অসহায় চোখে রানার দিকে তাকাল লিমা। মৃদু স্বরে বলল রানা, 'দুঃখিত, ফ্রাউ হিমেলস্টোস।'

অতিথিদের চেহারায় নিরাশার ছাপ লক্ষ করেছেন বৃদ্ধা, আবার স্মিত হাসি দেখা দিল তাঁর ঠোঁটে, বললেন, 'ভেতরে এসে বসো তোমরা। আমার আলবার্টকে চিনতে, কাজেই দরজা থেকে চলে যেতে দিতে পারি না তোমাদের। ...আর, আমি হয়তো কোনও কাজে আসতেও পারি তোমাদের।'

লিমার মনে হলো, বৃদ্ধা মহিলা আমন্ত্রণ করছেন না, রীতিমত মিনতি রয়েছে তাঁর বলবার ভঙ্গিতে। পশ্চিমা বিশ্বে বয়স্কদের দূরে ঠেলে এতোটাই নিঃসঙ্গ করে দেয়া হয় যে, ব্যাপারটাকে রীতিমত নিষ্ঠুরতা বলা যায়। তাড়াতাড়ি করে বলল ও, 'অনেক ধন্যবাদ, ফ্রাউ হিমেলস্টোস, আপনি হয়তো সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

'ভাল ইংরেজি বলতে পারি না, অপরাধটা নিয়ো না,' লিমাকে বললেন বৃদ্ধা। 'অনেক বছর হলো ইংরেজি চর্চার সুযোগ ঘটেনি তো।'

'চমৎকার ইংরেজি বলেন আপনি,' উদ্বিগ্ন বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করল লিমা।

ড্রইংরুম, লাইব্রেরি ও ডাইনিংরুম পার করিয়ে টলমল পায়ে বাড়ির পিছনের একটা সান-রুমে রানা ও লিমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। ওরা খেয়াল করল, সান-রুম ছাড়া অন্য সবগুলো ঘরের আসবাবপত্র ঢেকে রাখা হয়েছে চাদর

দিয়ে, জানালার চৌকাঠগুলোয় জমেছে পুরু ধুলোর আস্তরণ। ফ্রাউ হিমেলস্টোস সান-রুমেই থাকেন বলে মনে হলো ওদের। রোদ ঝলমলে কামরার এখানে-ওখানে নানান ছোট গাছ ঘরটাতে সুন্দর একটা সাজানো বাগিচার মতো মনোরম পরিবেশ এনে দিয়েছে। আসবাবপত্র অবশ্য অনেক পুরনো, রং উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়—তবে আরামদায়ক।

একটা সোফায় ওদের দু'জনকে পাশাপাশি বসতে ইশারা করলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। অতিথি পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন, সন্দেহ নেই। খুব কম মানুষই বোধহয় মহিলার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আন্দাজ করল লিমা।

'অতিথি এলে খুব খুশি হতো আমার আলবার্ট,' রানা ও লিমার দিকে তাকালেন বৃদ্ধা, মাথাটা দ্রুতগতিতে উপর-নীচে উঠছে-নামছে। '...আলবার্টের সঙ্গে পরিচয় হলো কী করে তোমাদের?'

'আমরা ওঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম না,' বলল লিমা। 'ওঁর নাম শুনেছি।'

'খুব দুঃখজনক,' আনমনে মাথা নাড়লেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। 'খুবই ভাল মানুষ ছিল ও। বিরাট একটা মন ছিল ওর। তোমরা বোধহয় পছন্দ করতে ওকে।'

'নিশ্চয়ই করতাম,' ভদ্রতা করে বলল রানা।

ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা, 'ওর সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছিলে?'

'আমরা আসলে সাংবাদিক,' বলল লিমা। 'ওয়ার-ক্রাইম ট্রায়ালগুলোর ব্যাপারে একটা আর্টিকেল লেখার দায়িত্ব পড়েছে আমাদের ওপর। একটা মামলায় বিবাদীর পক্ষে উকিল ছিলেন আপনার স্বামী। ওই মামলার বিবরণেই আপনার স্বামীর নাম পাই আমরা। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে মামলাটার ব্যাপারে নতুন কিছু জানতে পারব মনে করে এসেছিলাম।'

'ওসব মামলা,' চোখ নামিয়ে চামড়া কোঁচকানো হাতের দিকে তাকালেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, বিড়বিড় করে বললেন, 'ভয়ঙ্কর! খুব ভয়ঙ্কর! ...ওগুলোতে ন্যায়-বিচার করা হয়েছিল বলে মনে করত না আমার আলবার্ট। আসলে... যুদ্ধের সময় মানুষ যা করে, সেসবের জন্যে তার কাছে জবাবদিহি চাওয়া উচিত নয়। চরম উন্মাদনার মধ্যে কেউ ধীরস্থির ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কিছু করতে পারবে, সেটা আশা করা যায় না। ...আমার আলবার্ট তা-ই বলত। ...ও বলত, বিজয়ীরা তাদের ইচ্ছেমত অন্যায় আইন চাপিয়ে দিচ্ছে আমাদের ওপর। ...ও তা-ই বলত।'

বিরুদ্ধ-যুক্তি দিতে ইচ্ছে হলো লিমার, কিন্তু উদ্দেশ্য থেকে না সরে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল ও, 'আপনার স্বামী যেসব মামলা লড়েছেন, সেগুলোর কোনওটার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানেন আপনি, ফ্রাউ হিমেলস্টোস?'

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধা। 'আমার আলবার্ট আর আমি ওসব মামলা নিয়ে অনেক আলাপ করেছি। দুটো মামলা লড়েছিল আমার আলবার্ট। প্রথমটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনাল। ওটাতে বিচার হয় থার্ড রাইখের প্রথম সারির নেতাদের।' এবার গর্ব প্রকাশ পেল ফ্রাউ হিমেলস্টোসের কণ্ঠে: 'ফরেন মিনিস্টার ফন রিবেনট্রপ-এর উকিলদের একজন ছিল আমার আলবার্ট। ...বেচারা ফন রিবেনট্রপকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওরা।' ঝুঁকে বসলেন বৃদ্ধা, গোপন কথা বলছেন, এমন ভঙ্গিতে নিচু স্বরে বললেন, 'খুবই দুঃখজনক ব্যাপার! আমার আলবার্ট খুব মন খারাপ করেছিল। বলেছিল, বিরাট অন্যায় করা হয়েছে রিবেনট্রপের ওপর।'

নরম সুরে জিজ্ঞেস করল লিমা, 'আর দ্বিতীয় মামলা, ফ্রাউ হিমেলস্টোস?'

'এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের পক্ষে লড়েছিল সেবার আমার আলবার্ট,' চোখ সরিয়ে ঘরের আরেক-প্রান্তে ছাদ

থেকে ঝুলন্ত একটা রঙিন ফার্ন-এর দিকে তাকালেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, যেন ভুলে যাওয়া কোনকিছু মনে করতে অতীতের গর্ভে হাতড়ে ফিরছেন। 'ওই মামলায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ছিল,' অবশেষে বললেন, 'যতদিন বেঁচে ছিল, ওই মামলার কথা উঠলেই বিব্রত বোধ করত আমার আলবার্ট। তবে কখনও এ নিয়ে আমাকে কিছু বলেনি ও। জেল থেকে বেরিয়ে আলবার্টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ। তার পর থেকে আগের চেয়ে কম বিব্রত হতো আলবার্ট। তবে আমি বুঝতাম, মনে শান্তি ফিরে পায়নি ও পুরোপুরি।'

চুপ করে শুনছে রানা, আগ্রহ বোধ করছে। আগ্রহী হয়ে উঠেছে লিমাও, প্রসঙ্গ থেকে না সরে জিজ্ঞেস করল, 'ওই মামলা লড়তে আপনার স্বামী যে-প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সে-ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি? ...আরেকটা ব্যাপার, পল হাইনরিখ যখন জেলে ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন আপনার স্বামী?'

'না,' একটু চুপ করে থেকে বললেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, 'এ নিয়ে কথা বলত না আলবার্ট। জেলে কখনও দেখা করতে গিয়েছিল কি না সেটা আমি জানি না।'

হতাশ বোধ করল লিমা।

'পল হাইনরিখের সঙ্গে যা কথাবার্তা হতো, সেগুলো নিশ্চয়ই লিখে রাখতেন হের হিমেলস্টোস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চয়ই!' স্বামীর কথা ভেবে স্মিত হাসি হাসলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। 'কোনও কাজে কখনও কিছু খুঁত রাখত না আমার আলবার্ট।'

হালে পানি পেল লিমা। ফাইলগুলো পড়বার সুযোগ মিলে যেতে পারে বুঝে বলল, 'পল হাইনরিখের মামলাতেও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম করেননি উনি, তা-ই না?'

'তা-ই তো মনে হয়,' সায় দিলেন বৃদ্ধা। 'তবে আলবার্টের কোনও ফাইলে কখনও চোখ বুলাইনি আমি। কিছু কিছু ব্যাপারে

গোপনীয়তা পছন্দ করত আমার আলবার্ট। কখনও চাইত না কেউ ওর প্রাইভেসি নষ্ট করুক। সবসময় ওর মতামতকে সম্মান দিয়েছি আমি। ও মারা যাবার পরেও ওর ব্যক্তিগত জিনিসে হাত দিতে মন থেকে সায় পাই না।'

সহজে কাজ আদায় হবে না, বুঝে গেল লিমা। চট্ করে একবার তাকাল ও রানার চোখে, তারপর ফ্রাউ হিমেলস্টোস কে বলল, 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের ব্যাপারে আপনার স্বামী যে ফাইল তৈরি করেছিলেন, ওটাতে একটু চোখ বুলাতে পারি আমরা, ফ্রাউ হিমেলস্টোস?'

'না,' প্রথমবারের মতো দৃঢ় শোনাল বৃদ্ধার কণ্ঠ, 'কোনও ফাইল দেখতে দেয়া সম্ভব নয়। এরকম কিছু করার অনুমতি দিলে আলবার্ট আমাকে ক্ষমা করবে না কখনও।'

'উনি হয়তো খুশিই হতেন,' মৃদু স্বরে বলল লিমা। 'আমরা যদি আমাদের আর্টিকেলে সত্যটা প্রকাশ করতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে ওঁর আত্মা।'

মাথার ওঠা-নামা বেড়ে গেল ফ্রাউ হিমেলস্টোসের। বিস্ফারিত চোখে লিমার দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ শোনাল। 'বুঝলাম না। আমার আলবার্ট সবসময় ন্যায়ের পক্ষে ছিল। খুব ভাল মানুষ ছিল ও।'

'আমরাও তা-ই মনে করি,' এবার বলল রানা। 'আর সেটাই সম্ভবত প্রমাণ হবে মামলাটার বিস্তারিত বিবরণে আমরা চোখ বুলাতে পারলে।' লিমাকে দেখাল ও। 'ও যে আর্টিকেল লিখবে, তাতে সত্যটা উঠে আসবে লোকের চোখের সামনে। তাতে হয়তো খানিকটা হলেও শান্তি পাবে আপনার স্বামীর আত্মা, ফ্রাউ হিমেলস্টোস।'

কথাগুলো শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ মাথা দুলিয়ে ভাবলেন বৃদ্ধা, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে তোমরাও মনে করছ ওই মামলায় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল?'

'জী,' যা সত্যি ভাবছে, সেটাই বলল রানা, 'বিবাদী পল হাইনরিখের সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামীর ওপরেও অন্যায় করা হয়েছিল বলে মনে করি আমরা।'

'আর সেই অন্যায়টাই মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেব আমি,' বলল লিমা।

প্রভাবিত হলেন বৃদ্ধা। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কেউ জার্মান ভাষা জানো?'

'অল্প অল্প জানি আমি,' নিখুঁত জার্মান উচ্চারণে বলল রানা।

'এক্সেলেন্ট, হের রানা,' স্মিত হাসলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। 'এতটা ভাল জানো আমি কল্পনাও করিনি।'

চেয়ারের হাতলে টোকা মারছেন বৃদ্ধা, খেয়াল করল রানা। আন্দাজ করল, বোধহয় দ্রুত চিন্তা করতে চাইছেন উনি। আধমিনিট পর রানার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। 'লাইব্রেরিতে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের প্যানেলে ঠেলা দিলেই সরে যাবে প্যানেল। ওটা আসলে একটা স্লাইডিং ডোর। ভেতরে আমার আলবার্টের গোপন অফিস।' লিমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। 'আমি ওটাকে বলতাম আলবার্টের লুকোচুরি খেলার গোপন আস্তানা। একা কাজ করতে চাইলে সবসময় ওখানে গিয়ে ঢুকত আমার আলবার্ট। ...ওর সমস্ত রেকর্ড ওখানেই আছে।' রানাকে হাতের ইশারা করলেন বৃদ্ধা। 'তুমি গিয়ে দেখো কী পাও, হের রানা। আমি আর ফ্রয়লাইন সোরেনসন গল্প করি ততক্ষণ।'

ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে সত্য উদ্ঘাটনের কাজে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে থমথমে নীরব লাইব্রেরিতে চলে এলো রানা, ফায়ারপ্লেসের ডানদিকে কাঠের প্যানেলে হাত রেখে ঠেলা দিল। সরসর করে একপাশে সরতে শুরু করল প্যানেল।

পনেরো

ব্যক্তিগত লিয়ার জেট-এর প্যাসেঞ্জার সেকশনে গা এলিয়ে বসে আছেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, মন দিয়ে পড়ছেন তাঁর কম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এর চিফ-এর তৈরি একটা জরুরি রিপোর্ট। রিপোর্টে লেযারের পাওয়ার সোর্স হিসেবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র যুগান্তকারী একটা উৎস ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে বর্তমান প্রজেক্টে পরিবর্তন আনবার। ইঞ্জিনিয়ারদের হিসেব-নিকেশ যদি নির্ভুল হয়ে থাকে—ভুল সাধারণত তারা করে না বললেই চলে—তা হলে এতদিন ধরে যে হাইলি সফিসটিকেটেড ইউনিট-এর কারণে তাঁরা ঝামেলায় আছেন, সে-ব্যাপারে দূর হয়ে যাবে সমস্ত সমস্যা।

কো-পাইলট লাঙ্কেন এয়ারপোর্টকে নিজের অবস্থান রিপোর্ট করায় মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের।

টাওয়ার থেকে জানানো হলো কো-পাইলটকে: 'রিপোর্ট অ্যাট দ্য আউটার মার্কার।'

দুটো 'ক্লিক' শুনতে পেলেন ব্যারি ক্যাসল। দু'বার মাইক্রোফোন-বাটন টিপে নির্দেশ শুনেছে, সেটা জানান দিল কো-পাইলট। কাজটা এভাবে করা অপ্রচলিত নয়, তবে ব্রিম হার্টসেল কখনও এ-ধরনের কিছু করত না—সবসময় সঠিক নিয়ম মেনে চলে সে। হার্টসেলের অনুপস্থিতিতে যে-পাইলটকে তিনি ভাড়া করেছেন নিঃসন্দেহে সে দক্ষ, তবে তার উপর চোখ বুজে ভরসা

করা যায় না, যেমনটা করা যায় হার্টসেলের উপর। ভ্রূ কুঁচকে আবার রিপোর্টে চোখ রাখলেন ব্যারি ক্যাসল।

ফাইটার আকৃতির সরু জেট প্লেনটাকে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে রানওয়েতে নেমে আসতে দেখলেন জাস্টিস স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি। পাইলট থ্রাস্ট রিভার্স করতেই বেড়ে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। ট্যাক্সিইং করে টার্মিনালের র‍্যাম্প-এর সামনে থামল লিয়ার জেট। ককপিট-এর পিছনে খুদে একটা দরজা খুলে গেল, আগে বের হলো কো-পাইলট, তারপর পাইলট। এরপর ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলকে দেখতে পেলেন জাজ।

দু'জনের দেখা হয় না দু'বছরের বেশি, কিন্তু ব্যবসায়িক পার্টনারের চেহারায় কোনও পরিবর্তন দেখলেন না জাজ গেটসবি। সেই একই শান্ত, শীতল, আবেগবর্জিত শিকারীই রয়ে গেছে লোকটা।

জাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, জরুরি কিছু নির্দেশ দিলেন পাইলটকে।

'ট্যাঙ্কগুলো অর্ধেকের বেশি ভর্তি করার দরকার নেই, পেনসিলভেনিয়ার চার হাজার ফুট রানওয়ে থেকে টেকঅফের সময় প্লেনটাকে যতটা হালকা রাখা যায়।' ঘুরে তাকিয়ে জাজের দিকে ফিরে হাসলেন ব্যারি ক্যাসল, ওটাকে হাসি না বলে মুখ ভেংচানোও বলা চলে। 'এরা আবহাওয়ার খবর নিয়ে ফিরে এলে দশ মিনিটের মধ্যে রওনা দেব আমরা, স্যাম।'

ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলকে কখনও পছন্দ করতে পারেননি জাজ। সেই কিশোর বয়সে যখন প্রথম তিনি ব্যারি উইলিয়াম ক্যাসলকে দেখেন, তখনই তাঁর মনে হয়েছিল, ওকে বিশ্বাস করা যায় না একফোঁটা। ভীতিকর কী যেন আছে ওর মধ্যে, কেমন যেন অশুভ একটা কিছু—আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। শারীরিক আকারের সঙ্গে বড় বেশি বেমানান ওর প্রবল কর্তৃত্ব। মাঝারি

আকারের লোক ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, স্টিল-এর তারের মতো শুকনো, বিড়ালের মতো দ্রুত নড়াচড়া। চকচকে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন সর্বক্ষণ অন্যের দুর্বলতা ও খুঁত বের করে সুবিধা আদায়ের সুযোগ খুঁজছে। পরবর্তীকালে জাজের সবসময় মনে হয়েছে, ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ম্যাকিয়াভেলির প্রিন্স-এর মতো খল ও চতুর লোক।

'কী যেন ঘটেছে বলেছিলে গতকাল?' নীরবতা ভাঙলেন জাজ। রাতে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম হয়েছে তাঁর, দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার জেগে উঠেছেন ঘেমে-নেয়ে।

'এমন কিছু ঘটেনি যেটা এখনই আলাপ করতে হবে,' কাটা-কাটা স্বরে বললেন ব্যারি ক্যাসল, জাজের দুশ্চিন্তা অনুভব করে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করছেন। 'সিনেটরের ওখানে গিয়ে কথা হবে সবকিছু নিয়ে।' পাইলট ও কো-পাইলটকে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে নির্দেশের সুরে জানালেন, 'প্লেনে ওঠো, স্যাম।'

পেনসিলভেনিয়ার পথে রওনা হয়ে দু'বার পল হাইনরিখের প্রসঙ্গ তুললেন জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি, দু'বারই রূঢ় ভাবে তাঁকে থামিয়ে দিলেন ব্যারি ক্যাসল। চিঠিটা পড়বার পর থেকেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে তাঁর। না, ছেলেটাকে এবার কোনও সাহায্য করবেন না তিনি। পচুক ও মেক্সিকোর জেলে। কী করেননি তিনি তাঁর ওই একমাত্র পুত্র-সন্তানের জন্য? পাগলাগারদের ডাক্তাররা যখন তাঁর স্ত্রীকে স্ট্রেইট-জ্যাকেট পরিয়ে নিয়ে গেল, তার পর থেকে ও যা চেয়েছে, তা-ই দিয়েছেন। সেরা বোর্ডিং স্কুলে পড়িয়েছেন, সেরা পোশাক কিনে দিয়েছেন, সেরা গাড়ি উপহার দিয়েছেন—হাতখরচা যা দিয়েছেন, অত টাকা পায় না তাঁর কম্পানির অনেক এক্সিকিউটিভও। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। তাঁর সীমা তিনি পার হয়ে গেছেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, এখন থেকে ওই ছোকরাকে

নিয়ে কোনও ভাবনা নয় আর। সোজা কথা: কোনও পুত্র-সন্তান নেই তাঁর।

চুপ করে বসে অনেক নীচের পিছিয়ে যাওয়া মেঘমালা দেখছেন জাজ, ভাবছেন তাঁর বাবার কথা, পল হাইনরিখের কথা, এতদিন যে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা তিনি ভোগ করেছেন অতীতে তাঁর বাবার সেই অন্যায়ের ফলে, সেসবের কথা। তাঁর নৈতিকতাবোধের সঙ্গে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া একেবারেই খাপ খায়নি, কখনও। তাঁর বাবা যখন খুলে বলেছিলেন কী করেছেন, সেই বয়সেও লজ্জিত হয়েছিলেন তিনি। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর? তারপর তিনি নিজে কী করেছেন? প্রশ্রয় দেননি লোভকে? নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সমস্ত সুবিধা ভোগ করেননি চুপচাপ? সান্ত্বনা শুধু এটুকুই, তিনি নিজে কখনও এমন কোনও কাজ করেননি পেশাগত জীবনে, যেটার জন্য তাঁকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু ওই সান্ত্বনা এখন আর তাঁকে স্বস্তি এনে দিতে পারছে না। এতদিন সেই অপরাধ থেকে পাওয়া সুবিধা অবলীলায় ভোগ করবার মাশুল গুনতে হয়েছে, কিন্তু সেটা ছিল সহ্যের মধ্যে, এবার হয়তো কবর থেকে হাত বাড়িয়ে এক পলকে তাঁর সমস্ত মানসম্মান ছিনিয়ে নিয়ে যাবে পল হাইনরিখ!

'মিস্টার ক্যাসল,' ইন্টারকমে ভেসে এলো পাইলটের কণ্ঠ: 'দয়া করে সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন। মাত্র চার হাজার ফুট রানওয়ে পাচ্ছি আমরা, কাজেই সতর্ক থাকা ভাল। কড়া ব্রেক করতে হবে হয়তো আমাকে।'

বাড়িয়ে বলেনি পাইলট, পুরোটা রানওয়ে ব্রেক কষে শেষ-সীমার কাছাকাছি গিয়ে লিয়ার জেটকে থামাতে পারল সে। শক্ত করে আর্মরেস্ট আঁকড়ে থাকলেন জাজ, তীব্র আতঙ্কের সঙ্গে ভাবলেন, রানওয়ে পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বিধ্বস্ত হবে প্লেনটা।

জাজের ফ্যাকাসে, ভীত-বিকৃত চেহারাটা সর্বক্ষণ হাসির

খোরাক জোগাল ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলকে।

তবে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সিনেটরের ড্রাইভ করা গাড়িতে চড়ে এস্টেটের দিকে রওনা হয়ে জাজ বুঝলেন, মৃত্যু-ভীতি কাকে বলে। ফুটন্ত কড়াই থেকে লাফিয়ে পড়েছেন জ্বলন্ত চুলায়। হাইওয়ে থেকে সেকেন্ডারি রাস্তায় নেমে এস্টেটের দিকে ছুটে চললেন সিনেটর গ্রুসাক, সরু রাস্তায় এস-এর মতো তীক্ষ্ণ বাঁকগুলো নিলেন সামান্যতম গতি না কমিয়ে। অতিরিক্ত ওজনদার পুরনো লিঙ্কন তৈরি করা হয়েছিল রাজকীয় ভঙ্গিতে ধীরস্থির ভাবে চালানোর জন্য, মাত্রাতিরিক্ত গতিতে হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নিতে হওয়ায় গাড়ির পিছনটা ছেঁচড়ে সরতে লাগল এদিক্-ওদিক। দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দরজা আঁকড়ে সিটে টিকে থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন জাজ গেটসবি।

বিরক্ত হয়ে গেলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, শীতল স্বরে বললেন, 'ফ্রেড, তুমি যদি বদ্ধ উন্মাদের মতো গাড়ি চালাতে জেদ ধরে বসে থাকো, তা হলে বরং একটা মার্সিডিয বিংবা ফেরারি কিনে ফেলো, তাতে তোমার ড্রাইভিঙের অদক্ষতা এতটা প্রকটভাবে ধরা পড়বে না।'

'ওসব বিদেশি জঞ্জাল আমি কোনদিনই কিনব না,' আপত্তির সুরে বললেন ফ্রেডারিক গ্রুসাক। আরেকটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে রাস্তা থেকে অর্ধেকটা নেমে গেল লিঙ্কন। 'ইউনাইটেড স্টেটসের সিনেটর হয়ে বিদেশি গাড়ি চালালে দৃষ্টিকটু লাগবে।'

'বদলাওনি,' টিটকারির বাঁকা হাসি হাসলেন ব্যারি ক্যাসল, 'সেই আগের মতো সংকীর্ণমনা আত্মসচেতন প্রতারক রয়ে গেছ।'

পাশ ফিরে ব্যারি ক্যাসলের দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন সিনেটর গ্রুসাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাজের দুঃস্বপ্নের সময়টা কেটে গেল। সিনেটরের এস্টেটে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। ক্যাসল ও গ্রুসাকের পিছু নিয়ে লন পেরিয়ে সরু একটা ফুট-ব্রিজের উপর উঠলেন

জাজ, চলে এলেন সবচেয়ে বড় পুকুরটার মাঝখানে, সবুজ দ্বীপে। প্রকাণ্ড একটা উইপিং উইলো গাছের নীচে টেবিল ঘেরা লাউঞ্জ চেয়ারে বসলেন তাঁরা।

'তোমরা কেউ কি দয়া করে বলবে, কী হয়েছে?' ধৈর্যের শেষ-সীমায় পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন জাজ গেটসবি। গত পনেরো মিনিট যা শুনেছেন, সে-প্রসঙ্গ টানলেন, 'তোমাদের দু'জনের রক্ষিতার কার কেমন বুদ্ধি আর কে কতো সুন্দরী, সে-গল্প শুনতে কাজ ফেলে এখানে আসিনি আমি।'

'না, আসল কথায় আসা যাক,' টিটকারির সুরে বললেন সিনেটর, 'টেনশনের ঠেলায় স্যাম আবার কখন হার্ট অ্যাটাক করে বসে, বলা যায় না!'

'যে-দু'জনের কথা তোমাকে আগেই বলেছি,' জাজের দিকে তাকালেন ব্যারি ক্যাসল, 'কিছু সূত্র পেয়ে গেছে তারা, আমাদের আগের প্রজন্মের কবর খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে। তারা এখন জানে, আমাদের পূর্বপুরুষরা পল হাইনরিখের মামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

বিস্মিত হলেন জাজ। 'ওটা তো পাবলিক রেকর্ড। তার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক?'

'আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক অন্যখানে,' বললেন ক্যাসল, 'পল হাইনরিখ যখন মারা যায়, তখন তার কাছে একটা অ্যাড্রেস বুক ছিল। ওটাতে কোড-এ লেখা ছিল লং আইল্যান্ডের বাসিন্দা ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক আর আমাদের নাম। ওটা পেয়েছে মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসন নামে এক মেয়ে। ওরা ধরেই নিয়েছে, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এখন জানতে চাইছে, কেন আমাদের নামগুলো কোড় করে লেখা হয়েছিল।'

'এই যে তদন্ত করে দেখতে চাইছে, কে এই মাসুদ রানা বা লিমা সোরেনসন?' জিজ্ঞেস করলেন জাজ গেটসবি।

'মেয়েটা নিউ ইয়র্কের ফ্রি-লান্স সাংবাদিক, আর...' জাজের

ভীতি কোন্ পর্যায়ে পৌঁছুবে আন্দাজ করতে একটু থামলেন ব্যারি ক্যাসল, তারপর বললেন, 'লোকটা দুনিয়ার সেরা পাঁচজন এসপিওনাজ এজেন্টের একজন। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক বুদ্ধিমান শত্রু বলতে পারো তাকে তুমি। অবশ্য, কীভাবে যেন, স্মৃতি হারিয়েছে লোকটা, জানে না সে আসলে কে। তারপরেও, আমাদের সিআইএ কন্ট্যাক্ট বারবার করে সাবধান করেছে, ওই লোককে সমঝে চলতে যেন সামান্যতম ভুল না করি আমরা।'

'তুমি বলার পর খোঁজ-খবর কিছু আমিও নিয়েছি,' বললেন সিনেটর গ্রুসাক। 'বাংলাদেশি ওই দুর্ধর্ষ লোকটা শুধু সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক এক গুপ্তচরই নয়, এ্যুগের অন্যতম দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার, শখের আর্কিওলজিস্ট, অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে আমাদের নুমার সঙ্গেও জড়িত। বড় বড় সব জায়গায় কানেকশন ছিল তার—সম্ভবত এখনও আছে। আর আছে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একদল শুভাকাঙ্ক্ষী, যারা তার দ্বারা উপকৃত।'

'আর ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক?' গোটা পরিস্থিতি বুঝতে চাইছেন জাজ, সেই সঙ্গে ঘামছেন দরদর করে।

'এর ব্যাপারটা অস্পষ্ট আমাদের কাছেও,' বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'এর নাম কোডে এলো কেন, সেটা আমরা জানি না। ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক জার্মান এক খেলনা-ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ছেড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যায়, ওখানে ব্যবসা করে। এর সঙ্গে পল হাইনরিখের কী সম্পর্ক, অন্তত আমি সেটা ভেবে বের করতে পারিনি। এমন হতে পারে, আমাদের সঙ্গে পল হাইনরিখের যে-ধরনের সম্পর্ক ছিল, এই ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের সঙ্গেও তা-ই ছিল। যদিও, কারণ নিশ্চয়ই ভিন্ন হবে।'

বিচলিত চোখে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের দিকে তাকালেন জাজ, ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই গুপ্তচর আর ফ্রি-লান্স সাংবাদিক মেয়েটা এখন কী করছে?'

'জার্মানিতে গেছে ওরা পল হাইনরিখের অতীত ঘাঁটতে। সেই সঙ্গে নুরেমবার্গে যে উকিল পল হাইনরিখের হয়ে মামলা লড়েছিল, তার সঙ্গেও দেখা করতে চায়।'

নতুন তথ্যটা শুনে ভ্রূ উঁচু করলেন সিনেটর গ্রুসাক। 'তাতে কী ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে?'

'কোনও তথ্যই বেরিয়ে আসবে না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'সাত বছর আগে নরকে চলে গেছে হাইনরিখের উকিল। তা ছাড়া, তোমরা হয়তো জানো না, আমার বাবা জার্মানি ছাড়ার আগে তাকে ভালমত বুঝিয়ে দিয়েছিল খেলাটা কী নিয়মে খেলতে হবে, কাজেই কোনও তথ্য-প্রমাণ জিইয়ে রাখার সাহস হবার কথা নয় তার।'

'সেটা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথা,' দ্বিধা প্রকাশ পেল সিনেটরের কণ্ঠে। 'তার পরে যদি সে...'

'সম্ভব নয়,' থামিয়ে দিলেন ব্যারি ক্যাসল, 'ওই উকিলের সঙ্গে উঁচু পর্যায়ের নাৎসিদের দহরম-মহরম ছিল। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তার অতীত প্রকাশ পেয়ে গেলে বিরাট বিপদে পড়ে যেত সে।'

'এর মধ্যে আরও কিছু আছে, যেটা তুমি আমাদের বলছ না,' অভিযোগের সুরে বললেন জাজ। 'পল হাইনরিখের অ্যাড্রেস বুকে আমাদের নাম আছে, আর আমাদের পূর্বপুরুষরা তার মামলার সঙ্গে জড়িত, শুধু এ দুটো কারণে মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসন খোঁজ-খবর করতে সেই জার্মানিতে চলে গেল, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তাদের বরং এটা ধরে নেয়াই স্বাভাবিক ছিল যে, পল হাইনরিখ নামগুলো লিখেছে বিদ্বেষ থেকে, প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার ইচ্ছে থেকে। অতি বোকা তদন্তকারীও এটাই ধরে নেবে। ...ওই দু'জনের সন্দেহ জাগবার নিশ্চয়ই আরও বড় কোনও কারণ আছে।'

পরিস্থিতি খানিকটা ব্যাখ্যা না করলে জাজ সন্তুষ্ট হবে না বুঝে

অর্ধ-সত্য বলবেন, ঠিক করলেন ব্যারি ক্যাসল। 'ঠিকই ধরেছ, স্যাম, আমাদের তরফ থেকে চালে সামান্য ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমার লোকরা অ্যাসপেনে যায় পল হাইনরিখ কোনও তথ্য রেখে গেছে কি না খুঁজে দেখতে। ওখানে পল হাইনরিখের কেবিনে তাদের ঢুকতে দেখে ফেলে মাসুদ রানা। আমার একটা হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিল ওরা, ওটা ট্রেস করে আমার খোঁজ পেয়ে যায় ওই লোক।'

শিউরে উঠলেন জাজ। 'ওরা যদি খুঁড়তে খুঁড়তে যথেষ্ট গভীরে যেতে পারে, তা হলে সব জানাজানি হয়ে যাবে, ব্যারি।'

'ফালতু দুশ্চিন্তা কোরো না তো!' বিরক্ত স্বরে বললেন ব্যারি ক্যাসল।

অসহায় রাগে ফ্যাকাসে দেখাল জাজ গেটসবিকে। বেসুরো কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে তাল দিতে গিয়েই আজ এই ভয়ানক বিপদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি আমি।'

'নুরেমবার্গে তাল দিতে আপত্তি করেননি তোমার বাবা,' কড়া স্বরে বললেন ক্যাসল। 'পরবর্তীতে তোমাকেও কখনও শুনিনি আপত্তি করে টুঁ শব্দটি করতে। মনে পড়ছে যেন বেশ খুশি হতে দেখেছিলাম তোমাকে কতখানি কী পেতে যাচ্ছ জেনে!'

'ঝগড়া করে কোনও লাভ নেই,' চেয়ারে ঝুঁকে বসে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিলেন সিনেটর গ্রুসাক। জাজের দিকে তাকালেন। 'স্যাম, ওরা তদন্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ বের করতে পারবে, তার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। ধরে নাও, আসামীর কাঠগড়ায় আদালতে দাঁড়াতে হচ্ছে না তোমাকে কখনও। আমাদের যেটা চিন্তা করতে হবে, সেটা হচ্ছে, পত্রিকাওয়ালারা যেন কিছু জানতে না পারে। ওরা কোনও প্রমাণ হাতে পেয়ে পেছনে লাগলে হয়তো শেষ হয়ে যাব আমরা। কিন্তু সে-সম্ভাবনা কতটুকু?' মাথা নাড়লেন সিনেটর। 'নেই। আমাদের পর্বপুরুষরা মারা গেছেন। মারা গেছে পল হাইনরিখ আর তার

উকিল আলবার্ট হিমেলস্টোস। কী ঘটেছিল সেটা জানি শুধু আমরা তিনজন। আমরা মুখ খুলব না। তা হলে ওরা সফল হবে কী করে?'

'ছবিগুলোর কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি,' মনে করিয়ে দেবার সুরে বললেন জাজ গেট্সবি।

'ওগুলো প্রমাণ হিসেবে মোটেই যথেষ্ট নয়,' দৃঢ় স্বরে আপত্তি করলেন ব্যারি ক্যাসল, 'এমন কী নেগেটিভ থাকলেও নয়।'

'পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থাকলে যথেষ্টরও বেশি,' ভোঁতা গলায় বললেন জাজ।

'রাখো তোমার কাপুরুষের মতো কথা!' এবার ধৈর্য হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন ব্যারি ক্যাসল। 'আমরা যদি ছবি না পাই তো আর কেউ পাবে কোত্থেকে, শুনি?'

'কোথাও না কোথাও আছে ওগুলো,' একগুঁয়ের মতো বললেন জাজ। 'যে তুলেছে, সে-ও আছে কোথাও। অথচ আমরা তার পরিচয়ও জানি না।'

'আছে,' বিচলিত জাজকে শান্ত করতে স্বীকার করলেন ব্যারি ক্যাসল। 'যদি আমাদের বিরুদ্ধে লাগতে চায়, তা হলে তার ব্যবস্থা করার মতো যথেষ্ট সময় পাব আমরা।'

'ব্যবস্থা মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জাজের কণ্ঠ: 'আর কোনও বে-আইনী কাজের সঙ্গে থাকছি না আমি!'

তীব্র টিটকারি প্রকাশ পেল ত্যক্ত-বিরক্ত ব্যারি ক্যাসলের স্বরে: 'যদি সেরকম পরিস্থিতি হয়, তা হলে না থেকে আপনার কোনও উপায় থাকবে না, ইয়োর অনার!' দ্রুত গলার স্বর নরম করলেন তিনি, চাইছেন না স্যামুয়েল গেটসবি ভীতচকিত হয়ে যখন-তখন বেসামাল কিছু করে বসুক, 'আমি শুধু ওই দু'জনের ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা নিয়েছি। ওরা কী বলে তা শোনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ট্র্যান্সমিটারগুলো যদি ওরা খুঁজেও পায়, ওগুলো ট্রেস করে আমাদের নাগাল পাবে না ওরা।'

'যাদের কাজে লাগাচ্ছ, তারা কতটা বিশ্বস্ত?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'পুরোপুরি।' জাজের দিকে তাকালেন ব্যারি ক্যাসল। 'চিন্তা কোরো না, স্যাম, ওরা জানেও না কী ঘটেছিল আসলে। জানতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হবে ওদের। অথচ সামান্যতম সূত্র নেই ওদের হাতে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি। আলোচনা যেদিকে গেল, তাতে বুঝতে পারছেন, হাতে সময় আছে তাঁদের। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না তিনি মনে।

উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন সিনেটর। নরম সুরে বললেন, 'আমরা জানি মন খারাপ হয়ে গেছে তোমার, স্যাম, তবে দুশ্চিন্তা করে শরীরটা খারাপ করে তুলো না। আমাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে সব। এখন থেকে যা ঘটবে, সব তোমাকে জানাব আমি। এবার তুমি যদি কিছু মনে না করো, ব্যারির সঙ্গে ব্যবসার অন্য কিছু বিষয়ে আলাপ আছে আমার। ...পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

সেতু পেরিয়ে পুকুরের আরেকপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ও ফ্রেডারিক গ্রুসাক। চুপ করে বসে পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন চিন্তিত জাজ। দুটো হাঁসকে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ডুব দিয়ে খাবার খুঁজতে দেখে ভীষণ ঈর্ষা বোধ করলেন তিনি।

ষোলো

প্যানেল সরে যেতেই ছোট একটা কিউবিক্‌ল্‌ দেখল রানা। একদিকে একটা ডেস্ক, আরেকদিকের দেয়ালে একসারি ফাইল ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের উপরের গ্যালারিতে বেশ কিছু ছবি। ওগুলো নাৎসি জার্মানির তৎকালীন হর্তাকর্তাদের সঙ্গে আলবার্ট হিমেলস্টোসের ছবি, আন্দাজ করল রানা। পিছনে প্যানেল সরিয়ে গোপন দরজা বন্ধ করে মনোযোগ দিল ওদিকে। হিমলার, গোয়েরিং, হেস ছাড়াও আরও কয়েকজনের সঙ্গে ছবি রয়েছে আলবার্ট হিমেলস্টোসের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ে এদের ছবিও দেখেছে রানা, নামটা মনে করতে পারল না এই মুহূর্তে। ডেস্কের কোনা থেকে চামড়ার ফ্রেমে আটকানো একটা পোর্ট্রেট তুলে নিয়ে দেখল ও। আলবার্ট হিমেলস্টোস ও তাঁর স্ত্রীর পোর্ট্রেট, পরনে অত্যন্ত দামি পোশাক দু'জনের, দাঁড়িয়ে আছেন কোনও এক জমজমাট অনুষ্ঠানে। আলবার্ট হিমেলস্টোসের ডানপাশে দু'জনের পর দাঁড়ানো অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার ও ইভা ব্রাউনকে চিনতে পারল রানা। ছবিটা আগের জায়গায় নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল।

ছোট্ট ঘরের সবকিছুতে জমে আছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। হিমেলস্টোস মারা যাবার পর এখানে আর কেউ এসেছে বলে মনে হলো না ওর। ফাইল ক্যাবিনেটের স্লটগুলোয় ঢুকিয়ে রাখা নামের ট্যাগ পড়তে শুরু করল রানা। অক্ষর অনুযায়ী পরপর সাজানো রয়েছে সব ফাইল। দ্বিতীয় ক্যাবিনেটের মাঝামাঝি আছে

এইচ ড্রয়ার খুলে খুঁজতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল ও যা খুঁজছিল: ***হাইনরিখ, পল—কর্নেল লিউটন্যান্ট ডার ওয়্যাফেন এসএস।***

রুমাল দিয়ে ডেস্ক ও চেয়ার মুছে বসে পড়ল রানা ফাইল নিয়ে, সতর্কতার সঙ্গে, ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল লেখাগুলো। একটু পরে কোনও কোনও জার্মান শব্দ কঠিন মনে হওয়ায় লাইব্রেরি থেকে খুঁজে নিয়ে এলো একটা জার্মান-ইংলিশ ডিকশনারি।

ন্যাশনাল আর্কাইভস-এ পল হাইনরিখের মিলিটারি ক্যারিয়ার সম্বন্ধে লিমা যতটা জেনেছে, তার চেয়ে বিস্তারিত ভাবে লেখা রয়েছে আলবার্ট হিমেলস্টোসের ফাইলে। কিন্তু তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু জানা গেল না। ফাইলের পরবর্তী পঞ্চাশ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে আসামী পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য ও প্রমাণ উপস্থাপনের খসড়া। সংক্ষেপে নোট করে রাখা হয়েছে সব ক'জন সাক্ষীর বক্তব্য, আইনজ্ঞের মন্তব্য ও চূড়ান্ত ক্ষমাপ্রার্থনার মূল বক্তব্য। রানার মনে শ্রদ্ধা জন্মাল আলবার্ট হিমেলস্টোসের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নিখুঁত রেকর্ড দেখে। আসলে আগেই হেরে যাওয়া মামলা লড়ছিলেন ভদ্রলোক।

পরের বারো-চোদ্দো পৃষ্ঠা স্টেইপল্ করে আটকানো। ওগুলোতে রয়েছে ল্যান্ডসবার্গ জেলে থাকবার সময় আলবার্ট হিমেলস্টোসকে লেখা পল হাইনরিখের চিঠি। চিঠিগুলোর জবাবের কপিও রয়েছে সেইসঙ্গে। প্রথম চিঠিতে পল হাইনরিখ জানতে চেয়েছেন রায় হয়ে যাবার পর একমাস পেরিয়ে গেলেও আলবার্ট হিমেলস্টোস কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে জেলে যাননি। জবাবে হিমেলস্টোস জানিয়েছেন, লাল কোট পরা কোনও কয়েদির সঙ্গে তার নিজস্ব অ্যাটর্নি ছাড়া অন্য কারও দেখা করবার অনুমতি নেই। সেজন্যও বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। সময় করে দেখা করবেন তিনি। রানার মনে পড়ল, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিকে

সাধারণ কয়েদি থেকে আলাদা করতে সে-সময় লাল কোট পরিয়ে রাখবার নিয়ম চালু ছিল। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগে বিষ সংগ্রহ করে কয়েকজন উচ্চপদস্থ নাৎসি কর্মকর্তা আত্মহত্যা করায় অ্যাটর্নি ছাড়া অন্যদের দেখা করতে না দেয়ার নিয়ম চালু করা হয়। আমেরিকান আর্মি চায়নি তাদের জল্লাদকে ফাঁকি দিয়ে হাত ফস্কে বেরিয়ে যাক আর কোনও নাৎসি কর্মকর্তা।

পল হাইনরিখের পরের চিঠিগুলোয় বারবার অনুরোধ করা হয়েছে পিটিশনের ফলাফল জানাতে, সেইসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছে শাস্তি কমানোর কোনও ব্যবস্থা করা গেল কি না। চিঠিগুলোর জবাবে আলবার্ট হিমেলস্টোস পল হাইনরিখকে আশ্বস্ত করে লিখেছেন, পিটিশন ফাইল করা হয়েছে, ভাল কোনও খবর পেলেই জানাবেন, যেন হতাশ না হন পল হাইনরিখ। লেফটেন্যান্ট কর্নেলের শেষ তিনটে চিঠির দুটোর জবাব দিয়েছেন হিমেলস্টোস, শেষেরটার জবাব দেননি। যে-দুটোর জবাব দিয়েছেন, ওগুলোয় কয়েকটা অনুচ্ছেদ রানার বিশেষ মনোযোগ কাড়ল। ওসব জায়গায় পল হাইনরিখ লিখেছেন, কারও সঙ্গে কোনও ধরনের একটা চুক্তি হয়েছিল তাঁর। লেখাগুলোয় আবারও চোখ বুলাল রানা।

মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। আর বিশ্বাস করতে পারছি না মৃত্যুদণ্ড রদ করে শাস্তির মাত্রা কমানো হবে আমার। এটা খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এবং আমাদের চুক্তির কথা মনে করিয়ে দেবেন।

আলবার্ট হিমেলস্টোসের জবাবেও অস্পষ্ট ভাবে লেখা হয়েছে চুক্তির কথাটা।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। বিচারের

সময় আপনি আমাকে যে-ধরনের চুক্তি হয়েছে জানিয়েছিলেন, সে-ধরনের কোনও চুক্তির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তারা। আমি সত্যিই দুঃখিত, পল। তারা যে পর্যায়ে আছে, তাতে আপনার জন্য আর কিছু করবার উপায় নেই আমার।

পল হাইনরিখ তাঁর শেষ চিঠিতেও অনুরোধ করেছেন 'চুক্তিবদ্ধ' ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করবার জন্য। এ চিঠির কোনও জবাব দেননি আলবার্ট হিমেলস্টোস।

ফাইলের শেষ চিঠিটা প্রেসিডেন্ট রুযভেল্ট যাঁকে আমেরিকা অধিকৃত জার্মানি শাসনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, সেই হাই কমিশনারের অফিস থেকে দেয়া। ওটাতে অভিযোগ করা হয়েছে, আলবার্ট হিমেলস্টোস তাঁর মক্কেলের পক্ষে দক্ষতার সঙ্গে মামলা লড়তে ব্যর্থ হয়েছেন। পল হাইনরিখের পক্ষে তাদের কাছে কোনও ক্লেমেনসি পিটিশন করা হয়নি, আপিলও করা হয়নি। তারা বুঝতে পারছে না, কেন আলবার্ট হিমেলস্টোস তাঁর মক্কেল পল হাইনরিখের প্রতি দায়িত্বে এমন চরম অবহেলা করেছেন। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পল হাইনরিখ যদি ল্যান্ডসবার্গ প্রিযনের যাজকের মাধ্যমে চিঠি দিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার না করতেন, তা হলে নির্ঘাত ফাঁসি হতো তাঁর। চিঠির শেষে বলা হয়েছে, পল হাইনরিখের মামলার সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, রায়ে এঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া সম্মানিত বিচারকের অনুচিত হয়েছিল। পল হাইনরিখ তাঁর ডিপার্টমেন্টের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কোনও ভাবেই তিনি বন্দিশিবিরের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন না বিধায় আগের রায় রদ করে তাঁকে দশ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো।

বিশ্বাস করতে রানার বাধল যে আলবার্ট হিমেলস্টোসের

মতো দক্ষ একজন উকিল তাঁর মক্কেলের পক্ষে আপিল করেননি। যে-চিঠিতে আলবার্ট হিমেলস্টোস পল হাইনরিখকে লিখেছেন আপিল দাখিল করা হয়েছে, সে-চিঠিতে আবার চোখ বোলাল রানা। প্রথমবারের মতো খেয়াল করল, ফাইলে আপিলের কোনও কপি নেই। ক্যাবিনেটের 'আপিল', 'ক্লেমেনসি' ও 'পিটিশন' লেখা ড্রয়ারগুলো ঘেঁটে পল হাইনরিখের পক্ষে কোনও আপিলের কপি পেল না ও। ঠিক করল, পুরো ক্যাবিনেট খুঁজে দেখবে।

একসময় রানাকে মেনে নিতে হলো, ক্যাবিনেটের কোথাও নেই ওই আপিলের কপি। আস্তে করে চেয়ারে বসল ও। টের পেল, মাথার পিছনে দপদপ করছে ওর। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, আলবার্ট হিমেলস্টোস আপিল করেননি কেন? কোনও কারণ মাথায় এলো না ওর। যুক্তি নেই কোনও। শাস্তি কমানোর জন্য পল হাইনরিখের পক্ষে শক্ত জমিন ঠিকই তৈরি করেছিলেন হিমেলস্টোস। নিজের দৃঢ় অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভালমতই জানতেন তিনি! তা হলে?

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। এ-ঘরে আসবার পর দু'ঘণ্টারও বেশি পেরিয়ে গেছে। সান-রুমে ফিরে যাবে ঠিক করেও হঠাৎ ওর মনে পড়ল, ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খুঁজে দেখা হয়নি।

উপরের দুটো ড্রয়ার একদম খালি, তবে শেষ ড্রয়ারে এলোমেলো ভাবে রাখা আছে অনেকগুলো নোট প্যাড, কলম, পেন্সিল, একটা স্ট্যাপলার, একটা টোবাকো পাউচ ও দুটো পাইপ।

নোট প্যাডগুলোয় কিছু লেখা নেই দেখে উঠে পড়ল রানা, জার্মান-ইংলিশ ডিকশনারিটা নিয়ে কিউবিকল ছেড়ে চলে এলো লাইব্রেরিতে। ডিকশনারিটা নির্দিষ্ট শেলফে রাখতে গিয়ে পাশের কিছু চামড়া বাঁধানো মোটা বই নজর কাড়ল ওর। বইগুলোতে লেবেল আছে, লেবেলে বছর উল্লেখ করা হয়েছে টাইপ করে। ১৯৩৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সমস্ত বই থেকে ১৯৩৩-১৯৩৫

লেখা প্রথম বইটা কৌতূহলবশত বের করে খুলল রানা। চমকে গেল প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে। তাড়াতাড়ি ওটা রেখে খুঁজে বের করল লেবেলে ১৯৪৭-১৯৪৯ টাইপ করা ডায়রিটা। সামান্যতম অপরাধ-বোধ হলো না ওর আলবার্ট হিমেলস্টোসের ব্যক্তিগত ডায়রিতে চোখ বুলাতে।

প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংক্ষেপে লিখে রেখেছেন আলবার্ট হিমেলস্টোস, সেইসঙ্গে রয়েছে সেসব বিষয়ে নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য।

লাইব্রেরির একটা চেয়ারের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ডায়রি হাতে বসে পড়ল রানা, দ্রুতহাতে পৃষ্ঠা উল্টে চলে গেল পল হাইনরিখের বিচারকালীন সেই তারিখগুলোয়।

উনিশ মাস ধরে চলেছিল মামলা। আলবার্ট হিমেলস্টোসের লেখায় উঠে এসেছে, সে-সময়ের বড় সমস্যা ছিল পল হাইনরিখের পক্ষে চরিত্রে দাগহীন নিরপরাধ সাক্ষী জোগাড় করা। একটা পৃষ্ঠার শিরোনাম: আগস্ট এগারো, উনিশশো সাতচল্লিশ। এই পৃষ্ঠায় পেয়ে গেল রানা, যা খুঁজছিল।

ওই তারিখে পল হাইনরিখের মামলার রায় হয়। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় পল হাইনরিখকে। এ বিষয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আলবার্ট হিমেলস্টোস, তারপর একটা অনুচ্ছেদে লিখেছেন:

আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসার জর্জ গ্রুসাক আমাকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, জার্মানির কতবড় সর্বগ্রাসী পরাজয় হয়েছে। আমি কখনোই ভাবিনি এসএস রাইখসফুয়েরার ও তাঁর স্টাফদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্কের কথা গোপন থাকবে, কিন্তু তথ্যটা এভাবে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করাটাকে চরম নিষ্ঠুর নীচতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা

হয়েছে, তা যদি সত্যিও হয়, তবু অনেক কম শাস্তি প্রাপ্য ছিল তাঁর। অথচ তাঁর শাস্তি কমাবার জন্য সামান্যতম চেষ্টা করবার আর কোনও উপায় রইল না আমার। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করা হলে কিছুতেই সইতে পারব না আমি। অথচ সেই হুমকিই দিয়ে গেল লোকটা। লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখকে নেকড়ের মাঝখানে ফেলে দিতে হচ্ছে আমাকে। কার কাছে সুবিচার আশা করব? কেউ শুনবে না আমার কথা। কেউ গ্রাহ্যই করবে না। পিতৃভূমি আজ সত্যিই পরাজিত। আমরা দুর্বল, অসহায়।

বছরের বাকি দিনগুলোয় চোখ বুলিয়ে দেখে গেল রানা, ডায়রিতে আরও দু'বার লেখা হয়েছে জর্জ গ্রুসাকের আগমনের কথা। আলবার্ট হিমেলস্টোস তিক্ততার সঙ্গে লিখে রেখে গেছেন, কীভাবে তাঁকে হুমকি দিয়েছে লোকটা: পল হাইনরিখের ফাঁসি ঠেকানোর চেষ্টা করুন, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তোলা হবে আপনার বিরুদ্ধে। আরেক জায়গায় লিখেছেন, সিল করা এনভেলপটা পল হাইনরিখের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। লেফটেন্যান্ট কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে জানাননি ওটা হিল্ডা ক্যান্টোরেক দিয়েছেন। বলেছেন, গোপন সূত্র থেকে পেয়েছেন।

উনিশশো আটচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে হাই কমিশনার পল হাইনরিখের মৃত্যুদণ্ড রদ করে দশ বছরের কারাদণ্ড দেন, এ বিষয়ে একটা এন্ট্রি আছে ডায়রিতে। স্বস্তি প্রকাশ করেছেন আলবার্ট হিমেলস্টোস, প্রশস্তি গেয়েছেন স্রষ্টার।

কৌতূহলী হয়ে উনিশশো পঞ্চান্ন সালের ডায়রিতে চোখ বোলাল রানা। এ বছরই ল্যান্ডসবার্গ জেল থেকে মুক্তি পান পল হাইনরিখ।

সদ্যমুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেখা করতে এসেছিলেন, এক জায়গায় লিখেছেন হিমেলস্টোস। তাঁকে তিনি খুলে বলেন

কীভাবে হুমকির মুখে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। পল হাইনরিখ ব্যাপারটা বোঝেন এবং ক্ষমা করেন তাঁকে। পরের অনুচ্ছেদে জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্রমার ওয়েবলিং-এর নাম উল্লেখ করেছেন হিমেলস্টোস। লিখেছেন, পল হাইনরিখ তাঁদের সন্তানদের ব্যাপারে তাঁর কাছে খোঁজ করেছিলেন। কারণটা উল্লেখ করেননি।

ডায়রির বাকি পাতাগুলোয় অন্য প্রসঙ্গে নানান কথা লেখা রয়েছে। আগের ডায়রিতে মামলা চলাকালীন সময়টা আবার পড়ল রানা। না, কোথাও রহস্যময় সেই চুক্তির কথা লেখা নেই। হয় আলবার্ট হিমেলস্টোস ওই চুক্তির বিষয়টা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন, নয়তো কোনও কারণে ডায়রিতে ও নিয়ে কিছু লেখা সঙ্গত মনে করেননি।

ডায়রিগুলো শেলফে রেখে, চেয়ারটা আবার চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে সান-রুমে চলে এলো ও।

রানাকে দেখেই ফ্রাউ হিমেলস্টোসের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ পড়ল। 'কোনও কাজে এলো আমার আলবার্টের ফাইল?'

'জী,' বলল রানা। 'আপনার স্বামী নিখুঁত রেকর্ড রেখে গেছেন।'

'তা হলে ওই মামলায়...'

'উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু নেই,' বৃদ্ধার মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। 'শুধু বুঝলাম, হের হিমেলস্টোস সত্যি খুবই দক্ষ অ্যাটর্নি ছিলেন।'

'আমারও তা-ই ধারণা, তা-ই ছিল ও,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধার কুঞ্চিত চেহারা, বেড়ে গেল মাথার কাঁপুনি। 'খুব ভাল জার্মান ছিল আমার আলবার্ট।'

'জী।' লিমার দিকে চট্ করে তাকাল রানা, তবে বলল না কিছু।

ফ্রাউ হিমেলস্টোসের হাসিতে গর্ব ঝরল, 'আশা করি লাইব্রেরি

অগোছাল রেখেছি সে-অপরাধটা ক্ষমা করবে তুমি, হের রানা। আলবার্ট মারা যাবার পর থেকে ওখানে যেতে খুব কষ্ট হয় বলে গুছিয়ে রাখতে পারিনি। ওই ঘরটাই ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় ঘর। ওখানে জড়িয়ে আছে ওর অনেক স্মৃতি।'

'আমি বুঝেছি,' নরম স্বরে বলল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাল: 'জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিংকে চিনতেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই,' মাথার উপর-নীচ কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল ফ্রাউ হিমেলস্টোসের। 'সত্যিকারের বীর যোদ্ধা ছিলেন দু'জন। মানুষও খুব ভাল ছিলেন। আমার আলবার্টের সঙ্গে সম্পর্ক খুব ভাল ছিল ওঁদের। ...জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ধরা পড়ে যাচ্ছেন বুঝে আত্মহত্যা করেছিলেন। জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিংকে ফাঁসি দেয়া হয়।'

'তাঁদের ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকে সেটা জানেন কি?'

'মিউনিখে, দুই জেনারেলের আদি নিবাসে। একই স্ট্রিটে বাড়ি ছিল জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস আর জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিঙের। মুলার স্ট্রিট-এ। ...বিস্কিট?' চেয়ারের পাশের ছোট একটা টেবিলের দিকে ইশারা করলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, 'নাকি স্যান্ডউইচ দেব? তোমার দেরি দেখে আমি আর ফ্রয়লাইন সোরেনসন লাঞ্চ সেরে ফেলেছি।'

বৃদ্ধাকে কষ্ট দিতে চাইল না রানা। 'বিস্কিট, ধন্যবাদ,' বলে বসে পড়ল লিমার পাশে, সোফায়।

বিস্কিটের প্লেট এগিয়ে দিয়ে কাঁপা সুরে ক্ষমা-প্রার্থনা করে কিচেনে চলে গেলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস নতুন করে কফি নিয়ে আসতে। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই রানার পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো দিল লিমা। 'ফ্রাউ হিমেলস্টোস দুর্দান্ত একটা তথ্য দিয়েছেন আমাকে। যে মহিলা...'

কফি পট হাতে বৃদ্ধা আবার ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল ও।

রানাকে কফি ঢেলে দিয়ে লিমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। প্রসঙ্গের যেন কোনও শেষ নেই তাঁর। কোনও একটা প্রসঙ্গ পুরনো হয়ে গেলেই নতুন প্রসঙ্গ তুলছেন। একটু পর রানা বুঝতে পারল, ভদ্রমহিলা রীতিমত ভয় পাচ্ছেন, আবার তাঁকে একাকীত্বে তলিয়ে দিয়ে শীঘ্রি চলে যাবে ওরা।

আড়াই ঘণ্টা পর শেষপর্যন্ত ম্যানশনের সদর দরজায় হাজির হতে পারল রানা ও লিমা, বারবার ধন্যবাদ দিল ওরা ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে তাঁর আতিথেয়তার জন্য, কথা দিল, সময় পেলেই আবার আসবে বেড়াতে। পরিবেশে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগল—ফ্রাউ হিমেলস্টোস বুঝলেন, রানা ও লিমা আবার আসবার কথা বললেও আসা হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না আর ওদের পক্ষে।

গাড়ি স্টার্ট নেবার পরেও দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, মাথাটা কাঁপছে উপর-নীচে। পাল্টা হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় জানাল লিমা। ও জানে, প্রথম দেখায় বৃদ্ধাকে যতটা বিষণ্ণ মনে হয়, ততটা তিনি নন। অতীতের চমৎকার সব স্মৃতি রয়েছে তাঁকে সঙ্গ দিতে। বেশ কয়েকজনকে চেনে লিমা, যারা ওরকম স্মৃতি পাবার বদলে নিজেদের সর্বস্ব দিতেও দ্বিধা করবে না।

ড্রাইভওয়ের বাঁক ঘুরে জংলা পথে রওনা হয়ে রানা বলল, 'ফ্রাউ হিমেলস্টোস কিচেন থেকে ফেরার আগে কী যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি।'

কথাটা শুনে বাস্তবে ফিরল লিমা। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল দুপুরটা মাটি হয়নি—ভুল হচ্ছে আমার?'

'না।'

'ফ্রাউ হিমেলস্টোসের কাছ থেকে কী জেনেছি জানো? ওঁর মনে পড়ে কি না দেখতে পল হাইনরিখের অ্যাড্রেস বুকে পাওয়া

ছবিটা দেখিয়েছিলাম। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে মিউনিখে তোলা হয়েছিল যেটা। ইউনিফর্ম পরে ছিলেন পল হাইনরিখ, সঙ্গে ছিল সুন্দরী এক যুবতী।'

'হুঁ।'

'ওই যুবতীকে চিনতেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। উনি হিল্ডা ক্যান্টোরেক, ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের বোন!' চট করে রানাকে দেখে নিল লিমা। 'তা হলে পাওয়া গেল ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের সঙ্গে পল হাইনরিখের সম্পর্কের ভিত্তি। ফ্রাউ হিমেলস্টোস আমাকে বলেছেন: পল হাইনরিখের মামলার রায় হয়ে যাবার পরপরই তাঁর স্বামীর সঙ্গে এসে দেখা করেছিলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, অনুরোধ করেছিলেন, যেন ল্যান্ডসবার্গ প্রিযনে পল হাইনরিখের সঙ্গে তাঁর দেখা করবার ব্যবস্থা করে দেন আলবার্ট হিমেলস্টোস। উকিল ভদ্রলোক তাঁকে জানান, সেটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়, অনুমতি পাওয়া যাবে না কিছুতেই। খুব স্বল্প সময়ের জন্যে এসেছিলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, মাস দেড়েক পরে হতাশ হয়ে আমেরিকায়, ভাইয়ের কাছে চলে যান। ফ্রাউ হিমেলস্টোসের তাঁকে মনে রয়ে গেছে, কারণ ক্যান্টোরেক পরিবার ছিল সে-সময়ে জার্মানির অভিজাত ধনী পরিবারগুলোর একটা।' সিটে খানিকটা ঘুরে বসল লিমা। 'এবার বলে ফেলো, রানা, কী জেনেছ তুমি।'

সংক্ষেপে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাদ না দিয়ে বলল রানা।

ওর কথা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করল লিমা। 'বিচার শুরু হবার আগে পল হাইনরিখকে জেরা করেন জর্জ গ্রুসাক, হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ছিলেন বিপক্ষের উকিল, আর জাজ লিউট হ্যামিলটন গেটসবি ছিলেন সেই তিনজন জাজের প্রধান, যাঁরা পল হাইনরিখকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলেন। রানা, এর সঙ্গে তুমি যদি বিচারের রায় হয়ে যাবার পর আলবার্ট হিমেলস্টোসকে দেয়া জর্জ গ্রুসাকের হুমকি যোগ করো, তা হলে এটা ধরে নেয়া ছাড়া উপায় নেই, হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, লিউট

হ্যামিলটন গেটসবি আর জর্জ গ্রুসাক চেয়েছিলেন পল হাইনরিখ যেন অবশ্যই ফাঁসিতে ঝোলেন।'

'তা হলে আবার তুমি ফিরে যাচ্ছ প্রতিশোধের থিওরিতে,' বলল রানা। 'কোড়ে নামগুলো লেখা হয়েছিল প্রতিশোধস্পৃহা থেকে।'

'হ্যাঁ,' একটু ম্লান হলো লিমার কমনীয় মুখশ্রী।

'প্রতিশোধ অনেক রকম হয়,' একটু পর বলল রানা। 'এপর্যন্ত আমরা শুধু ভেবেছি, জেলে পাঠানো হয়েছিল বলে ওই লোকগুলোকে খুন করতে চেয়েছিলেন পল হাইনরিখ। কিন্তু এমনও হতে পারে, ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা করায় পল হাইনরিখ এতগুলো বছর ধরে প্রতিশোধ নিচ্ছিলেন ওই তিনজনের ওপর। ওই তিনজন মারা যাবার পর ব্ল্যাকমেইল করছিলেন তাদের উত্তরসূরীদের। তা যদি হয়, তা হলে পল হাইনরিখের বাড়িতে চার্লিকে পেয়ে খুন করে ফেলবার ব্যাপারটা খানিকটা হলেও ব্যাখ্যা করা যায়। এমন হতেই পারে, জেসন ট্রটম্যান আর ব্রিম হার্টসেলকে পল হাইনরিখের বাড়ি খুঁজে দেখতে পাঠানো হয়েছিল, যাতে ব্ল্যাকমেইলিঙ সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করে দেয়া যায়।' কঠোরতার ছাপ পড়ল রানার চেহারায়। 'আর চার্লি সে-সময় উপস্থিত হয়েছিল ওখানে।'

'ধরে নিচ্ছ, কোডে যাদের নাম আছে, তাদের ব্ল্যাকমেইল করছিলেন পল হাইনরিখ?'

মাথা সামান্য দোলাল রানা।

আপত্তির সুরে বলল লিমা, 'কিন্তু একজন নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে অযথা ফাঁসি দিতে চাইবেন কেন আমেরিকান এক ইন্টেলিজেন্স অফিসার, বিপক্ষের উকিল বা কোনও বিচারক? এমন কোনও প্রমাণ নেই যে যুদ্ধের আগে এঁরা তিনজন চিনতেন পরস্পরকে। বিচারের কাজ শুরু হবার আগে পল হাইনরিখকেও চিনতেন না এঁরা কেউ। বিশ্বযুদ্ধ শেষে নাৎসি-বিরোধী মনোভাব

প্রবল ছিল ধরে নিয়ে যদি এটা মেনেও নিই, কোনও জাজ বিদ্বেষবশত একজন নাৎসি কর্মকর্তাকে চরম শাস্তি দিতে চেয়েছেন... কিন্তু একজন ওএসএস এজেন্ট আসামী পক্ষের উকিলকে হুমকি দেবেন, এটা মেনে নিতে হলে আমাকে রীতিমত কষ্টকল্পনা করতে হবে।' চিন্তিত চোখে রানাকে দেখল লিমা। 'আর ব্ল্যাকমেইল থিওরির কথা যদি বলো, কী দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতেন পল হাইনরিখ? গোপন কী জানা ছিল বন্দি একজন নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের যে, তাঁকে ওরকম অন্যায়ভাবে ফাঁসি দিতে চেষ্টা করা হবে? এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে তাঁর কাছে এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ ছিল, যেটার কারণে এতদিন পরেও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক বা জাস্টিস স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবির মতো সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিকের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।'

গাড়ির গতি কমাল রানা, বাঁক ঘুরে বড় রাস্তায় পড়ল, তারপর বলল, 'পল হাইনরিখ আর আলবার্ট হিমেলস্টোস তাঁদের চিঠিতে যে রহস্যময় চুক্তিটার কথা লিখেছেন, ওটা নিয়ে ভাবা দরকার আমাদের। বোঝা যাচ্ছে, শাস্তি কমানোর জন্য কারও সঙ্গে কোনও ধরনের চুক্তি করেছিলেন পল হাইনরিখ। এবং করেছিলেন সম্ভবত এজেন্ট গ্রুসাক, প্রসিকিউটর ক্যাসল ও জাজ গেটসবির সঙ্গে।'

'এবং তাঁরা সুবিধে গ্রহণ করলেও শেষপর্যন্ত কথা রাখেননি,' রানার বক্তব্য আন্দাজ করে নিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে বলল লিমা। 'বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু হতেও পারে।' একটু থেমে আনমনে জিজ্ঞেস করল ও, 'অন্য কোনও মামলায় সাক্ষী হয়েছিলেন পল হাইনরিখ?' জবাবটা নিজেই দিল, 'হয়েছিলেন। ন্যাশনাল আর্কাইভসের ডকুমেন্টে দেখেছি, ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালে এসএস তৎপরতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন তিনি। তবে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানাননি। তাঁর অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করা ছিল ডকুমেন্টে। যদি টোপ ফেলা হতো যে সহযোগিতা করলে শাস্তি কমানো হবে তাঁর, তা হলে বোধহয় অসহযোগিতা করতেন না ভদ্রলোক।'

'হোটেলে ফিরে ল্যান্ডসবার্গ প্রিযনে ফোন করতে হবে,' বলল রানা। 'হাই কমিশনে যে যাজকের মাধ্যমে পল হাইনরিখ তাঁর চিঠি পাঠিয়েছিলেন, উনি বেঁচে থাকলে হয়তো এ-ব্যাপারে বলতে পারবেন কিছু।'

'ঠিক!' ড্যাশবোর্ডে চাপড় মারল লিমা, প্রশংসার দৃষ্টিতে রানাকে দেখে নিল চট্ করে। 'চিন্তাটা আমার মাথায় আসেইনি!'

'হোটেলে ফেরার আগে মুলার স্ট্রিটে যাব আমরা,' বলল রানা। 'জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিঙের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইব পল হাইনরিখ সম্বন্ধে কী জানে তারা। ছুটির দিন, বাড়িতেই পাব হয়তো তাদের।'

'গুড,' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল লিমা। 'চলো।'

মুলার স্ট্রিট মিউনিখ শহরের উত্তরপ্রান্তে, অভিজাত শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট এলাকাগুলোর একটায়। চওড়া রাস্তার দু'পাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ডিযাইনে তৈরি বাগানসমেত প্রকাণ্ড বাড়িগুলো দেখবার মতো। যুদ্ধশেষে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে সব।

মিউনিখের মানচিত্র দেখে মুলার স্ট্রিট খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হলো না রানার। মুলার স্ট্রিটে ঢুকবার মুখে বাঁ দিকের বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ওরা জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবলিংঙের বাড়ির ঠিকানা।

ওয়েবলিঙদের বাড়িটা আগে পড়ে, রাস্তার ডানদিকে প্রাচীন শ্যাতোর মতো ভবনটা সাজানো বাগানে ঘেরা। রট আয়ার্নের ফটক থেকে বেঁকে চলে গেছে ড্রাইভওয়ে, ছোট একটা পরিখা

পেরিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির গাড়ি-বারান্দায়। কলিংবেল টিপে বাড়ির ভিতরে কোথাও থেকে কোকিলের মিষ্টি কুহু-কুহু ডাক শুনতে পেল রানা।

আধমিনিট পর মেহগনি কাঠের নক্সা করা দরজাটা খুলে গেল, বাটলারের পোশাক পরা এক লম্বা, কুঁজো লোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানা ও লিমার দিকে।

নিজেদের নাম বলল রানা, আমেরিকান সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিল, তারপর বলল, 'হের ওয়েবলিঙের কাছে এসেছি আমরা, উনি কি বাড়ি আছেন?'

'খুব জরুরি দরকার,' তাগাদার সুরে যোগ করল লিমা।

'উনি সপরিবারে দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে গেছেন, ফ্রাউ... ফ্রয়লাইন সোরেনসন,' লিমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতেই জানাল বাটলার। লিমাকে রানার স্ত্রী বলে ধরে নিতে গিয়েও নামের পার্থক্যটা মনে পড়ায় সামলে নিল সে। দুঃখ-দুঃখ ভাব তার চেহারায়। 'আগামী মাসে ফিরবেন। ...কী করতে পারি আমি আপনাদের জন্যে? ...বসুন ...চা বা কফি?'

'না, ধন্যবাদ,' ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখানোর হাত থেকে বুড়ো বাটলারকে রেহাই দিল লিমা। 'যদি হের ওয়েবলিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই আমরা, তা হলে কীভাবে যোগাযোগ করতে পারব? তাঁর ঠিকানা দেয়া যাবে কি?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে পকেট থেকে ছোট্ট একটা প্যাড ও বলপয়েন্ট কলম বের করল ও, বাটলারের বলা ঠিকানাটা লিখে নিল দ্রুত হাতে। 'অ্যাডলফাস রেসিডেন্সে হের অ্যাডলফাসকে পেলে হয়,' বলল ড্রাইভওয়ে ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ে।

চার বাড়ি পরেই উল্টোদিকে পড়ল একশো আটত্রিশ নম্বর মুলার স্ট্রিট। এবার কোনও বাটলার খুলল না দরজা, পাকা আপেলের মতো লাল চেহারার এক মধ্যবয়স্ক লোক চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ওদের দিকে। রানাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে বলে

মনে হলো না। কারণটা সম্ভবত গায়ের চামড়ার রং।

'লিমা সোরেনসন,' তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল লিমা। 'ইনি মিস্টার মাসুদ রানা। সাংবাদিক আমরা। আমেরিকা থেকে এসেছি। ...আপনিই কি হের অ্যাডলফাস?'

'জী,' শুদ্ধ উচ্চারণে জানালেন ভদ্রলোক। দরজা থেকে সরলেন না। 'বলুন?'

ভুবন ভোলানো হাসি হাসল লিমা। 'বিশেষ দরকারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমরা, আপনার সময় হবে কি?'

সন্দেহের ছাপ পড়ল হের অ্যাডলফাসের নীল স্বচ্ছ চোখে। 'কী ব্যাপারে প্রশ্ন?'

'এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের ব্যাপারে,' হাসিটা মুছল না লিমার ঠোঁট থেকে। 'তাঁকে বোধহয় চিনতেন আপনি?'

ইতস্তত করলেন ভদ্রলোক, তারপর একপাশে সরে দাঁড়ালেন। 'আসুন।'

হল পেরিয়ে রানা ও লিমাকে লিভিংরুমে নিয়ে এলেন তিনি, বসতে ইশারা করলেন সোফায়। ওরা বসবার পরেও নিজে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'হের হাইনরিখের ব্যাপারে কী জানতে চান?'

'ওঁকে চিনতাম আমি,' মুখ খুলল রানা। 'ভদ্রলোক মারা গেছেন। ওঁর মৃত্যু নিয়ে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, যে-কারণে আপনার সাহায্য কাজে আসতে পারে বলে ভাবছি আমরা।'

'মারা গেছেন উনি!' সত্যিকারের দুঃখের ছাপ পড়ল হের অ্যাডলফাসের চেহারায়, আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি, বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাদের পরিবারের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন ওঁদের পরিবার। উনি না থাকলে...' থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, কী জানতে চান?'

'উনিশশো পঞ্চান্ন সালে জেল থেকে বের হন উনি,' বলল লিমা। 'তারপর আপনার সঙ্গে উনি দেখা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'জটিলতা ওই সময়ের কিছু ব্যাপারেই দেখা দিয়েছে, হের অ্যাডলফাস,' বলল রানা। 'একটু খুলে বলবেন কি, উনি কেন দেখা করতে এসেছিলেন?'

'সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে, সেইসঙ্গে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে,' রানা ও লিমাকে চমকে দিয়ে বললেন হের অ্যাডলফাস। 'জেলে থাকায় আমাদের দেখ-ভাল করতে পারেননি বলে বারবার দুঃখ-প্রকাশ করেছিলেন হের হাইনরিখ।'

'ঠিক বুঝলাম না,' নোট প্যাডে তথ্যটা টুকে নিল লিমা।

'খুব দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিলাম তখন আমরা,' নিচু স্বরে বললেন হের অ্যাডলফাস। 'বাবা-মা নেই, আমি আর আমার ছোটবোন অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। সামান্য সরকারী বৃত্তি ছাড়া আর কোনও উপার্জন ছিল না আমাদের। সমস্ত জার্মানিতে তখন অস্থির একটা অবস্থা। কোনও কোনও দিন তিনবেলা খাবারও জুটত না আমাদের দু'জনের। ...হের হাইনরিখ যখন দেখা করতে এলেন, তখন ছোট্ট একটা দোকানে কেরানির চাকরি করে কোনওমতে টিকে আছি আমরা দু-ভাইবোন।' থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

'তারপর?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল লিমা।

'হের হাইনরিখ জানালেন, আমার বাবা প্রচুর টাকা রেখে গেছেন আমাদের কথা ভেবে। এতদিন সে-টাকা আমাদের দিতে পারেননি বলে বারবার দুঃখ-প্রকাশ করলেন। ছ'মাস অনায়াসে সচ্ছল ভাবে চলার মতো ডয়েশ মার্ক দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন উনি। যাবার আগে বলে গেলেন, এখন থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের সাত তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পৌঁছে যাবে আমাদের কাছে। শুধু আমাদের কাছেই না, ওয়েবলিং

পরিবারের কাছেও এই একই কথা বলেছিলেন তিনি।'

সামনে ঝুঁকল লিমা, নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'সে-টাকা পৌঁছাত কি?'

'পৌঁছুত।'

'টাকার অঙ্কটা বলবেন কি?'

'একেক পরিবারের জন্যে এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার।'

'জী?' থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল লিমা।

'এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার,' আবারও বললেন হের অ্যাডলফাস। 'ভুল শোনেননি আপনি। প্রতি বছর উপহারের প্যাকেটে এসেছে টাকাটা। এ-বছরেও এসেছে। অথচ আমি ভাল করেই জানি, আমার বাবা এত টাকা তাঁর কাছে রেখে যাননি। জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁকে, এত টাকা উনি কেন দিচ্ছেন। উনি বলেছিলেন, জেলে থাকার সময় সাহায্য করতে পারেননি বলে অপরাধবোধে ভুগতেন, টাকাগুলো যেন আমরা তাঁর স্নেহের উপহার হিসেবে নিই। এ-ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে দেননি তিনি আমাদের, সস্নেহ ধমকের সুরে বলেছিলেন, যতদিন তিনি বেঁচে আছেন, ও-টাকা নিতেই হবে আমাদের।'

হের অ্যাডলফাস থেমে যাবার পরেও কথা বলল না রানা ও লিমা। ঘরের নীরবতায় যেন ঘুরে ফিরছে কথাগুলোর রেশ। তারপর আবার নীরবতা ভাঙলেন হের অ্যাডলফাস। 'তাঁর মৃত্যু নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে বলছিলেন আপনারা, কী ধরনের জটিলতা দেখা দিয়েছে?'

রানার দিকে তাকাল দ্বিধান্বিত লিমা। রানা বলল, 'ওঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল কয়েকজন প্রভাবশালী আমেরিকানের, তারা ওঁর কাছে গচ্ছিত কিছু তথ্য কেড়ে নেয়ার জন্যে খুন-জখম শুরু করেছে।'

'তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করে আর্টিকেল লেখার দায়িত্ব পড়েছে আমাদের ওপর,' নড়েচড়ে বসে বলল লিমা।

উদ্বেগের ছাপ পড়ল হের অ্যাডলফাসের চেহারায়। 'হের হাইনরিখ বে-আইনী কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তো?'

'না,' অন্তরের কথাটা দৃঢ়তার সঙ্গে বের হলো রানার মুখ দিয়ে: 'যা উচিত, তা-ই করেছেন শুধু উনি।'

'শুনে ভাল লাগল,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জার্মান ভদ্রলোক। 'হের হাইনরিখকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি আমরা।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'ওঁর ব্যবসায় কোনও জটিলতা ছিল না কখনও, সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

উঠল লিমাও। রানার সঙ্গে হাত মেলালেন হের অ্যাডলফাস, মনে হলো না রানার গাত্রবর্ণ তাঁর মনে আর কোনও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

বিদায় নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো রানা ও লিমা, হোটেলের দিকে রওনা হয়ে লিমা বলল, 'ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের নামের পাশে মৃত লেখেননি পল হাইনরিখ, কাজেই ধরে নিতে পারি, হিল্ডা ক্যান্টোরেক বেঁচে না থাকলেও উনি বেঁচে আছেন। তুমি হয়তো ঠিকই বলেছিলে, রানা, ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক বোধহয় আরও বিস্তারিত ভাবে সব বলতে পারবেন আমাদের।'

'যদি উনি বলতে চান; না চাইবার সম্ভাবনাই বেশি,' লিমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল রানা। 'অন্যদের মতো তাঁকেও বোধহয় ব্ল্যাকমেইল করছিলেন পল হাইনরিখ।'

'কারণটা কী হতে পারে?'

'জানি না।' একটু চুপ করে থেকে রানা বলল, 'তা হলে, এরপর সোজা লং আইল্যান্ডের অয়েস্টার বে?'

'সোজা লং আইল্যান্ডের অয়েস্টার বে,' মাথা দোলাল লিমা। 'আগামীকালকের ফ্লাইটেই নিউ ইয়র্ক ফিরছি আমরা। আর... আগামীকালই বোধহয় খুলে যাচ্ছে সব রহস্যের জট।'

'হিল্ডা ক্যান্টোরেকের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার বোধহয়,' বলল রানা. 'পল হাইনরিখের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ছিল

সেটা জানতে পারলে ভাল হয়। হিল্ডা ক্যান্টোরেকও হয়তো নাৎসি কর্মকর্তা ছিলেন।'

'মহিলা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যেতে পারে কোথায়?' রানার দিকে তাকাল লিমা। নিজেও জানে না, কখন থেকে রানার উপর ভরসা করতে শুরু করেছে।

'লুডভিগসবার্গ-এর গভর্নমেন্ট অফিসে খোঁজ নিলে জানা যাবে, যদি জানার মতো কিছু থাকে।'

'তা হলে বরং চলো, ওখান থেকে একবার ঢুঁ মেরে আসি,' হাসল লিমা। 'দেখা যাচ্ছে তুমি না থাকলে অকূল-পাথারেই পড়তাম আমি!'

লিমার শেষ কথাগুলো শুনতে পেল না রানা, মানচিত্রে চোখ রেখে লুডভিগসবার্গ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ও।

রেকর্ডকৃত কথাগুলো শোনার পর জেসন ট্রটম্যানের দিকে তাকাল ব্রিম হার্টসেল। 'কী বুঝলে?'

'আমি সফল,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ট্রটম্যান, চুমুক দিল স্কচ হুইস্কি ভরা গ্লাসে।

'হ্যাঁ, মেয়েটার ভ্যানিটি ব্যাগে ট্র্যান্সমিটার রাখার বুদ্ধিটা ভাল ছিল,' বলল হার্টসেল। 'বুদ্ধিটা আমার হলেও জিনিসটা রেখেছ তুমি, কাজেই তুমি সফল।' ফোনের কাছে চলে গেল সে, তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টে আবার তাকাল ট্রটম্যানের দিকে। 'ভাবছি মিস্টার ক্যাসলের সঙ্গে যোগাযোগ না করে যা করবার আমরা করলেই ভাল হয়।'

চুপচাপ পছন্দের মানুষটার দিকে ভক্তিভরে তাকিয়ে থাকল জেসন ট্রটম্যান।

'মিস্টার ক্যাসলের দুর্বলতাটা এখন জানি আমরা,' বলল হার্টসেল। 'এ থেকে কী ধরনের সুবিধা আদায় করা যায়, সেটা ভালমত ভাবা যাবে পরে, তার আগে দরকার বিপদ থেকে তাঁকে

উদ্ধার করা। গাছ মরে গেলে ফল পাব না আমরা। এরা দুজন উল্কার মত ছুটছে, কবর খুঁড়ে বের করছে একের পর এক...'

'সোজা কথায় আমাকে কী করতে হবে বলে ফেলো, হার্টি,' অনুযোগের সুরে বলল ট্রটম্যান।

'জার্মানির সিআইএ স্টেশনে বেশ অনেকদিন ছিলে তুমি।' পায়চারি শুরু করল হার্টসেল। 'আমাকে বহুবার বলেছ, জার্মান আন্ডারগ্রাউন্ডে পরিচিত অনেক লোক আছে তোমার। ভাবছি তাদের কাজে লাগানো যায় কি না।'

উত্তেজনায় চকচক করে উঠল ট্রটম্যানের চোখ। '...কীভাবে? ...কী করতে চাইছ আসলে?'

'আপাতত মিস্টার ক্যাসলের নির্দেশ মানব আমরা। নিজেরা করব না কিছুই, যা করবার করাব জার্মান খুনিদের দিয়ে। সোজা কথায়, মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসনকে ঝাঁঝরা করে দেবে তারা। তারপর নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিয়ে মিস্টার ক্যাসলকে শোনাব ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে রেকর্ড করা কথাগুলো। মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসন যা বলেছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়ে থাকে; ধরে নাও, ট্রটি, অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্সের বিলিয়ন ডলার মুনাফার বড় একটা অংশ আমাদের হয়ে যাচ্ছে।'

'ওই মেয়েটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল আমার,' জিভ দিয়ে পুরু ঠোঁট দুটো চাটল জেসন ট্রটম্যান। 'ওকে কয়েকটা দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না? খুব মজা হতো।'

'লাখ লাখ ডলার যখন তোমার হাতে থাকবে, তখন মিস্টার ক্যাসলের ওই মিস-আমেরিকা-টাইপ রক্ষিতাটার মতো কয়েক হালি সুন্দরী তুমি চাইলেই পাবে,' সান্ত্বনা দিল হার্টসেল।

'আচ্ছা,' একটু দ্বিধা প্রকাশ পেল ট্রটম্যানের কণ্ঠে। 'তা হলে খুন করাতে হবে ওদের, এই তো?'

'নাইন এমএম লুগার ব্যবহার করে, এমন অন্তত চারজনকে ভাড়া করবে তুমি। টার্গেট কোনওমতেই যেন বাঁচতে না পারে।

...মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসনের চেহারার বর্ণনা দিতে হবে না তোমাকে, এই ছবি দুটো তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ো।' কোটের পকেট থেকে দুটো পাসপোর্ট সাইয ছবি বের করল ব্রিম হার্টসেল। 'তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে, তখন বেরিয়েছিলাম আমি, ওদের সুইটে ঢুকে পাসপোর্ট থেকে তুলে এনেছি ছবিগুলো। ...যা-ই হোক, এই দু'জনকে হোটেল থেকে বের হতে দেবে তোমার লোকরা, তারপর গাড়িতে ওঠার আগ-মুহূর্তে ফায়ার ওপেন করবে। কাল সকালে প্যান অ্যাম-এর নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট আছে, আমার ধারণা, ওটাতেই ফিরতে চাইবে রানা-লিমা। কাজেই ওদের জানিয়ে দিয়ো, সকাল থেকে হোটেলের বাইরে তৈরি থাকতে যেন ভুল না করে।'

'ইয়েস, বস্!' হুইস্কির গ্লাসটা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রেখে ছবি দুটো নিল জেসন ট্রটম্যান, জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়ে জানতে চাইল, 'এখনই রওনা হয়ে যাই?'

'না, একটা কাজ আছে,' চিন্তিত চেহারায় আয়নায় নিজেকে দেখল হার্টসেল। 'আগে উকিলের ওই ডায়েরিটা হাতে পাওয়া দরকার। ওটা বিরাট একটা প্রমাণ। ভবিষ্যতে ওই প্রমাণটা কাজে লাগবে আমাদের।' ঘড়ি দেখল সে। 'হাতে সময় আছে অনেক, আলবার্ট হিমেলস্টোসের বাড়ি থেকে ফিরেও খুনি ভাড়া করতে পারবে তুমি। ...তারপর যদি চাও, ফুর্তি করতে পারো কোনও জার্মান কলগার্লের সঙ্গে। এখানে আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। আজ রাতের ফ্লাইটে টিকেট কনফার্ম করছি আমি। এখানে যখন ঘটনা ঘটবে, আমরা থাকব তখন নিউ ইয়র্কে।' একটু থেমে বলল সে, 'লোক বাছাই করতে ভুল যেন না হয়, ট্রটি।' মানি ইয নো প্রব্লেম। মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসনের বাঁচা চলবে না। কোনও অবস্থাতেই না!'

'ও নিয়ে চিন্তা নেই,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ট্রটম্যান, তারপর হাসল। ওর ভাঙা দাঁতের ফাঁকটা বীভৎস দেখাল। 'সেরা

লোকই নেব।' খুশি খুশি চেহারায় হার্টসেলের দিকে তাকাল সে। 'তা হলে নিউ ইয়র্কে গিয়েই কাজ সারব। জার্মান মেয়েছেলেগুলো চেঁচিয়ে কথা বলে, গায়েও খাটাশের মতো দুর্গন্ধ।'

'কখনও কি তোমাকে বলেছি ট্রটি, কতখানি রুচিশীল লোক তুমি?' কৌতুক বোধ করে মৃদু হাসল ব্রিম হার্টসেল।

ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকে দেখল জেসন ট্রটম্যান, তারপর আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'না তো!'

'তা হলে নিশ্চয়ই কোনও কারণ থাকবে তার!' নির্বিকার চেহারায় ট্রটম্যানের পিঠ চাপড়ে দিল হার্টসেল।

হার্টসেল ও ট্রটম্যান পৌঁছানোর এক ঘণ্টা পর ফ্রাউ হিমেলস্টোস বেরিয়ে এলেন ম্যানশন ছেড়ে।

বিনোকিউলার চোখে পাথরের ম্যানশন থেকে বৃদ্ধা মহিলাকে টলমল পায়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে দেখল হার্টসেল। শামুকের গতিতে চরম বিরক্ত করে শেষপর্যন্ত ওদের চোখের আড়াল হলো গাড়িটা। তারপরেও জঙ্গলে ভিতর ট্রটম্যানকে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল হার্টসেল। ওই গতিতে গেলে পাঁচশো গজ দূরে যেতে কতক্ষণ লাগাতে পারেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, হিসাব কষল। মহিলা আধমাইল চলে গেছেন নিশ্চিত হয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ম্যানশনের পাশে চলে এলো সে, তারপর কাউকে না দেখে এক ছুটে টেরেসের কাছে একটা ঘন ঝোপের আড়াল নিল। গাড়িটা ম্যানশনের পিছনে, ড্রাইভওয়েতে এনে রাখল ট্রটম্যান, তারপর যোগ দিল হার্টসেলের সঙ্গে।

লিমা স্যোরেনসন ও ফ্রাউ হিমেলস্টোসের কথোপকথন থেকে হার্টসেল জানে, ম্যানশনে আর কেউ থাকে না। টেরেস পেরিয়ে ড্রইংরুমের দরজাটার পুরনো তালা খুলতে আধমিনিটও লাগল না তার। সাবধানে ভিতরে ঢুকল দু'জন।

'ধুশ্শালা!' নাকে ধুলো ঢুকতেই হাঁচি আটকে বিড়বিড় করে

গাল বকল হার্টসেল।

একবার তাকালেই যে-কেউ বুঝবে, অন্তত পাঁচ-সাত বছর এ-ঘর পরিষ্কার করে না কেউ। সবখানে জমে আছে ধুলো-বালি। একটা চেয়ারের উপরের চাদর সরিয়ে ধুলো উড়তে দেখে জেসন ট্রটম্যান বলল, 'বুড়ি মাগী একটা আস্ত পিশাচ!'

'কাজ শুরু করে দাও, ট্রটি,' তাগাদা দিল হার্টসেল। 'লাইব্রেরিতে চলো। বুড়ি ফিরে আসার আগেই চলে যেতে হবে আমাদেরকে।'

ঘোঁৎ করে উঠল ট্রটম্যান। 'না গেলে কী হবে? ধরে আমাদের পুলিশে দেবে?'

জবাব দিল না হার্টসেল, লম্বা পা ফেলে চলে এলো পাশের ঘরে। লাইব্রেরিটার আকার দেখে বিস্ময়ে সামান্য উঁচু হলো তার একটা ভ্রূ। লাইব্রেরির মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত চারদেয়ালের বুকশেলফ ভরে আছে হাজার হাজার বইয়ে।

'বই চাপা পড়েই মরেছে শালার ব্যাটা হাবড়া বুড়ো,' মন্তব্য করল ট্রটম্যান।

'তুমি ডায়রিটা খুঁজে বের করো, ট্রটি,' ফায়ারপ্লেসের পাশের দেয়ালে হাত রাখল হার্টসেল, প্যানেল ঠেলে কিউবিকলে ঢুকল, পল হাইনরিখের ফাইলটা খুঁজতে শুরু করল ক্যাবিনেটে।

নির্দিষ্ট ফাইলটা ঘেঁটে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলো পাঁচমিনিট পার হবার আগেই। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে দেখল, একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে আরাম করে সিগারেট ফুঁকছে ট্রটম্যান। কোলের উপর রাখা ডায়রিটা দেখাল সে হাসি-হাসি চেহারায়।

'সিগারেট ধরানো উচিত হয়নি তোমার,' বিরক্ত স্বরে বলল হার্টসেল। 'বুড়ি ফিরে এসে গন্ধ পেলেই বুঝে ফেলবে কেউ ঢুকেছিল ম্যানশনে।'

তো?' হাসিটা চওড়া হলো ট্রটম্যানের। 'বুঝলে?' আশপাশের

চেয়ার ঢেকে রাখা কয়েকটা সাদা চাদর দেখাল। ওগুলোতে সিগারেটের আগুন দিয়ে অন্তত বিশটা ফুটো তৈরি করেছে সে। 'এসব জঞ্জাল জড় করে রাখা ঠিক না, হার্টি। এসো, পুড়িয়ে ফেলি।'

কথাটা ভেবে দেখতে সামান্য সময় নিল ব্রিম হার্টসেল। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ সে, বিবেকের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি তাকে গুছিয়ে চিন্তা করতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল, বাড়ির কোথাও থেকে পুরনো চাদর এনে চেয়ারগুলো আবার ঢেকে দিলেও তাদের উপস্থিতির প্রমাণ থেকে যাবে ম্যানশনে। ড্রইংরুম ও লাইব্রেরির ধুলোময় মেঝেয় জুতোর দাগগুলো বেশ স্পষ্টভাবেই পড়েছে। ক্ষতি কী ট্রটির কথামত কাজটা করলে? কোথাকার কোন্ জার্মান বুড়ির ম্যানশন পুড়লে তার কী? আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সে নিষ্ঠুর হেসে। 'ঠিক আছে, ট্রটি, তোমার কথাই রাখছি। ধুলো-ময়লাহীন পরিবেশ সবারই কাম্য।'

গভীর আগ্রহের সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল জেসন ট্রটম্যান, পর্দা ছিঁড়ে নামাতে শুরু করল, আসবাবপত্রের উপর থেকে চাদর টেনে এক জায়গায় জড় করবার কাজে মন দিল তারপর। খুকখুক করে কাশছে, আর এর জন্য দায়ী ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে গালাগালি করছে অশ্রাব্য ভাষায়।

লাইব্রেরি ছেড়ে বেরিয়ে গেল ব্রিম হার্টসেল, ফিরল মিনিট দশেক পরে—ম্যানশনের পিছনের গ্যারাজ থেকে দু' ক্যান অকটেন নিয়ে এসেছে সে। বুকশেলফগুলোতে অকটেন ছিটাতে পাঁচ মিনিটও ব্যয় হলো না তার। ট্রটম্যান আরও কাপড় জড় করবার পর ওগুলো ভিজাতে শুরু করল সে।

একই কাজ করল তারা অন্যান্য ঘরেও।

গাড়ি পর্যন্ত এসে ব্যাগগুলো তুলে দেয়ায় আন্তরিক হেসে গ্রোসারকে ধন্যবাদ দিলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, চাবি ঢুকিয়ে

মোচড় দিলেন ইগনিশনে। মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল উনিশশো একান্ন মডেলের মার্সিডিয সেডান। গত ছাপ্পান্ন বছর ধরে এভাবেই চালু হয়েছে ওই ইঞ্জিন, বড় কোনও সমস্যা সৃষ্টি না করে যাত্রীদের বহন করেছে পাঁচ লাখ তেত্রিশ হাজার মাইল।

স্টিয়ারিং হুইলটা দু'হাত শক্ত করে ধরে মন্থর গতিতে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস। খুব সাবধানে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝেই চলে গেলেন রাস্তার মাঝখানে। ছোট শহরের সবাই চেনে তাঁকে, ফলে যারাই তাঁর গাড়িটা দেখল, পাশ কাটাল অনেকটা দূর দিয়ে।

সেতুর কাছে যেখানে বাঁক নিয়ে হিমেলস্টোস রেসিডেন্সের ড্রাইভওয়েতে ঢুকতে হবে, তার আগে পরিচিত মার্সিডিযটা দেখে থেমে দাঁড়াল উল্টোদিক থেকে আসা স্থানীয় কম্পানির একটা ডেলিভারি ভ্যান, হাত নেড়ে ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে বাঁক নিতে উৎসাহিত করল ওটার ড্রাইভার।

গতি আরও কমিয়ে মার্সিডিযটাকে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেললেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, তারপর আনাড়ি হাতে স্টিয়ারিং হুইলে ছোট ছোট ঝটকা মেরে মোড় ঘুরতে শুরু করলেন। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়বার পর জঙ্গলের ভিতর চলে যাচ্ছিলেন প্রায়, শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং হুইল টানাটানি করে রাস্তার উপরে থাকতে পারলেন। বিস্ময় নিয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডেলিভারি ভ্যানের ড্রাইভার।

একাশি বছর বয়সে গাড়ি চালানো শিখেছেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, সাত বছর আগে তাঁর স্বামী মারা যাবার পর। শিখেছেন নিজে, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই তাঁর। চোখের ক্যাটার‍্যাক্ট-এর কারণে আশপাশের এলাকার সঙ্গে রাস্তার তফাৎ তেমন একটা বোঝেন না। তাঁর কাছে রাস্তা মানে একটা অস্পষ্ট কালো রেখা। ফ্রাউ হিমেলস্টোসের গাড়ি-চালনার অদক্ষতার কথা জেলার সবাই জানে। তিনি নিজে কখনও অ্যাক্সিডেন্ট করেননি,

কিন্তু কতজনের যে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে দিয়েছেন তা কষ্ট করে মনে রাখেনি কেউ।

গর্তভরা রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকুনিতে নরম সিটের উপর নাচছে ফ্রাউ হিমেলস্টোসের পলকা শরীরটা, ফলে মার্সিডিযের গতি আরও কমিয়ে আনলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর বাঁক ঘুরে ম্যানশনের দিকে তাকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পিছনের দিকে যেতে দেখলেন আবছা দুটো ছায়ামূর্তিকে। এরপর আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল তাঁর। একতলার দুটো ঘরের জানালা দিয়ে গলগল করে বের হচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। থতমত খেয়ে 'মেইন গট!' বললেন তিনি, খেয়াল করলেন না তাঁর ডান পা চেপে বসেছে অ্যাক্সিলারেটরে।

কার্বুরেটরে প্রচুর তেল পাওয়ায় বারকয়েক কাশল পুরনো ইঞ্জিন, তারপর সাড়া দিল, লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল ম্যানশনের দিকে। গতি ক্রমেই বাড়ছে। আরও ভয় পেয়ে গেলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, এবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন পুরোপুরি। ড্রাইভওয়ে থেকে সরে মজা পুকুরের কাদায় পড়ে কয়েকটা জোর ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল মার্সিডিয সেডান।

ড্রাইভওয়ের বাঁক ঘুরল ট্রটম্যান, তারপর গাড়িটা দাঁড় করাল।

'রওনা হয়ে যাও,' নিচু স্বরে জেসন ট্রটম্যানকে নির্দেশ দিল ব্রিম হার্টসেল।

'আরেকটু, হার্টি,' শয়তানির হাসিতে ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল জেসন ট্রটম্যানের। ক্লাচ দাবিয়ে রেখে অ্যাক্সিলারেটর পাম্প করল সে। 'আরেকটু কাজ বাকি আছে। বুড়ি আমাদের দেখে ফেলেছে।'

'ধোঁয়া চোখে পড়লে লোকজন চলে আসতে পারে,' কড়া হলো হার্টসেলের কণ্ঠ: 'যা বলছি করো!'

ঠিক তখনই পুরনো মার্সিডিযের দরজা খুলে টলমল পায়ে বেরিয়ে এলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস. ভীষণ ভয় পেলেও আহত.

হননি তিনি, আগুন নেভানোর ভাবনা থেকেই হয়তো পুকুরের ঢাল বেয়ে উঠে দৌড়ে যেতে চেষ্টা করলেন ম্যানশনের দিকে।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল ট্রটম্যান, লম্বা পদক্ষেপে পৌঁছে গেল ফ্রাউ হিমেলস্টোসের সামনে, তারপর ডানহাত ঘুরিয়ে চড় মেরে বসল বৃদ্ধা মহিলার গালে। পর পর দুটো চড় মেরে হাসি-হাসি চেহারায় থামল সে।

'আমাকে মা-মারছ কেন!' কাঁপা গলায় বললেন বৃদ্ধা, ম্যানশনের দিকে দেখালেন। মাথাটা ঘনঘন উপর-নীচ হচ্ছে। 'আগুন! আগুন লেগে গেছে! নেভাতে হবে! সাহায্য! সাহায্য করো!'

'সাহায্য? করছি!' আরও দুই চড় মেরে বৃদ্ধা মহিলাকে ড্রাইভওয়ের মাঝখানে ফেলে দিল জেসন ট্রটম্যান, ফিরে এসে গাড়িতে উঠে গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল ক্লাচ। উঠে বসতে চেষ্টা করলেন ফ্রাউ হিমেলস্টোস, বোকার মত তাকালেন অগ্রসরমান গাড়িটার দিকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ছুটন্ত গাড়ির ধাক্কায় শূন্যে উঠে আট-দশ ফুট দূরে ম্যানশনের দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল ফ্রাউ হিমেলস্টোসের শীর্ণ দেহ, ওখান থেকে পড়ল মাটিতে। পড়েই থাকল নিথর।

'কী হলো এটা?' ঘাড় ফিরিয়ে ট্রটম্যানের দিকে তাকাল ব্রিম হার্টসেল। 'চলো, যাওয়া যাক।'

জবাব না দিয়ে গাড়ি থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল জেসন ট্রটম্যান, দৌড়ে চলে গেল ফ্রাউ হিমেলস্টোসের নিথর দেহটার কাছে, দু'হাতে তুলে নিল বৃদ্ধাকে, তারপর ঢুকে পড়ল জ্বলন্ত ম্যানশনে। দাউদাউ আগুনের মধ্যে ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়িতে এসে উঠল, রওনা হয়ে খুশি-খুশি কণ্ঠে বলল, 'সাক্ষী। সাক্ষী থাকল না আর!'

সতেরো

সকালে নাস্তার সময় খবরের কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম ও ফ্রাউ হিমেলস্টোসের ছবিটা দেখে চমকে উঠল বিস্মিত রানা, দেরি না করে পড়তে শুরু করল খবরটা।

রিপোর্টে বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণ লেখা হয়েছে: দুর্ঘটনা। পুলিশ ধারণা করছে, ফ্রাউ হিমেলস্টোস অসাবধানতা-বশত আগুন ধরিয়ে ফেলেন ম্যানশনে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তিনি, তারপর গাড়ি নিয়ে সাহায্য চাইতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেন। বোধহয় স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল তাঁর, রহস্যময় কোনও কারণে ম্যানশনে ঢোকেন আবার, আর ওটাই কাল হয় তাঁর জন্য। আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি ফ্রাউ হিমেলস্টোসের পক্ষে। সম্ভবত আগুন ধরে যায় বৃদ্ধার পোশাকে, ফলে পুড়ে মারা যান তিনি।

খবরটা পড়ে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হলো রানার। পেপারে যা-ই লিখুক, ও আঁচ করতে পারছে কী ঘটেছে। জেসন ট্রটম্যান ও ব্রিম হার্টসেলের নিষ্ঠুর চেহারা ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। কতবড় পাষণ্ড হলে নিরীহ এক বৃদ্ধাকে এভাবে খুন করা যায়, ভেবে পেল না ও। দাঁতে দাঁত পিষে মনে মনে বলল, 'এখন আমি জানি তোমরা কী করেছ। এটাও জানি, তোমাদের মতো পশুদের কী প্রাপ্য। শপথ করলাম, আমি বেঁচে থাকলে তোমরা বাঁচবে না।'

লিমাকে হেডলাইনটা দেখাল ও, মাথা নাড়ল আফসোস করে। 'আমার ধারণা, খুন করা হয়েছে বৃদ্ধাকে। আর কাজটা ওই দু'জনের। ব্রিম হার্টসেল আর জেসন ট্রটম্যান। বোধহয় আমাদের অনুসরণ করেই গিয়েছিল ওখানে। এরকম কিছু ঘটতে পারে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আমি, নইলে সতর্ক থাকতাম। আমি যদি ভুল না করতাম, তা হলে এভাবে মরতে হতো না বেচারিকে।'

'মহিলা যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকেন, তবুও বলব, নিজেকে অযথা দোষ দিচ্ছ তুমি, রানা,' সান্ত্বনার সুরে বলল লিমা। 'কিছু করার ছিল না তোমার। তুমি তো আর গল্পের বইয়ের কোনও স্পাই নও যে ভাববে, কেউ তোমাকে অনুসরণ করতে পারে?'

'স্পাই নই, তবু মনে হচ্ছে পিছন দিকে চোখ রাখা উচিত ছিল আমার,' থমকে থমকে বলল রানা। 'বিরাট বড় অপরাধী মনে হচ্ছে এখন নিজেকে। মনে হচ্ছে আমার জন্যেই মরতে হলো ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে। ...বেচারির কাছে ওরা জানতে চেয়েছিল আমাদেরকে উনি কী বলেছেন, তারপর দরকারী কোনও তথ্য আদায় করতে না পেরে খুন করে ফেলেছে।'

'তুমি শিওর, ব্যাপারটা খুন?'

'পুরোপুরি। তবে প্রমাণ করতে পারব না।'

রানার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকাল লিমা, 'তা হলে এরপর আমাদেরকে খুন করতে চাইবে নিশ্চয়ই ওরা দু'জন?' সামান্যতম ভীতির ছাপ নেই ওর চোখে।

'খুন করে ফেলা সহজ হবে না,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল রানা। 'নির্জন একটা বাড়িতে বৃদ্ধা ফ্রাউ হিমেলস্টোসকে একা পেয়েছিল ওরা, কোনও সাক্ষী থাকবে সে-ভয় ছিল না। কিন্তু এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমরা থাকব লোকজনের ভিড়ে।'

লিমা কোনও কথা না বলায় কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেটা ভাবতে চেষ্টা করল রানা, মাথায় কিছু এলো না ওর। শুধু বুঝল, পুলিশের কাছে যাওয়া যাবে না। প্রমাণ ছাড়া

নিজের ধারণার কথা পুলিশকে জানালে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে ওকেই।

চুপচাপ গোছগাছ সারল ওরা, দু'জনই ডুবে থাকল যে-যার চিন্তায়। সময় কাটতে লাগল অস্বস্তিকর নীরবতায়। ল্যান্ডসবার্গ প্রিযনে ফোন করল রানা, খোঁজ নিল সেই প্রিস্টের, যিনি পল হাইনরিখের চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলেন হাই কমিশনারের কাছে। ভদ্রলোক মারা গেছেন আজ থেকে সতেরো বছর আগে। জানা গেল না কিছুই।

সকাল ঠিক ন'টায় হিলটনের লবিতে নেমে এলো ওরা। কনসিয়ার্জকে ভাল টিপস দিয়ে জানাল রানা, অওডি স্পোর্টস কনভার্টিবলটা এয়ারপোর্ট পার্কিং এরিয়ায় রেখে যাবে ওরা, রেন্টাল এজেন্সি যেন ওখান থেকে সংগ্রহ করে নেয়।

'নিশ্চয়ই, হের রানা!' খুশি হয়ে সম্মতির সুরে বলল বিগলিত কনসিয়ার্জ। 'পোর্টিকোতেই এনে রাখা আছে আপনাদের গাড়ি। এজেন্সিতে ফোন করে বলে দিচ্ছি আমি, কোনও অসুবিধে নেই।'

রানা ও লিমা হালকা লাগেজ নিয়ে এসেছে, তবুও কিছুতেই ওদেরকে ওগুলো বহন করতে দিল না কনসিয়ার্জ, তার ইশারায় ছুটে এসে লাগেজ দুটো দু'হাতে তুলে নিল একজন বয়স্ক পোর্টার, পা বাড়াল হোটেল এন্ট্রান্স-এর দিকে।

পোর্টারের পিছু নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রানা, ওর কনুইয়ে হাত ভরে পাশে হাঁটছে লিমা। পোর্টিকোর বামপাশে একটা স্পোর্টস কার পার হয়ে এগোল ওরা। গাড়িটার ইঞ্জিন চালু দেখে একটু অবাক হলো রানা।

অওডিটার দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে ও লক্ষ করল, পোর্টিকো থেকে বেরিয়ে যাবার গেটের সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে চার জার্মান যুবক। তাদের একজন কী যেন বলতেই রানা ও লিমার দিকে ফিরল সবাই।

ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হলো রানার। থমকে

দাঁড়াবে কি না ভাবল এক মুহূর্ত, সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

চাপাস্বরে চূড়ান্ত নির্দেশটা দিল ডানদিকের সোনালী চুলওয়ালা লম্বা লোকটা। সামান্য নড়তে দেখল রানা সব ক'জনকে। তিনজনের ডানহাত ঢুকে গেল জ্যাকেটের ভিতরে, দলনেতার পাশের লোকটার বাঁ-হাত। ঝটকা খেয়ে বেরিয়ে এলো চারজনের হাত, দৈর্ঘ্যে আগের চেয়ে অনেকখানি বেড়ে গেছে লম্বা নলওয়ালা পিস্তলগুলোর কারণে। চারটে পিস্তলই স্থির হলো রানা ও লিমার উপর।

অ্যাসপেনে ওর বাংলোর বেডরুমে খাটের নীচে স্প্রিঙের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো ওয়ালথার পিপি .৩৮ পিস্তলটার কথা ভেবে আফসোস হলো রানার, তবে চিন্তাটা ওকে স্থবির করল না, ওর জোরাল ধাক্কা খেয়ে তাল হারিয়ে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল লিমা। দেরি না করে অওডির আড়াল পাবার জন্য লাফ দিল রানাও। পোর্টিকোর সামনের ফুটপাথ দিয়ে চলমান পথচারীদের চিৎকার-চেঁচামেচি ছাপিয়ে হতচকিত বয়স্ক পোর্টারের ভীত আর্তনাদ শোনা গেল।

মাটি স্পর্শ করবার আগেই একনাগাড়ে গুলির কর্কশ ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট আওয়াজ শুনে ঘাড়ের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল রানার। একটু অবাকও হলো, ওই লম্বা নলওয়ালা লুগার পিস্তলগুলো থেকে গুলি করা হচ্ছে না। সাবমেশিনগান থেকে ব্রাশ ফায়ার করছে কেউ। চকিতে খেলে গেল চিন্তাটা: কোন্ অস্ত্রের গুলির আওয়াজ, সেটা আমি জানলাম কী করে!

গাড়িটার আড়াল পেয়েই ঘুরে বসল রানা, হাত বাড়িয়ে খপ করে লিমার ফর্সা কব্জি ধরে টেনে আনল নিজের পাশে। থেমে গেল গুলি-বর্ষণের আওয়াজ। গাড়ির পিছন থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে রানা দেখল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায় পড়ে আছে সেই চার জার্মান। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তারা। তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে পোর্টিকো থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা। শক্তিশালী ইঞ্জিনের

গুরুগম্ভীর গর্জন শুনে সেদিকে তাকাল রানা।

হোটেল এন্ট্রান্সের ওপাশ থেকে সামনে বাড়ল জার্মানিতে সমাদৃত একটা মাস্ট্যাং জিটি স্পোর্টস কার, ওটার চালক একটা সাবমেশিনগান নামিয়ে রেখেছে এইমাত্র। রানার নজর কাড়ল ড্রাইভার।

ডানহাত নেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে নিতান্ত পরিচিতের মত ঝলমলে হাসি উপহার দিল সুদর্শন যুবক, একটা চোখ টিপল, ডানহাতেই গিয়ার ঠেলল, তারপর রওনা হয়ে গেল স্টিয়ারিং হুইলে হাতটা ফিরিয়ে এনে। পোর্টিকো থেকে বেরিয়ে শূন্য থেকে ষাট মাইল গতি তুলতে আট সেকেন্ডও পুরো লাগল না দুঃসাহসী, উপকারী যুবকের। একটুও গতি না কমিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হলো তার মাস্ট্যাং জিটি।

রানার পাশ থেকে শ্বাস চেপে বলল বিস্মিতা লিমা, 'কে লোকটা?'

'জানি না,' বিড়বিড় করল রানা। 'তবে চেনা-চেনা মনে হলো। ...খুব চেনা!' একটু থেমে বলল ও, 'খেয়াল করেছ, মাত্র একটা হাত লোকটার?'

'বাংলাদেশের মানুষ মনে হলো, গায়ের রং তোমার মতো,' লিমার স্বরটা কাঁপা শোনাল। 'তোমার স্বপ্নে যে-লোকটা আসে, তোমাকে চোখ টেপে—সে না তো?'

'ঠিক বলেছ!' অবাক হয়ে লিমার দিকে তাকাল না। 'ওই লোকটাই! কে ও?'

মাথা নাড়ল লিমা। জানে না।

চট্ করে পিছন ফিরে তাকাল রানা, মাত্র মাটি ছাড়ছে পোর্টার। লোকটার পাশে চলে গিয়ে তার হাতে পঞ্চাশ ডয়েশ মার্কের একটা নোট ধরিয়ে দিল ও, পোর্টারের আপত্তি সত্ত্বেও লাগেজগুলো তুলে নিয়ে অওডির কাছে ফিরে এসে চাপা গলায় বলল, 'জলদি গাড়িতে ওঠো, লিমা। পুলিশ আসার আগেই

ভাগতে হবে, নইলে জবানবন্দি দিতে গিয়ে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

উদ্বেগের ছাপ পড়ল লিমার কমনীয় চেহারায়। 'এয়ারপোর্টে আমাদের ঠেকিয়ে দেবে না তো পুলিশ?'

'পোর্টার সাক্ষ্য দেবে আমরা কিছু জানি না। প্লেন ধরতে হবে বলে না থেমে দ্রুত রওনা হয়ে গিয়েছি।'

রানা লাগেজ তুলে রাখবার আগেই প্যাসেঞ্জার সিটে আসীন হলো বুদ্ধিমতী লিমা। ইচ্ছে করেই কোনওদিকে না তাকিয়ে অওডি ছেড়ে দিল রানা, পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ কাছিয়ে আসতে শুনল এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে।

দেড়মিনিট পর ছাদের উপর রংচঙা আলোর তাজ নিয়ে নবজাতকের ওঁয়া-ওঁয়া-ডাক ছেড়ে হিলটন হোটেলের দিকে ছুটে গেল চারটে পুলিশ-কার।

সময় শেষ হয়ে যাবার আট মিনিট আগে চেক-ইন করল রানা ও লিমা, বোর্ডিং পাস নিয়ে ঢুকে পড়ল এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি এরিয়ায়। লাগেজ অতি সামান্য হওয়ায় কাস্টমসের হাত থেকে ছাড়া পেতে অসুবিধে হলো না কোনও, পনেরো মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ওরা প্যান অ্যাম-এর বোয়িং ৭০৭ বিমানের গুহাসদৃশ দীর্ঘ, গোলচে পেটের ভিতর।

বোয়িং ৭০৭ নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে আকাশে উঠবার পর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বার্লিন ডকুমেন্টস্ সেন্টার ও লুডভিগসবার্গের সেন্ট্রাল এজেন্সি অভ স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অভ জাস্টিস ফর দ্য প্রসিকিউশন অভ ন্যাশনাল সোশালিস্ট ক্রাইমস অভ ভায়োলেন্স-এর অফিস থেকে রানার টুকে আনা তথ্যগুলোয় চোখ বুলাতে শুরু করল লিমা।

দ্বিতীয় অফিসটাতে যুদ্ধাপরাধীদের উপর বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। হিল্ডা ক্যান্টোরেকের নামেও একটা মোটা ফাইল আছে তাদের কাছে। সেটা থেকেই সার-সংক্ষেপ তুলে এনেছে রানা।

উনিশশো চব্বিশ সালের দশ জুন জার্মানির হ্যানোভারের অভিজাত ও ধনী ক্যান্টোরেক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হিল্ডা ক্যান্ট্যেরেক। তাঁর বাবা-মা'র নাম কেমারিখ ও এঙ্গেলা ক্যান্টোরেক। ভাই ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক। ক্যান্টোরেক পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে বিশ্বখ্যাত খেলনা প্রস্তুতকারক ক্যান্টোরেক ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিল্ডার ভাই ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক দক্ষিণ আমেরিকায় পারিবারিক ব্যবসা সরিয়ে নিয়ে যান। কেমারিখ ও এঙ্গেলা ক্যান্টোরেক জার্মানিতেই থেকে যান, অ্যালাইড বম্বিং রেইডে মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে।

হিল্ডা ক্যান্টোরেকের শৈশব-কৈশোর ডোশিয়েতে স্পষ্ট নয়। উল্লেখ করা হয়েছে, যুদ্ধের সময় সমস্ত রেকর্ড ধ্বংস হয়ে যায়। বার্লিন মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন তিনি আঠারো বছর বয়সে, উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে। দু'বছর পর জার্মানির সামগ্রিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হলে বিশেষ সুযোগ পেয়ে যোগ দেন গভর্নমেন্ট মেডিকেল প্রোগ্রামে। এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের সঙ্গে তাঁকে দেখা যেত প্রায়ই। যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পর থেকে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। ধারণা করা হয়, ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করতে আমেরিকায় চলে যান।

ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের পর ইউএস গভর্নমেন্ট নুরেমবার্গে যে বহুল সমালোচিত 'মেডিকেল কেস' পরিচালনা করে, সেটাতে কুখ্যাত নরপশু কার্ল ব্র্যান্ডট্-এর সঙ্গে আসামী হিসেবে হিল্ডা ক্যান্টোরেকের নামও উঠে আসে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করতে পারেনি তৎকালীন আমেরিকান সরকার, ধরে নেয়া হয় তিনি বেঁচে আছেন, পরে ধরা পড়তে পারেন, ফলে তাঁর অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য হিল্ডা ক্যান্টোরেকের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেয়া হয়। সেটার কারণ হতে পারে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব.

কিংবা ঠিক জায়গায় সঠিক পরিমাণে ঘুষ।

এবার 'মেডিকেল কেস' সম্বন্ধে সংগ্রহ করা রানার নোট পড়তে শুরু করল লিমা।

ওই কেসে কার্ল ব্র্যান্ডট সহ প্রধান তেইশজন মেডিকেল অফিশিয়ালের বিরুদ্ধে আনা হয় ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ। হিল্ডা ক্যান্টোরেক অভিযুক্ত হন আরও শত শত চিকিৎসা-কর্মীর সঙ্গে। মেডিকেল কেসে এটা প্রমাণ হয়ে যায়, পৈশাচিক সব এক্সপেরিমেন্ট করা হতো অসহায় বন্দিদের উপর, গবেষণার জন্য মৃতদের হাড়গোড় পাঠিয়ে দেয়া হতো স্ট্রাসবার্গ-এর রাইখ ইউনিভার্সিটিতে।

শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী ও অতি-বৃদ্ধদের নিশ্চিহ্ন করবার একটা নিষ্ঠুর প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয় ও-সময়। প্রোগ্রামের নাম ছিল, টি-ফোর। টি-ফোর বাস্তবায়ন করতে অসহায়, পরনির্ভরশীল মানুষগুলোকে বিনা অপরাধে, নির্বিচারে হত্যার মহা-পরিকল্পনা করা হয়।

নাৎসিরা রেকর্ড ধ্বংস করে ফেলায় কত লোক টি-ফোর প্রোগ্রামের শিকার হয়েছিল তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি, তবে আন্দাজ করা হয়, বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজনে চার বছরে অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষকে নানান উপায়ে হত্যা করা হয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রোগ্রামে খুন হয় আরও তিন লাখ মানুষ। অবাক করা তথ্য হলো, ওই প্রোগ্রামে যাদের মেরে ফেলা হয়, তাদের বেশিরভাগই ছিল জার্মান। যাদের খাওয়ানোর কোনও মানে হয় না, অর্থাৎ, যারা খাচ্ছে, কিন্তু দেশের কোনও কাজে আসছে না, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার পরিকল্পনা করেছিল যুদ্ধে পর্যুদস্ত হিটলারের সঙ্কটাপন্ন নাৎসি সরকার। অসহায় মানুষদের দ্রুত হত্যা করতে চেয়েছিল তারা। এরই ফলশ্রুতিতে আবিষ্কার করা হয় পরবর্তীকালের আতঙ্ক: গ্যাস চেম্বার।

একটা তথ্য পড়ে হতবাক হয়ে গেল লিমা: যথেষ্ট প্রমাণ থাকা

সত্ত্বেও কঠোর শাস্তি দেয়া হয়নি টি-ফোর প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত প্রধান অভিযুক্ত আসামীদের অধিকাংশকে। তৎকালীন আমেরিকান সরকার যে *নীতি* গ্রহণ করেছিল, তার মূল কথা ছিল: টি-ফোর প্রোগ্রাম জার্মান নাগরিকদের উপর জার্মান সরকারের নিজস্ব কার্যক্রম, কাজেই পুনর্গঠিত জার্মান আদালতে জার্মানদেরই উচিত ওসবের বিচার করা। আমেরিকান সরকার ভাল করেই জানত, বিপর্যস্ত জার্মানির মুষ্টিমেয় সচেতন নাগরিক ন্যায় বিচার করতে পারবে না কখনোই, কিন্তু ব্যাপারটা তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি।

মুখ ফিরিয়ে রানাকে ওরই দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল লজ্জিত লিমা, বিড়বিড় করে বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'মনে হবে না ভিয়েতনাম, ইরাক বা আফগানিস্তানের দিকে ফিরে তাকালে,' বলে চোখ বুজল গম্ভীর রানা।

চুপ করে থাকল লিমা, কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা এ-প্রসঙ্গের ইতি টেনে দেয়ায়। কাগজগুলো ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে রানার চুলে বিলি কাটতে শুরু করল ও।

ঘুমিয়ে পড়ল রানা। স্বপ্নে সেই হাত-কাটা যুবককে দেখতে পেল। আরও কয়েকজনের সঙ্গে সাদাসিধে ভাবে সাজানো একটা অফিসে আড্ডা মারছে ওরা। হাত-কাটা যুবকের মতোই, সবাই ওর পরিচিত। ওদের হাসি-ঠাট্টায় ছেদ পড়ল ইন্টারকমে ভারী একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে: 'রানা, কাম টু মাই অফিস... ইমিডিয়েটলি!' সেই পরিচিত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর! সবার আগে ঘর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল হাত-কাটা যুবক, অন্যদেরও দেরি হলো না আড্ডা ভেঙে পালাতে।

বাঘের মতো বুড়োটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভেবে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কাঁপন অনুভব করল রানা। ঠিক ভয় নয়, কীসের যেন উত্তেজনা।

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে লিমার কাঁধে মাথা রাখল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'আসছি. সার!'

*

গমগম করছে ম্যাডিসন অ্যাভিন্যুর কফি শপ। অফিসে যাবার আগে চা-কফির জন্য থামে এখানে অনেকেই, কাজেই সকালে এরকম ভিড় থাকে সবসময়। লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে চায়ের কাপের উপর দিয়ে বুদের ওপাশে লিমা সোরেনসনের পাশে বসা পুরুষটিকে আবারও দেখল গিলবার্ট ম্যাসন। ভরসা করা যায় এমন একজন মানুষ এই মাসুদ রানা, সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে। মাঝরাতে সেন্ট্রাল পার্কে হাঁটতে গেলে সঙ্গে এরকম কাউকেই দরকার। এ লোকের ব্যাপারে পত্রিকায় যে লেখাগুলো মাঝে মাঝে বের হতো, তা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, মাসুদ রানা সত্যিকারের সাহসী, যোগ্য, সৎ একজন মানুষ।

আলাপ শুরু হওয়ায় স্বল্পবাক, নিশ্চুপ যুবকের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল ম্যাসন। বলে যাচ্ছে লিমা, ওর কথা শুনতে শুনতে আরেকটা চিন্তা মাথায় এলো তার।

টি-ফোর প্রোগ্রাম্ম সম্বন্ধে যা সে জেনেছে, সেসব এতই ভয়ঙ্কর যে, বিশ্বাস হতে চায় না ওরকম অত্যাচার কোনও মানুষ কারও উপর করতে পারে। পল হাইনরিখের সঙ্গে যে সুন্দরী মহিলার ছবি দেখেছিল, তাকে ওই টি-ফোর প্রোগ্রামের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না ম্যাসন। মহিলাকে অভিজাত এক রমণী মনে হয়েছে তার। রক্ত, মৃত্যু, কঠোর বাস্তবতা থেকে অনেক দূরের অন্য পৃথিবীর মানুষ ছিল যেন সে।

‘চিঠিতে লেখা ওই চুক্তি আর হাই কমিশনারের হস্তক্ষেপ থেকে বুঝতে পারছি, পল হাইনরিখকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসি দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল,’ বক্তব্যের ইতি টানল লিমা।

‘অসম্ভব নয়,’ চিন্তিত চেহারায় কফির কাপ দেখল ম্যাসন। ‘তবে প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সকে প্রমাণ হিসেবে ধরে নেয়া যায় না। এমনও হতে

পারে, অন্যান্য নাৎসি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে তথ্য দিলে পল হাইনরিখের শাস্তি কমিয়ে দেয়া হবে, বা এ-ধরনের কোনও চুক্তি করা হয়েছিল। বিচারের রায় হয়ে যাবার পর আর বাস্তবায়ন করা হয়নি সেই চুক্তি। এটাও আমরা ধরে নিতে পারি না যে, ওএসএস এর জর্জ গ্রুসাক নিজের স্বার্থে আলবার্ট হিমেলস্টোসের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। ডায়রিতে উকিল ভদ্রলোক বাড়িয়ে লিখে থাকতে পারেন। তিনি সত্য গোপন বা বিকৃত করে থাকতে পারেন। এটা তো সত্যি যে, আলবার্ট হিমেলস্টোসের সঙ্গে অনেক বড় বড় নাৎসি নেতার পরিচয় ছিল। জর্জ গ্রুসাক ইচ্ছে করলেই হিমেলস্টোসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মামলা করতে পারতেন। এমনও হতে পারে, নিজেকে বাঁচানোর জন্যই পল হাইনরিখের ব্যাপারে নিজেকে আর জড়াতে চাননি আলবার্ট হিমেলস্টোস।' একটু থেমে বলল ম্যাসন, 'অ্যাসপেনে যা ঘটেছে, সেসব যদি না ঘটত, তা হলে এ-ব্যাপারে আমি কোনও উৎসাহ দেখাতাম না, লিমা। কিন্তু ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ও তার সঙ্গীরা কোনও কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে, নইলে তোমাদের ওপর চোখ রাখতে লোক নিয়োগ করত না।'

'প্রশ্ন হচ্ছে, তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন,' বলল লিমা। এদের পূর্বপুরুষরাই বা কেন একজন এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে বিনা কারণে ফাঁসি দিতে চাইবে? ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা তো ছিল না। নাৎসি বিদ্বেষও ভাবতে পারছি না। পল হাইনরিখের ফাঁসি চাইবার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল তাদের?'

লিমা থেমে যাওয়ায় বলল ম্যাসন, 'কারণটা যখন জানতে পারবে তুমি, তখন শক্ত প্রমাণও হাতে থাকতে হবে তোমার। প্রমাণ ছাড়া ক্যাসল, গ্রুসাক বা গেটসবিদের মতো প্রতিপত্তিশালী মানুষের বিরুদ্ধে একটা লাইন ছাপলেও মানহানীর মামলায় নাক পর্যন্ত ডুবে যাব আমরা।'

'হিল্ডা ক্যান্টোরেক আমাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ দিতে পারবেন হয়তো,' মুখ খুলল রানা। 'ওই সময়ে পল হাইনরিখের সঙ্গে ছিলেন উনি, যুদ্ধ শেষে গা ঢাকা দেন তাঁরা দু'জনই। মহিলা বেঁচে আছেন কি না সেটা জানতে হবে আগে।'

'বেঁচে আছেন,' বলল গিলবার্ট ম্যাসন। 'আপনার পরামর্শে ক্যান্টোরেক রেসিডেন্সে ফোন করেছিলাম আমি গতকাল, মেইড জানাল ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক স্যান ফ্রান্সিসকো গেছেন, তবে তাঁর বোন আছেন, তাঁকে কিছু জানাতে হবে কি না। আমি বলেছি, তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে দু'জন সাংবাদিক যেতে পারেন। কথা শুনে মেইডকে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো, বলল মিস ক্যান্টোরেক সাধারণত কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

'আর ফোন করা ঠিক হবে না,' বলল লিমা। 'মহিলা ভয় পেয়ে যেতে পারেন।'

ঘড়ি দেখল রানা, সোয়া ন'টা বাজে। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'তোমাদের মিটিং শেষ হলে ঢুঁ মারা যায় ওখানে।'

'আরেকজন লোকের সঙ্গে হয়তো কথা বলতে চাইবেন আপনি,' মৃদু হাসল গিলবার্ট ম্যাসন। 'অলিভার অরওয়েল নাম তাঁর।'

ভ্রূ উঁচু করল লিমা। 'কে তিনি?'

'পল হাইনরিখের বিচারের সময় জাজদের প্যানেলে ছিলেন অলিভার অরওয়েল। অশীতিপর বৃদ্ধ, তবে এখনও টনটনে আছেন। পল হাইনরিখের মামলার ব্যাপারে অনেককিছু বলতে পারবেন উনি। ৪৮৩ পার্ক অ্যাভিন্যুতে বাড়ি ওঁর। জায়গাটা এখান থেকে কাছেই।'

'একটা কাজও ফেলে রাখোনি দেখছি!' প্রশংসার দৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখল লিমা।

হাসিটা চওড়া হলো গিলবার্ট ম্যাসনের, ঠাট্টা করে বলল, 'যার যা স্বভাব। দু'একদিনের মধ্যেই সময় করে ইন্টারনাল রেভিন্য

সার্ভিস-এও খোঁজ নিয়ে ফেলব, দেখা যাক মিস্টার রানার ধারণা সত্যি হয় কি না।'

'সম্পদের হিসেব থাকলে ওদের কাছেই থাকবে,' বলল রানা। 'একটু আগে বলছিলেন ওখানে উচ্চপদস্থ বন্ধু আছে আপনার। সম্পর্কটা তথ্য পেতে হলে কাজে লাগাতে হতে পারে।'

'কোনও অসুবিধে নেই,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ম্যাসন।

রানার দিকে তাকাল লিমা। 'আগে আমরা জাজ অরওয়েলের ওখানে যাব, তারপর ওখান থেকে অয়েস্টার বে, ঠিক আছে?'

'বেশ।' ওয়েইটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিল রানা।

উঠে দাঁড়াল গিলবার্ট ম্যাসন, রানার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গুড হান্টিং, মিস্টার রানা।'

হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর উইশেস। সেইম টু ইউ টূ।'

বেরিয়ে এলো তিনজন কফি শপ থেকে।

লোক গিজগিজ করছে বাইরে। ফুটপাথে হাঁটতে গেলে ধাক্কা লেগে যায় গায়ে। ম্যাসন বিদায় নিয়ে চলে যেতেই রানাকে পথ দেখাল লিমা। ম্যাডিসন অ্যাভিন্যু ধরে হাঁটতে হাঁটতে রানার মনে হলো, এখানে আগেও বহুবার এসেছে ও, সব রাস্তাই যেন চেনা।

৪৮৩ পার্ক অ্যাভিন্যুর হালকা নীল রঙের বাড়িটা সাদামাটা দেখতে। সামনে একটুখানি বাগান, মাঝ দিয়ে খাটো ড্রাইভওয়ে, তারপর মাঝারী আকারের দোতলা বাড়ি।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন জাজ অরওয়েল, বাগানে কিছুক্ষণ বসেন, ওখানেই নাস্তা খান, তারপর দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়তে চলে যান স্টাডিতে। রানা ও লিমাকে স্টাডিতে পৌঁছে দিল নিগ্রো মেইড।

পরিচয়ের পালা চুকবার পর রানা-লিমাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখলেন জাজ অরওয়েল, ভাবলেন, দু'জনকে মানিয়েছে তো বেশ! ভদ্র, মার্জিত আচরণের কারণে রানাকে বেশ পছন্দ করে

ফেললেন তিনি, লিমাকে তাঁর ভাল লাগল ওর সহজ আচরণের কারণে।

জাজ অরওয়েলের প্রখর স্মৃতিশক্তি অবাক করল রানা ও লিমাকে। ওই মামলার কথা স্পষ্ট মনে আছে জাজ অরওয়েলের, গড়গড় করে বলে গেলেন তিনি কীসের 'পর কী ঘটেছিল। খেদ প্রকাশ করে জানালেন, আজও তিনি ভেবে পান না কেন জাজ গেটসবি ওরকম অন্যায্য রায় দিয়েছিলেন পল হাইনরিখের মামলায়। বললেন, হাই কমিশনার ওই নাৎসি লেফটেন্যান্ট কর্নেলের শাস্তি কমিয়ে দেয়ায় মোটেই অবাক হননি তিনি।

দুপুরের খাবারটা তাড়াতাড়ি খান জাজ অরওয়েল, তাঁর দাওয়াতে লাঞ্চটা ওখানেই সারল রানা ও লিমা, জাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শুনে দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল পরবর্তী একঘণ্টা। যখন বিদায় চাইল, ততক্ষণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক রাজনীতি ও নানান অন্যায়-অবিচার সম্বন্ধে অনেক বেড়ে গেছে ওদের দু'জনের জ্ঞান।

'এবার জানতে পারি, কী নিয়ে আর্টিকেল লিখতে চাইছ তোমরা?' দরজা পর্যন্ত রানা ও লিমাকে পৌঁছে দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন জাজ অরওয়েল। বুদ্ধিমান মানুষ, খেয়াল করেছেন, এ নিয়ে কথা তুললেই এড়িয়ে যাচ্ছে যুবক-যুবতী।

'পল হাইনরিখের ওই মামলায় কিছু অন্যায় করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে আরও ভয়ানক সব বে-আইনী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে, ওসব নিয়েই আর্টিকেল লিখতে চাইছি আমরা,' কিছু না বললে অভদ্রতা হয়ে যায় দেখে জানাল লিমা।

'যেমন?'

'যেমন খুন-জখম,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

'খুন!' সত্যিই বিস্মিত হলেন জাজ। 'আর এসবের সূত্রপাত ওই মামলায় কঠোর শাস্তি দেয়ার ফলে হয়?' আপনমনে মাথা নাড়লেন জাজ অরওয়েল। 'জাজ গেটসবি অন্যায় কিছুর সঙ্গে

জড়িত ছিলেন ভাবতে সায় দিচ্ছে না মন।'

'আমাদের হাতে প্রমাণ নেই যে উনি অন্যায় করেছিলেন।'

মিস্টার অরওয়েল বিড়বিড় করে বললেন, 'প্রমাণ থাকবে কী করে, ইয়ং ম্যান, অন্যায় তো করার কথা নয় তাঁর! ওঁর ছেলেও ওঁর মতোই জাজ হয়েছে। ওকে আমি চিনি। সত্যিকারের ভদ্রলোক!'

শেষ দশটা ল্যাপ সেরে পানি থেকে উঠে সুইমিং পুলের পাশে বসলেন জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি। সাঁতার কেটে আগের চেয়ে শান্ত হয়েছে তাঁর স্নায়ু। তবে মনের কোণ থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছেন না দুশ্চিন্তা। সিনেটর গ্রুসাক আর ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের সঙ্গে সেই মিটিঙের পর দু'দিনে দশ পাউন্ড ওজন কমে গেছে তাঁর। রাতে দু'ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারছেন না, মুখে রুচছে না কিছু। চরম অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁর মনটাকে। বারবার মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। বিপর্যয়ের আর দেরি নেই বেশি। ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগের ঘনঘটা। আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রতিবার আগের চেয়ে বয়স্ক লাগছে চেহারা। চোখের নীচে গাঢ় কালো দাগ পড়ে গেছে। চেহারাটা যেন ঠিক ধরা পড়বার ভয়ে ভীত কোনও অনভিজ্ঞ চোরের। তাঁর এই পরিবর্তন শার্লির চোখে পড়েনি। কিছুই চোখে পড়ে না ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স ছাড়া।

ড্রাইভওয়েতে পরিচিত গাড়িটা ঢুকতে দেখলেন জাজ গেটসবি। বাঁক নিয়ে বাড়ির পিছনের পার্কিং এরিয়ার দিকে চলে গেল ওটা। পাঁচ মিনিট পেরোবার আগেই সুইমিং পুলের ফ্ল্যাগস্টোন পাথ ধরে স্ত্রীকে হেঁটে আসতে দেখলেন জাজ। গলফ স্কার্ট পরে আছেন শার্লি। ওরকম খাটো স্কার্ট পরতে বহুবার তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করেছেন জাজ। থামের মতো মোটা, ফ্যাকাসে

উরুগুলো দেখতে সত্যিই বিশ্রী লাগে।

বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাবের বারে সময় কাটিয়ে ফিরছে শার্লি, স্ত্রীকে টলতে দেখে তিক্ত মনে ভাবলেন জাজ গেটসবি।

আজকে শার্লিকে অনেক বেশি মনোযোগী মনে হলো তাঁর। স্বামীকে ড্রিঙ্ক দিতে চাইলেন তিনি, জানতে চাইলেন স্যান্ডউইচ বানাবেন কি না। এর মানে জানেন জাজ। অস্বাভাবিক দামি কিছু চাইবে শার্লি। পুলহাউস কিচেন থেকে স্যান্ডউইচ ও ড্রিঙ্ক নিয়ে এসে স্বামীর পাশে বসলেন মহিলা।

'কত দরকার?' সরাসরি জানতে চাইলেন জাজ গেটসবি।

ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠলেন শার্লি। 'তুমি জানো, তুমি একটা আস্ত শুয়োর?'

'কত?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন জাজ, মুখের ভিতরটা তিতা লাগল তাঁর।

উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন শার্লি গেটসবি। 'পঞ্চাশ হাজার ডলার। আজকের মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিলেই চলবে।'

'আগামীকাল সকালে পেয়ে যাবে,' গলা উঁচিয়ে বললেন গেটসবি।

ঘাড় ফেরালেন শার্লি। 'আমি পুলে আসার আগে একটা ফোন এসেছিল তোমার। কোন্ এক জাজ অরওয়েল। তার টেলিফোন নম্বরটা তোমার লাইব্রেরিতে ডেস্কের ওপর আছে।'

'অরওয়েল... অরওয়েল...' বিড়বিড় করে বললেন স্যামুয়েল গেটসবি, নামটা চেনা চেনা লাগছে তাঁর, কিন্তু লোকটাকে মনে করতে পারছেন না। তারপর মনে পড়ল: নুরেমবার্গ ট্রায়ালে জাজ অরওয়েল ছিলেন তাঁর বাবার সহযোগী জাজ!

বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবির। ঘনঘন ঢোক গিললেন কয়েকবার। চেষ্টা করেও থামাতে পারলেন না শরীরের কাঁপুনি। দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে

বাড়িতে ঢুকে চলে এলেন লাইব্রেরিতে। শার্লির লেখা নম্বরটায় ডায়াল করতে গিয়ে দু'বার ভুল করলেন তিনি। জাজ অরওয়েলের সঙ্গে কথা বলে চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ চেয়ারে, কী করবেন ভাবছেন। একটু পরে দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ফোন করলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের অফিসের নম্বরে।

জাজের তাগাদা শুনে দেরি না করে বস্‌কে ফোন দিল ব্যারি ক্যাসলের সেক্রেটারি।

'কীসের এতো দরকার তোমার, স্যাম?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। 'জরুরি মিটিঙে আছি আমি।'

'আমি জেনে গেছি তুমি কী করেছ!' প্রায় ফিসফিস করে বললেন জাজ। 'আমি আর এসবের মধ্যে নেই! কর্তৃপক্ষের কাছে যাব আমি, সব স্বীকার করব! অতীতে যা হয়েছে হয়েছে, কিন্তু কোনও খুনের দায় নেব না আমি!'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ-গতিতে চিন্তা করলেন ব্যারি ক্যাসল, জানল কী করে গাধাটা? ফ্রেডি জানে না। কড়া স্বরে বললেন তিনি, 'মুখটা বন্ধ রাখো, গাধা! টেলিফোনে এ নিয়ে আর একটা কথাও নয়!'

ককিয়ে উঠলেন জাজ, 'খোদা! কেন করলে? কেন করলে কাজটা? কী করে এরকম একটা কাজ করতে পারলে তুমি!'

ফোন রাখবার আগে হাঁদাটাকে বোঝানো দরকার বলে মনে হলো ব্যারি ক্যাসলের। নিচু স্বরে বললেন, 'দেখো, স্যাম, যা হয়েছে তা না হয়ে উপায় ছিল না। বিশ্বাস করো, আর কোনও পথ খোলা ছিল না আমাদের সামনে। সবাই আমরা গলা পর্যন্ত ডুবে আছি বিপদে, এখন মাথা গরম করে হুটহাট কিছু করা যাবে না। অবস্থাটা এখন এরকম, হয় সাঁতার কাটো, নয় ডুবে মরো। ডুবে মরতে রাজি নই আমি।'

ব্যারি ক্যাসলের কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে খুন সে সত্যিই করিয়েছে। জাজের মনে হলো জ্ঞান হারাবেন এক্ষনি। হড়বড়

করে বললেন, 'আমি নেই... এসবে... শেষপর্যন্ত খুন!'

'না থেকে তোমার কোনও উপায়ও নেই, স্যাম,' শান্ত স্বরে জানালেন ব্যারি ক্যাসল। 'কোনও উপায় নেই। আমাদের মতোই গলা পর্যন্ত ডুবে আছ তুমিও। এখন যদি কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকারোক্তি দাও, বিবেকের দংশন থেকে হয়তো বাঁচবে, কিন্তু বিচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ভেবে দেখো, তোমার মেয়েদের কী হবে তা হলে। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবনা-চিন্তা করো। আগামীকাল আমি সিনসিনাটিতে চলে আসছি, তখন বিস্তারিত আলাপ করা যাবে এ নিয়ে।'

ফোন রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন জাজ গেটসবি। থরথর করে সর্বশরীর কাঁপছে তাঁর। সন্দেহটা সত্যে পরিণত হওয়ায় তাঁর শেষ শক্তিটুকুও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা ওভাবেই বসে থাকলেন তিনি লাইব্রেরিতে। বারবার অতীত ঘাঁটলেন, নিজের দোষগুলো যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চাইলেন, এবং স্বীকার করে নিলেন, তিনি একটা লোভী কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর বাবা যখন তাঁকে খুলে বলেছেন বিচারের নামে কী করেছিলেন, তখনই উচিত ছিল বাবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। দুর্বল মনের মানুষ বলে তিনি তা পারেননি। তাঁর বড় দুর্বলতা ছিল শার্লি। শার্লিকে পাবার রঙিন স্বপ্নে নীতিবোধ ভুলেছিলেন তিনি। সর্বক্ষণ মনে হতো, কত ভাল হবে শার্লি যা চায় তার সব দিতে পারলে। কত সুখী হবেন তাঁরা দু'জন!

শেষপর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি। কাপুরুষতা করবেন না তিনি। যা করা দরকার, তা করতে দ্বিধায় ভুগবেন না আর। সমস্ত মানসিক জোর একত্রিত করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এলেন তিনি, তাঁর সেরা বিজনেস সুট পরলেন, সাবধানে বাছাই করলেন চমৎকার একটা টাই, তারপর আবার ফিরে এলেন লাইব্রেরিতে। ডেস্ক থেকে কাগজ ও কলম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। লেখা শেষ হবার

পর সন্তুষ্ট হলেন আরেকবার পড়ে দেখে। পঞ্চাশ হাজার ডলারের চেক কাটলেন শার্লির জন্য। চেকের পাতাটা রেখে দিলেন ডেস্কের উপর। সকালে তিনি একটা গ্রিক নাটক পড়ছিলেন, ওটা থেকে একটা লাইন আওড়ালেন:

'আত্মার যখন মৃত্যু ঘটে, তখন বেঁচে থাকতে চেষ্টা না করে চিরনিদ্রায় মগ্ন হওয়াই ভাল।'

দরজার পাশের ক্যাবিনেট থেকে পছন্দের শটগানটা বের করলেন জাজ স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি, ফিরে এসে ডেস্কের পিছনে বসলেন আবার। বন্দুকের দুটো নলই পুরে দিলেন মুখে, তারপর ডানপায়ের বুড়ো আঙুল ট্রিগার গার্ডে ঢুকিয়ে চাপ দিলেন ট্রিগারে।

সেদিন বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের মিটিঙে দ্বিতীয়বারের মতো বাধা দিল ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের সেক্রেটারি। এবার জরুরি দরকারে ফোন করেছেন সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক। নিজের অফিসে ফিরে কলটা রিসিভ করলেন ব্যারি ক্যাসল।

'আজ দুপুরের পর মুখে শটগানের নল পুরে আত্মহত্যা করেছে স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি,' খড়খড়ে গলায় বললেন সিনেটর গ্রুসাক। 'খবরটার প্রচার এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে আমার এইড।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, তারপর স্বস্তির শ্বাস ফেলে ধীর স্বরে বললেন, 'এটাই হয়তো আমাদের সবার জন্যে ভাল হলো, ফ্রেড। কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোন করেছিল মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষটা, ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কোনও বুড়ি ঘ্যানঘেনে সুরে প্রলাপ বকছে। বলছিল কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বলে দেবে সমস্ত কিছু। মুক্তির সহজ পথটাই বেছে নিয়েছে ও।'

'সিনসিনাটি পুলিশে আমার এক বন্ধু আছে, ফোন করেছিলাম

তাকে,' বললেন ফ্রেডারিক গ্রুসাক। 'কোনও জবানবন্দি লিখে রেখে যায়নি স্যাম, কিছু পাওয়া যায়নি অন্তত। তবুও ভাল হয় তুমি নিজে গিয়ে খুঁজে দেখলে। হারামজাদা যদি কিছু লিখে রেখে যায় কোথাও... ওর বউয়ের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। মহিলার সমর্থন আমাদের কাজে আসবে পরে।'

'একটু পরেই রওনা হব,' বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'শার্লির সঙ্গে আলাপ সেরে ফোন দেব তোমাকে।'

ফোন রেখে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি, তারপর সেক্রেটারিকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, সিনসিনাটিতে যাচ্ছেন, আগামীকাল পর্যন্ত বোর্ড মিটিং মুলতবি রাখতে হবে।

ছোট শহর অয়েস্টার বে, ওটা ছাড়িয়ে উত্তরে কয়েক মাইল যাবার পর কযওয়ে পার হয়ে সেন্টার আইল্যান্ডে চলে এলো রানা ও লিমা। প্রধান সড়ক থেকে সরতে হলো না ওদের, দেখতে দেখতে পিছিয়ে গেল দু'পাশের চমৎকার সব বাগান কোলে নিয়ে বসে থাকা অট্টালিকা, তারপর দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে চলে এসে একটা প্রাইভেট রোডে পড়ল ওদের গাড়ি। আঁকাবাঁকা রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। কয়েকশো গজ এগোনোর পর পাথরের একটা পিলারের গায়ে টাঙানো সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা: ***প্রাইভেট রোড—নো ট্রেসপাসিং—ফ্রাঙ্ক ক্যান্টোরেক।***

ড্রাইভওয়ে ধরে আরও আধমাইল যাওয়ার পর প্রকাণ্ড একটা জর্জিয়ান ম্যানশনের সামনে পার্কিং এরিয়ায় গাড়িটা থামাল লিমা।

কয়েকবার কলিং বেল টিপবার পরও দরজা খুলল না কেউ।

ম্যানশনের চারপাশের বাগান ঘিরে রেখেছে উঁচু একটা লতানো ঝোপের সবুজ প্রাচীর, ওপাশটা দেখা যায় না। ঝোপের প্রাচীরের গায়ে একটা দরজা দেখতে পেয়ে লিমাকে নিয়ে ওদিকে এগোল রানা।

চারজন পাশাপশি হাঁটবার মতো চওড়া পথটা সোজা চলে

গেছে কয়েকশো গজ প্রশস্ত খোলা বাগানের মাঝ দিয়ে, উঠেছে সাগরের তীরে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটা উঁচু টিলার চূড়ায়। বাগানের সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি ঢেউ খেলানো। ফুটে আছে নানান রঙের হৈমন্তী ফুল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় একইসঙ্গে বেশ কয়েকটা ফুলের সুবাস পেল ওরা।

টিলার গোড়ায় কয়েকটা চেয়ার-টেবিল দেখা গেল। কে যেন বসে আছে চেয়ারগুলোর একটায়। তার পাশে শুয়ে ছিল একটা দৈত্যাকার সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর, অপরিচিত আগন্তুকের গন্ধ পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ওটা, মোটা গলায় ছোট্ট একটা গর্জন ছেড়ে কী করা উচিত জানতে চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকাল মালিকের দিকে।

ঘাড় ফেরানোয় বোঝা গেল, চেয়ারে বসে আছেন এক মহিলা। সেইন্ট বার্নার্ডের মাথায় হাত বোলালেন তিনি, আবছা ভাবে তাঁর গলা শুনতে পেল ওরা, বোধহয় কুকুরটাকে শান্ত থাকতে বলছেন।

ওটা ডোবারম্যান পিনশার কিংবা রটওয়াইলার হলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজত সতর্ক রানা, কিন্তু সেইন্ট বার্নার্ড সহজে আক্রমণ করে না জানে বলে লিমাকে নিয়ে মহিলার দিকে এগোল ও। দূরত্ব পাঁচ গজে কমে আসবার পর মহিলার চেহারাটা চেনা-চেনা লাগল ওদের।

আগের সেই হিল্ডা ক্যান্টোরেক আর নেই তিনি, বয়সের কারণে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে এককালের কমনীয় চেহারায়, কুঁজো হয়ে গেছেন খানিকটা, তবে মুখের আদল বদলায়নি। রানা ও লিমাকে দেখে উঁচু হয়ে গেল তাঁর সাদা ভ্রূ জোড়া, কৌতূহলী চোখে তাকালেন, মনে হলো বিরক্ত হয়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাই?'

'আপনাকে,' বিনয়ের সঙ্গে বলল লিমা, সামনে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল. 'আপনিই তো হিল্ডা ক্যান্টোরেক?'

'হ্যাঁ।' হাতটা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে ধরে বার দুয়েক ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দিলেন মহিলা।

'আমি লিমা সোরেনসন, আর ও মাসুদ রানা,' বলল লিমা। 'পেশায় আমরা দু'জন সাংবাদিক। একটা বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো...'

কঠোরতার ছাপ পড়ল বৃদ্ধার চেহারায়। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আপত্তি আছে, কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলব না আমি। আপনারা আসতে পারেন। এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার মনে হয় অনধিকার প্রবেশ করেছেন আপনারা।'

'জী, আর সেজন্যে আমরা সত্যিই দুঃখিত,' হাসিটা ঠোঁটে ধরে রাখল লিমা। 'কিন্তু খুবই জরুরি দরকারে আমাদের আসা।'

'আপনাদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে রাজি নই আমি, মিস সোরেনসন,' আগের চেয়ে কড়া স্বরে বললেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'আপনাদের আমি যেতে বলেছি।'

'চলে এসো, লিমা,' বলল অপমানিত রানা।

'একমিনিট, রানা,' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে বৃদ্ধার দিকে বাড়িয়ে দিল লিমা। 'আমার মনে হয় এগুলো আপনার পড়ে দেখা উচিত।'

একটু দ্বিধা করে কাগজগুলো নিলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, চোখ বোলালেন, চেহারা নির্বিকার থাকল। কয়েকটা অনুচ্ছেদ পড়ে চোখ তুলে বললেন, 'এসব তো আপনাদের জানাই আছে, আর কী নিয়ে কথা বলতে চাইছেন?'

'কিছু তথ্য জানতে চাই আমরা এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখ সম্বন্ধে,' বলল রানা। রানার কথা শেষ হতে না হতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পল হাইনরিখ ও যুবতী হিল্ডা ক্যান্টোরেকের যুগল ছবিটা বের করে এগিয়ে দিল লিমা।

থমকে গিয়ে বহুযুগ আগে তোলা ছবিটা একদৃষ্টে দেখলেন

হিল্ডা ক্যান্টোরেক, যেন অতীতে ফিরে গিয়ে বিভোর হয়ে স্মৃতি রোমন্থন করছেন। চেহারা হাসি-হাসি হলেও চোখের দু'কোণে জল জমল তাঁর। চট্ করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কথা বলে উঠলেন, তবে লিমা বা রানাকে লক্ষ করে নয়।

'কী চমৎকারই না ছিল ছুটির ওই দিনগুলো। হেমন্ত ছিল তখন। হ্যাঁ, হেমন্ত। ঠিক এই মৌসুমটা।' হিল্ডা ক্যান্টোরেক যেন ভুলেই গেছেন রানা ও লিমার উপস্থিতি, কথা বলছেন আপনার সঙ্গে, আত্মমগ্ন হয়ে: 'অপেরায় গিয়েছিলাম আমরা সেদিন। হাজারো নক্ষত্রের নীচে সে-রাতে নেচেছিলাম দু'জন। কথা দিয়েছিলাম...' হঠাৎ থেমে গেলেন বৃদ্ধা, লিমার দিকে তাকালেন। 'ছবিটা কোথায় পেয়েছেন?'

'পল হাইনরিখের মৃত্যুর পর তাঁর ক্যামেরা কেসে পাওয়া গেছে ওটা,' বলল লিমা।

প্রচণ্ড কষ্টে মুখটা কুঁচকে গেল হিল্ডা ক্যান্টোরেকের, দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি। বেসুরো গলায় বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালে জার্মানির ল্যান্ডসবার্গ জেলে মারা যায় ও।'

'দুঃখিত, আপনি ভুল জানেন,' নরম সুরে বলল রানা। 'উনি মারা গেছেন কয়েক সপ্তাহ আগে, হার্ট অ্যাটাকে। অ্যাসপেন, কলোরাডোতে বহুকাল ধরে বাস করেছেন উনি। ওঁর লাশটা পাহাড়ে পাই আমরা, শহরে আমি নিজে পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, রানা ও লিমাকে দেখলেন পালা করে, তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ে অনুরোধের সুরে বললেন, 'বসুন আপনারা। প্লিয, আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

মুখোমুখি বসে বৃদ্ধার একের পর এক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে চেষ্টা করল রানা, জানাল অ্যাসপেনে পল হাইনরিখের নিঃসঙ্গ জীবন সম্বন্ধে যতটুকু যা জানে। তারই ফাঁকে লিমা দু'এক

কথায় জানিয়ে দিল, তদন্ত করছে ওরা, ওদের তদন্তের উদ্দেশ্য যুদ্ধশেষে বন্দি পল হাইনরিখের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না তা জানা। এটাও জানাল, তিনজন আমেরিকান কর্মকর্তা এসএস লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ফাঁসি হোক তা চেয়েছিল কোনও কারণে।

ওর কথা শুনে অন্যমনস্ক ভাবে মাথা দোলালেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, তবে বললেন না কিছু, ডুবে থাকলেন নিজের চিন্তায়। কোলের উপর রাখা ছবিটা থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। একটু পরে বললেন, 'জেনে সত্যিই ভাল লাগছে যে ছবিটা এতদিন, এত বছর ও নিজের কাছে রেখেছিল।' এবার আর কান্না চাপতে পারলেন না বৃদ্ধা, ঝরঝর করে অশ্রু ঝরল তাঁর দু'চোখ থেকে। বেশ কয়েক মিনিট ফুঁপিয়ে কাঁদলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে রুমালে চোখ মুছে রানা ও লিমাকে দেখলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'ছবিটা আমি রাখতে পারি? এ ছবি আমার কাছে অনেক বড় কিছু।'

রানার দিকে তাকাল লিমা। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। ছবিটার অনেকগুলো কপি করেছে ও, কাজেই কোনও অসুবিধে নেই।

'নিশ্চয়ই রাখতে পারেন,' বলল লিমা।

কৃতজ্ঞ চিত্তে হাসলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'ধন্যবাদ, সত্যিই অনেক ধন্যবাদ।'

সামান্য ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের, জবাবগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে পাব, মিস ক্যান্টোরেক?'

এবার বিনা দ্বিধায় বললেন বৃদ্ধা, 'পাবেন। গোপন করার কিছু নেই আমার।'

'আপনি আর পল হাইনরিখ তো পরস্পরকে ভালবাসতেন বলে মনে হয়,' বলল রানা, 'আমার এ-ও মনে হচ্ছে, আপনি

তাঁকে এখনও ভালবাসেন। বুঝতে পারছি কেন তাঁকে আপনি আর খোঁজেননি। আপনি তো ভেবেছিলেন সেই পঞ্চান্ন সালেই ল্যান্ডসবার্গ জেলখানায় মারা গেছেন পল হাইনরিখ। ...কিন্তু তিনি? এতগুলো বছর তিনি কেন আপনাকে খুঁজে বের করেননি? একদিনের দূরত্বে বাস করেছেন তিনি গত অর্ধশতাব্দী। তা হলে একবারও আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি কেন তিনি?'

বিষণ্ন হাসলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'সেই উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে বড় ভাইয়ের সঙ্গে এখানে বাস করছি আমি। মনে পড়ে না দশবারের বেশি এ-বাড়ির সীমানার বাইরে গিয়েছি। আমার অতীত নিয়ে অনেক কথা জানেন আপনারা, কাজেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কারও সঙ্গে কেন আমি মিশতে চেষ্টা করিনি। তবে ফ্রাঞ্জ যদি আমাকে মিথ্যে না বলত, যদি আমি জানতাম পল বেঁচে আছে, তা হলে দ্বিধা না করে পলের কাছে ছুটে যেতাম। জানি না কেন, কী জন্যে মিথ্যে বলেছিল ফ্রাঞ্জ। ...একটাবারও আমার সঙ্গে কেন দেখা করেনি পল, সেটা অবশ্য আমি আন্দাজ করতে পারি। আপনারা ধৈর্য ধরে শুনতে রাজি হলে বলব, নিশ্চয়ই বলব।'

'বলুন প্লিয,' বলল লিমা। 'তথ্যগুলো হয়তো অনেক কাজে আসবে আমাদের।'

কফি পট থেকে তিনটে মগে কড়া কালো কফি ঢাললেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, দুটো মগ রানা ও লিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চুমুক দিলেন নিজের মগে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গুছিয়ে নিলেন বক্তব্য, তারপর বললেন, 'পলের সঙ্গে সেই অদ্ভুত দিনগুলোর কথা বারেবারে ভেবেছি আমি এতগুলো বছর। এমন একটা দিন নেই, যেদিন পলের স্মৃতি মনে পড়েনি আমার। সে-সময়টা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। আজও মনে পড়ে...'

রানা ও লিমার মনে হলো, অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে আবার আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। যুদ্ধের

শেষদিকের সেই দুর্যোগপূর্ণ বিশৃঙ্খলার দিনগুলোর প্রতিটি ঘটনা বলে চললেন তিনি ধীরে ধীরে।

আঠারো

বার্লিন। ১০ এপ্রিল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ।

ডব্লিউভিএইচএ হেডকোয়ার্টার থেকে বের হয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বার্লিন শহরের ধ্বংসাবশেষের দিকে ছুটে চলল এসএস-এর ট্রুপ ক্যারিয়ার। একসময়ের সাজানো-গোছানো, চমৎকার বার্লিন শহরটার দুরবস্থা দেখে মুখ কুঁচকে উঠল লেফটেন্যান্ট কর্নেল, এসএস পল হাইনরিখের। এই কিছুদিন আগেও সামরিক গুরুত্ব ছিল বার্লিনের। এখন নেই।

এখানে ওখানে অসংখ্য আগুন জ্বলছে শহরে, ওগুলো থেকে এঁকেবেঁকে আকাশে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া, মনে পড়িয়ে দিচ্ছে রাতের ভারী বম্বিঙের আতঙ্কজনক দুঃসহ মুহূর্তগুলোর কথা।

বোমারু বিমানবহর চলে যাবার পর ধীরে ধীরে নিজেদের করাল থাবা বিস্তার করছে আগুনে বোমাগুলো। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বার্লিনের মাঝখানটা। টিয়ারগার্টেন-এর কাছে এসে পোড়া গন্ধকের কটু গন্ধে ট্রাকের জানালার কাঁচ উঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন পল হাইনরিখ।

মাটির তলার শেল্টার ও বিভিন্ন বাড়ির বেযমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে বিপর্যস্ত মানুষ, বাতাসে ভাসমান সিমেন্ট-বালির গুঁড়ো ও পোড়া কয়লার সূক্ষ্ম ধুলো থেকে রক্ষা

পাবার জন্য অনেকেই পরে আছে গগলস ও মাফলার। চারপাশের ধ্বংসলীলা যেন তেমন কোনও ছাপ ফেলছে না নিয়মিত এয়ার রেইডে অভ্যস্ত জনসাধারণের মনে, আচার-আচরণে কোনও ভয় বা বিশৃঙ্খলা অন্তত নেই তাদের।

প্রতিদিন দফায় দফায় বিমান হামলা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে গোটা শহরের উপর। চমৎকার সব নয়নাভিরাম অট্টালিকাগুলোর অবশিষ্টাংশ বলতে আছে শুধু পোড়া, বাঁকানো কিছু স্টিলের খটখটে কঙ্কাল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বার্লিনকে কেউ দেখে থাকলে এখন আর চিনতে পারবে না কিছুতেই।

নিজেদের সামান্য যা কিছু আছে, তা পিঠের পুঁটুলিতে নিয়ে বা হ্যান্ডকার্ট-এ চাপিয়ে শহরের পুব থেকে প্রতিদিন আসছে হাজার হাজার শরণার্থী, চলে যাচ্ছে পশ্চিমে, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। নিরীহ জনসাধারণ তারা, যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয় কোনওভাবে, কিন্তু ক্ষমতালোভী হিটলারের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কপাল পুড়েছে তাদেরও।

ভাঙাচোরা নানান জিনিসে গাড়ি চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে গেছে রাস্তাগুলো, তবুও বোমার তৈরি গর্ত, স্তূপীকৃত ইঁট-বালি-সিমেন্ট এড়িয়ে সাবধানে ট্রাক নিয়ে এগিয়ে চললেন পল হাইনরিখ। ভালমতই বুঝতে পারছেন তিনি, চরম দুরবস্থা এখনও আসেনি, শত্রু-সৈন্য শহরে পৌঁছে গেলে সীমা ছাড়ানো অত্যাচারের শিকার হবে নগরবাসী।

এসএস হেডকোয়ার্টার থেকে টিয়ারগার্টেন-স্ট্রাস ফোর-এ আসতে স্বাভাবিক অবস্থায় পনেরো মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়, কিন্তু বেশিরভাগ রাস্তা যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় পল হাইনরিখের লাগল প্রায় দু'ঘণ্টা। টি-ফোর হেড-কোয়ার্টারের ফটকের সামনে হিল্ডাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি, গতি কমালেন ট্রাকের।

হাই কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী সারারাত কাজ করেছে হিল্ডাও.

সংগঠনটার বিভিন্ন প্রোগ্রামের ফাইল ও ফিল্ম ধ্বংস করেছে সহযোগীদের সঙ্গে।

এসএস-এর ট্রাকটা দেখেই দৌড়ে পাশে চলে এলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, ট্রাক থামবার আগেই দরজা খুলে উঠে পড়লেন ক্যাব-এ। ঝুঁকে চুমু দিলেন তিনি পল হাইনরিখের গালে, তারপর শক্ত করে প্রেমিকের বাহু ধরে রেখে বসলেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'ভাবতে ভাল লাগছে যে এই মরণ-ফাঁদ থেকে শেষপর্যন্ত বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, পল। ...ঠিকমত শেষ হয়েছে তোমার সব কাজ?'

ট্রাক থামিয়ে আস্তে করে মাথা দোলালেন পল হাইনরিখ, পাশে রাখা ব্রিফকেস খুলে দেখালেন ভিতরের জিনিসগুলো। রাইখ্‌স্-ফুয়েরারের সই করা নকল মিলিটারি অর্ডার জোগাড় করে এনেছেন তিনি। ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, নিরাপদে রাখবার জন্য এসএস-এর টপ সিক্রেট ফাইলগুলো বাভ্যারিয়ায় নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখকে। হিল্ডা ক্যান্টোরেকের ট্র্যাভেল অথোরাইযেশনের কথাও লেখা রয়েছে নির্দেশে। হিল্ডার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। ব্রিফকেসে আরও আছে নকল পরিচয়-পত্র। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ওগুলো ব্যবহার করবেন তাঁরা।

দু'জনই তাঁরা জানেন, বিপক্ষের সৈন্যদলের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, আসলে জার্মান আর্মির রোড ব্লকগুলোই তাঁদের জন্য বড় বাধা। আর্মির অনেকগুলো গোয়েন্দা-দল সেনাবাহিনীর পলায়নপর অফিসার ও সৈনিকের খোঁজে প্যাট্রলে নেমেছে, সংরক্ষিত এলাকাগুলোয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া যে-কোনও যানবাহন চলাচলে বাধা দিচ্ছে তারা।

বার্লিন ছেড়ে রওনা হয়ে যাবার আগে ভিলমার্সডর্ফ ডিসট্রিক্টে তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কিছুক্ষণের জন্য ট্রাক থামালেন

পল হাইনরিখ, ওখান থেকে সংগ্রহ করলেন দুটো ট্রাঙ্ক বোঝাই তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, তারপর রওনা হলেন আবার।

শামুকের গতিতে ট্রাক চালিয়ে বার্লিনের বাইরের দিকের ডিসট্রিক্টগুলো একসময় পিছনে ফেলে এলেন তাঁরা, উঠে পড়লেন রাইখস্ট্রাস ৯৬-এ। এবার দক্ষিণে রওনা হলেন পল হাইনরিখ, ক্রমেই চলে যাচ্ছেন আগুনে দগ্ধ, মৃতপ্রায় বার্লিন শহরটা পিছনে ফেলে দূরে।

চার লেন-এর হাইওয়েতে দক্ষিণগামী শরণার্থীদের মিছিল দেখলেন তাঁরা। মাঝে মাঝে দু'একটা স্টাফ-কার বা সাপ্লাই কনভয় শুধু চলেছে বার্লিনের দিকে, এ ছাড়া রাস্তা প্রায় যানবাহন-শূন্য। গত সপ্তাহেও এই রাস্তাটা ছিল ট্রাফিক জ্যামের কারণে কুখ্যাত। নাৎসি পার্টির প্রভাবশালী অনেক নেতা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে শহর থেকে পালাচ্ছিল তখন, সঙ্গে ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের অফিশিয়াল জিনিসপত্র, ফাইলিং ক্যাবিনেট, আসবাবপত্র ও ব্যক্তিগত সমস্ত কিছু।

জার্মান হাই কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স-এর কাছে, জসেন-এ একটা এসএস রোডব্লকে প্রথমবারের মতো থামানো হলো পল হাইনরিখের ট্রাক। লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ইনসিগনিয়া দেখে কাগজপত্রে দায়সারা ভাবে চোখ বুলিয়ে হাতের ইশারায় এগিয়ে যেতে বলল রোড ব্লকের অফিসার-ইন-চার্জ।

পাইনের ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গেছে পথ, ওই পথে আরও তিরিশ মাইল দক্ষিণে এসে লুক্যাউ পৌঁছলেন পল হাইনরিখ। এরপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে, এল্‌ব্‌ নদীর দিকে চললেন। তিনি জানেন, আমেরিকান আর্মি এখনও নদীর এদিকে এসে পৌঁছায়নি। মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, তারা এসেছে ম্যাগডেবার্গ পর্যন্ত। নদীটা টোগ্যাউ শহরের কাছে পার হলেন তিনি, তারপর রাশান ও আমেরিকান আর্মির মাঝখানের প্রশস্ত করিডর ধরে ড্রাইভ করে চললেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

রাইখসফুয়েরার হিমলারের অফিসে একটা গোপনীয় মানচিত্র দেখেছিলেন জেনারেল কার্ল শ্যুট, ওটার কথা হিল্ডাকে জানালেন পল হাইনরিখ।

মানচিত্রটা আর্ডেনেস-এর যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছ থেকে দখল করা হয়। ওটাতে উল্লেখ আছে অপারেশন এক্লিপ্স নামের এক পরিকল্পনার। ছক কেটে দেখানো হয়েছে, যুদ্ধ শেষে দু'টুকরো করে ফেলা হবে অখণ্ড জার্মানিকে। উত্তরের লিউবেক থেকে বর্তমান জার্মানির মাঝখানে শুয়েইনফুর্ট পর্যন্ত টানা হবে একটা লাইন। লাইনের পুবে জার্মানির অর্ধেকটা শাসন করবে রাশিয়া, পশ্চিম ভাগ-বাটোয়ারা হবে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে।

ওই মানচিত্র দেখেই নিজের গন্তব্য স্থির করেছেন পল হাইনরিখ। ব্রিটিশরা শাসন করবে উত্তর অংশ, ফ্রান্সের শাসনে থাকবে অস্ট্রিয়ার একাংশ, আমেরিকানরা শাসন করবে দক্ষিণ—কাজেই বাভ্যারিয়া পড়বে আমেরিকানদের শাসনভুক্ত এলাকায়। বাভ্যারিয়ায় ধরা পড়বার ভয় কম বলে মনে হয়েছে পল হাইনরিখের। যুদ্ধের ইতিহাস থেকে তিনি জানেন, আমেরিকানরা যুদ্ধবিজয়ে অভিজ্ঞ জাতি নয়, ফলে শত্রুদের খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে সহজ হবে না।

মানচিত্র থেকে চোখ তুলে প্রেমিকের দিকে তাকালেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'তোমার কি মনে হয় আমার নামও যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় থাকবে, পল?'

'না,' একমুহূর্ত ভেবে জবাব দিলেন পল হাইনরিখ। 'আগে বড় বড় নেতাদের ধরবে শত্রপক্ষ। টি-ফোর নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন তাদের। ...আর, তুমি তো কোনও যুদ্ধাপরাধ করোনি। তোমার নাম ওই তালিকায় থাকার কোনও কারণ নেই।' প্রাণপ্রিয় হিল্ডাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন তিনি গালে। 'সমস্ত ডকুমেন্টও তো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তুমি টি-ফোরে নিয়োগ পেয়েছিলে, তা জানবে না বোধহয় কেউ। চিন্তা কোরো

না, হিল্ডা, কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেই যত শীঘ্রি সম্ভব জার্মানি থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

লাইপসিগ-এর কয়েক মাইল পুবে এসে হাইওয়ে ছেড়ে সাইডরোডে পড়লেন পল হাইনরিখ, শহরটা এড়িয়ে উত্তরে, ভাইমার-এর দিকে এগোলেন। ভাইমারের কাছাকাছি পৌঁছবার পর আরেকটা রোড ব্লকে থামানো হলো ট্রাক। রোড ব্লকটা ফিল্ড পুলিশের। ব্লকের ওপাশে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ভিড় করে রয়েছে। রাস্তার পাশ দিয়ে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে জার্মান সেনাবাহিনীর শত শত সৈনিক—জার্মান আর্মি দ্রুত পিছু হটছে, তার প্রমাণ।

তরুণ এক সার্জেন্ট ট্রাকের পাশে এসে বিনয়ের সঙ্গে ট্র্যাভেল অথোরাইযেশন দেখতে চাইল। কাগজে চোখ বুলিয়ে আফসোস করে মাথা নাড়ল সে, জানাল বাভ্যারিয়ার দিকে যাবার কোনও উপায় নেই, লেফটেন্যান্ট কর্নেলের উচিত পশ্চিমে আর না গিয়ে এক্ষুনি দক্ষিণে রওনা হয়ে যাওয়া। তার কাছে আরও জানা গেল, প্যাটন-এর থার্ড আর্মি ভাইমার দখল করে নিয়েছে, বুশেনওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে বন্দিদের। কোনও এসএস অফিসারকে হাতে পেলে আমেরিকানরা কী করে বসবে, তা বলতে পারে না কেউ।

তথ্যগুলোর জন্য তরুণ সার্জেন্টকে ধন্যবাদ দিলেন পল হাইনরিখ, তারপর ট্রাক ঘুরিয়ে রওনা হলেন ফিরতি পথে। রোড ব্লক থেকে মাইল দুয়েক পিছিয়ে এসে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেকেন্ডারি একটা রোড ধরে আবার বাভ্যারিয়ার দিকে এগোলেন তিনি।

গর্ত-ভরা অব্যহৃত, সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তার কারণে মন্থর হয়ে গেল তাঁদের অগ্রগতি। তবে নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দিল মাথার উপরের ঘন পাতার আচ্ছাদন। চকিতে হানা দেয়া শত্রুপক্ষের ফাইটার বিমানগুলো দেখতে পাবে না ট্রাক, ফলে মেশিনগানের

গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে না তাঁদের।

মাঝে মাঝে উঁচু জায়গা বেছে ট্রাক থামালেন পল হাইনরিখ, ঘুরেফিরে দেখে বুঝে নিলেন আমেরিকান সৈন্যদল এদিকে চলে এসেছে কি না। এপর্যন্ত কোনও ইউনিটের মুভমেন্ট চোখে পড়েনি তাঁর, দু'পাশের গ্রাম্য এলাকা নিথর, নির্জন পড়ে আছে চুপচাপ। পথে ছোট ছোট কয়েকটা গ্রাম পড়ল, ওগুলোর প্রায় সব বাড়িতেই উড়ছে নানান আকৃতির পতাকা। গ্রামবাসী জানাতে চাইছে, তারা আত্মসমর্পণ করেছে। আমেরিকান আর্মি এলে ছেঁড়া জাঙ্গিয়া, ময়লা সাদা চাদর, নোংরা তোয়ালে দেখে বুঝবে, গ্রামের মানুষ শত্রুভাবাপন্ন নয়।

সালফেল্ড-এর পশ্চিমের গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকা দিয়ে আরও দক্ষিণে ট্রাক চালিয়ে সরে গেলেন পল হাইনরিখ। দুপুরের দিকে থামলেন তাঁরা, ট্রাকে বসেই লাঞ্চ সেরে নিলেন হিল্ডার আনা স্যান্ডউইচ ও ওয়াইন দিয়ে, তারপর রওনা হলেন আবার।

বিকেলের দিকে সনেবার্গ-এর পুব দিয়ে আরও দক্ষিণে সরে ক্রমেই ঢুকে পড়লেন তাঁরা বাভ্যারিয়ার গভীর অরণ্যের আরও অভ্যন্তরে।

সন্ধে নামবার ঘণ্টা দুয়েক পর রেগেন্সবার্গ-এর তিরিশ মাইল দক্ষিণে চলে আসতে পারলেন তাঁরা। ততক্ষণে বাজে রাস্তায় একটানা ড্রাইভিঙের ধকলে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছেন পল হাইনরিখ। রাস্তা থেকে সরে জঙ্গলে ট্রাক ঢুকিয়ে রাতের মতো থামলেন তিনি, আবার রওনা হলেন পরদিন ভোর হতে না হতেই। সেদিনই দুপুরের দিকে তাঁদের অতিকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন দু'জন।

ভ্যাগিং শহর স্যালৎসবার্গ-এর পনেরো মাইল উত্তর-পশ্চিমে, অস্ট্রিয়ান সীমান্ত ঘেঁষে, বাভ্যারিয়ান আল্পস্-এর পাদদেশে। বেঁটে টিলাগুলোর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে আছে যেন শহরটা।

এদিকের অঞ্চলটা যুদ্ধ শুরুর আগে যেরকম ছিল, ঠিক তেমনই আছে এখনও। ছুটি কাটাতে আসা টুরিস্টদের অভাব ও যুদ্ধে যোগ দেয়া তরুণদের অনুপস্থিতির কথা বাদ দিলে মনেই হবে না এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে ভ্যাগিঙের চারপাশে।

হ্রদের তীরের ছোট শ্যালেটা পল হাইনরিখের বড় ভাই রুডির। স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে মারা গেছে রুডি।

শ্যালের অবস্থান সত্যিই চমৎকার—সামনে নীল হ্রদ, দূরে আল্পসের তুষার ধবল চূড়া, চারপাশে রংবেরঙের ফুলে সেজে ওঠা প্রকৃতির অপূর্ব রূপ—সবমিলিয়ে পরিবেশটা মনোমুগ্ধকর। আশপাশে জনবসতি নেই, সেটাও স্বস্তিকর তাঁদের জন্য। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ এখানে অপেক্ষা করে জার্মানি থেকে বেরিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে পারবেন পল হাইনরিখ ও হিল্ডা।

ব্যক্তিগত মালপত্রে বোঝাই দু'জনের ট্রাঙ্ক দুটো ট্রাক থেকে নামিয়ে শ্যালেতে আগে রাখলেন তাঁরা, তারপর দিনের বাকি অংশ ব্যয় করলেন ট্রাক থেকে অন্যান্য মালামাল নামাতে। জিনিসগুলো শ্যালের পিছনে একটা কালভার্টের তলায় নিয়ে রাখলেন দু'জন, কালভার্টের তলার ফাঁকটা আড়াল করলেন গাছের ডালপালা ও শীতের ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা গাছের কাণ্ড দিয়ে।

শ্যালের পিছনের পোর্টিকোতে তারপুলিনে ঢেকে রেখে গিয়েছিল রুডি একটা মার্সিডিয সেডান, কয়েক ঘণ্টা চেষ্টা করে ওটার ইঞ্জিনটাকে জ্যান্ত করে তুলতে পারলেন পল হাইনরিখ।

সে-রাতে তাঁর ট্রাকের পিছু পিছু মার্সিডিয নিয়ে রওনা হলেন হিল্ডা, হ্রদ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে পাহাড়ি রাস্তা থেকে গভীর খাদে ট্রাকটা ফেলে দিলেন তাঁরা।

শান্ত, নির্জন প্রকৃতির মাঝে অলস দিনগুলো সুন্দর কাটতে লাগল তাঁদের, কয়েকদিনের মধ্যেই নিরুদ্বেগ নিরাপত্তার একটা অনুভূতি জন্মাল দু'জনের মনে। সকালে হ্রদের তীরে টিলার পাশ

দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটেন দু'জন, গল্প করেন, বিকেলে অবসর কাটান বই পড়ে, রাতে রেডিওতে শোনেন বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর।

যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে চলে আসায় বিভিন্ন পক্ষের তৎপরতা বেড়ে গেছে অনেক। কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতে তাঁদের চেনা জার্মানি নামের দেশটা তার অস্তিত্ব হারাল। আত্মহত্যা করেছেন হিটলার, বার্লিনের পতন ঘটেছে রাশান আর্মির কাছে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে এক কালের মহাপরাক্রমশালী জার্মানি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে এবারের যুদ্ধের পরাজয়টা হয়েছে অনেক ব্যাপক, জার্মান নাগরিকরা হয়েছে অনেক বেশি পর্যুদস্ত, বিপর্যস্ত।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। গোটা জার্মানিতে শুরু হয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা। সারাদেশে লক্ষ লক্ষ শিকড়হীন, সর্বহারা মানুষ সামান্য একমুঠো খাবারের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। ক্ষুধার্ত জনতার ভিড়ে মিশে সহজেই পালাচ্ছে উচ্চপদস্থ নাৎসি কর্মকর্তারা। তাদের খুঁজে বের করবার তৎপরতা চলছে প্রধানত দুটো অঞ্চল জুড়ে—উত্তরে হ্যামবার্গ ও ফ্লেন্সবার্গ-এর মাঝখানে, দক্ষিণে মিউনিখ ও ব্যাখটাসগাডেন এলাকায়।

পল হাইনরিখ যখন বাভ্যারিয়ার এদিকে পালিয়ে আসবার পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি ভাবতেও পারেননি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে লিস্টে নাম আছে এমন আরও অনেক নাৎসি কর্মকর্তা তাঁর মতোই বেছে নেবে এদিকটা। চারপাশে মানুষ শিকারের উৎসব লেগে গেছে যেন। অ্যালাইড আর্মির সবগুলো ব্যারাকে পৌঁছে গেছে লিস্টের সবার ছবি অথবা চেহারার বর্ণনা, পৌঁছে গেছে শরণার্থী শিবির, যুদ্ধবন্দি শিবিরগুলোতেও। লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল হাইনরিখের ছবিও আছে তার মধ্যে।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে কোনও একদিন গ্রামের মুদি দোকান থেকে কেনাকাটা শেষে ফিরে এসে হিল্ডা জানালেন, হ্যামবার্গে একটা ব্রিটিশ চেকপয়েন্টে ধরা পড়েছেন হিমলার ইন্টারোগেশন

সেন্টারে নিয়ে যাবার পর দাঁতের ফাঁকে লুকানো বিষাক্ত ক্যাপসুল চিবিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আরও ধরা পড়েছে ওট্টো ওহ্‌লেনডর্ফ, কার্ল ব্র্যান্ডট, কার্ল গেবহার্ট সহ এসএস এর প্রায় সবক'জন উচ্চপদস্থ অফিসার। বিচারের জন্য নুরেমবার্গে পাঠানো হয়েছে এঁদের।

খবরটা শুনে পল হাইনরিখ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, প্রথম সারির কর্মকর্তাদের ধরা পড়বার মানে, এরপর অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থদের দিকে নজর দেবে বিজয়ী পক্ষ, কাজেই জার্মানি থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে দেরি করা আর মোটেই উচিত হবে না।

হিল্ডা ও তিনি আলোচনা করে ঠিক করলেন, স্যালৎসবার্গে প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবেন হিল্ডা, খোঁজ নেবেন গোপনে এই এলাকা থেকে মানুষ পাচারের জন্য কোনও সংগঠন কাজ করছে কি না।

পরদিন সকালে স্যাল্‌ৎস্‌বার্গ রওনা হলেন হিল্ডা।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হলো তাঁকে। কোনও সাহায্য করতে পারল না হিল্ডার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়রা। তারা শুনেছে, জার্মান কর্মকর্তাদের পাচার করে এমন একটা সংগঠন আছে অস্ট্রিয়ার অওসি রিজিয়নের কোথাও, তবে বিস্তারিত কিছু বলতে পারেনি কেউ। আসলে নিশ্চিতভাবে জানে না, সত্যিই ওরকম কোনও সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে কি না। হিল্ডাকে তারা জানিয়েছে, ওই একই গুজব আমেরিকান আর্মির কানেও গেছে, ফলে ওদিকে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজছে তারা। পরিচিতদের বলে এসেছেন হিল্ডা, পরে যোগাযোগ করবেন তিনি, ওরা যেন গোপন ওই সংগঠনের ব্যাপারে আরও খোঁজ নেয়।

গ্রীষ্মের মাসগুলো যেন হয়ে উঠল অতি দীর্ঘ। কর্মহীন, নিরানন্দ হয়ে পড়লেন পল হাইনরিখ, মাঝে মাঝে হ্রদের তীরে হাঁটতে যাবার কথা বাদ দিলে দিনের বেশিরভাগ সময় চুপচাপ

শ্যালেতে বসেই কাটতে লাগল তাঁর। সপ্তাহে একদিন গ্রামে গিয়ে টুকটাক কেনাকাটা করেন হিল্ডা, খবরের কাগজ নিয়ে আসেন, এ ছাড়া সর্বক্ষণ কাটে তাঁর পল হাইনরিখের নীরব সাহচর্যে।

প্রথম যখন তাঁরা ভ্যাগিঙে আসেন, সেসময়ের নিশ্চিন্ত প্রশান্তি কখন যেন দূর হয়ে গেল তাঁদের মন থেকে, প্রতিটা ক্ষণ কাটতে লাগল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা ও বিরক্তির মাঝে।

নভেম্বর মাসে নুরেমবার্গে ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলো নাৎসি পার্টির প্রথমসারির নেতাদের। এরপর আইএমটি যখন এসএসকে অপরাধী সংগঠন বলে ঘোষণা করল, চরম হতাশ হয়ে পড়লেন পল হাইনরিখ। স্পষ্ট বুঝলেন তিনি, এসএস-এর সব ক'জন অফিসারকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে। খবরের কাগজে আরও এলো, আইএমটি-র বিচার শেষ হলে আমেরিকানরা তাদের নিজস্ব আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠল আরও।

এরইমধ্যে এলো বসন্ত; কোকিল ডাকল, ফুল ফুটল, বইল দখিনা হাওয়া, জীর্ণ পত্র-পল্লব ঝরে গিয়ে নতুন করে আবারও সাজল গাছ-পালা, অরণ্য হয়ে উঠল সবুজ, সজীব।

চুপচাপ কর্মহীন বসে থেকে বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেলেন পল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অল্পতেই অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন তিনি, হাঁটতে যাচ্ছেন একা, শ্যালেতে ফিরে বসে থাকছেন চুপচাপ। সান্ত্বনা দিয়ে কোনও কথা বললে আরও গম্ভীর হয়ে যান তিনি।

আবারও খোঁজ-খবর করতে স্যালৎসবার্গ গেলেন হিল্ডা। ওখান থেকে তাঁকে জানানো হলো, এদিকের এলাকায় পলাতকদের সরিয়ে নেবার মতো নির্ভরযোগ্য কোনও সংগঠনের খোঁজ তারা বের করতে পারেনি। তবে ভাল একটা খবরও ওখানে পেলেন হিল্ডা। আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে জানাল, তাঁর ভাই ফ্রাঞ্জ খুঁজে বের করতে চাইছেন তাঁকে। গতমাসে স্যালৎসবার্গে ফোন

করেছিলেন ফ্রাঞ্জ, তখন শুনেছেন বাবা-মা মারা গেছেন, তার পর থেকে একমাত্র বোনটাকে আমেরিকায় নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। পরিচিতদের সবাইকে হিল্ডা অনুরোধ করলেন, যেন ফ্রাঞ্জকে তাঁর হদিস এখনই না জানায় তারা, জার্মানি থেকে পলকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর তিনি নিজেই যোগাযোগ করবেন ফ্রাঞ্জের সঙ্গে।

স্যালৎসবার্গ থেকে ফিরবার পথে ভ্যাগিঙের মুদি দোকানে সামান্য কেনাকাটা করলেন হিল্ডা। জিনিসগুলো নিয়ে গাড়ির কাছাকাছি যেতেই তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন একজন আমেরিকান কর্নেল। কর্নেলের আচরণে মনে হলো, আলাপ জুড়তে চান।

লোকটাকে এড়াতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন হিল্ডা। পাশ কাটাতে চাওয়ায় সরে আবার তাঁর সামনে দাঁড়ালেন কর্নেল, এবার কাঁধে হাত রেখে অনুরোধের সুরে বললেন, দুপুরে হিল্ডা তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ করলে খুব খুশি হবেন তিনি।

লাঞ্চ-এর দাওয়াত গ্রহণ করলেন না হিল্ডা, তবে ভদ্রতা বজায় রেখে কর্নেলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক কাপ কফি নিতে রাজি হলেন। ভাবলেন, কথায় কথায় যদি যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি সম্বন্ধে নতুন কিছু জানা যায়, তা হলে সেটা কাজে দেবে তাঁদের।

মুদি দোকানের ঠোঙাগুলো হিল্ডার কাছ থেকে নিয়ে নিলেন কর্নেল, রাস্তার মোড়ে একটা আউটডোর ক্যাফেতে চলে এলেন তাঁকে নিয়ে, মুখোমুখি বসলেন দু'জন রাস্তার ধারে একটা টেবিলে। কর্নেলের বিশ্রী জার্মান উচ্চারণ বিস্মিত করল হিল্ডাকে। তিনি ইংরেজি বলতে শুরু করায় কর্নেলকে দেখে মনে হলো, বিরাট বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন ভদ্রলোক।

ক্যাফের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে দ্রুতগতিতে চলে গেল মেজর হলম্যানের জিপ, সেটা খেয়াল করলেন না হিল্ডা। এটাও জানলেন

না, ওই জিপ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন বন্দি পল হাইনরিখ, আমেরিকান কর্নেলের সঙ্গে বসে হিল্ডাকে গল্প করতে দেখবার দৃশ্যটা দাগ কেটে গেছে তাঁর মনে চিরদিনের মতো।

পলের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সেটা হিল্ডা প্রথমে জানতে পারলেন মুদি দোকানের মালিকের কাছ থেকে।

সেদিন সকালে একদল মিলিটারি পুলিশ আসে গ্রামে, জানতে চায় রুডি হাইনরিখের শ্যালেটা কোনদিকে। এদিকে আমেরিকান কর্নেল বসে ছিলেন গ্রামের সদর রাস্তার দিকে চোখ রেখে। স্যালৎসবার্গ থেকে ফিরতেই কাকতালীয় ভাবে হিল্ডাকে আমন্ত্রণ করেননি তিনি, ওটা ছিল তাঁদের পরিকল্পনার অংশ।

মুদি দোকানি আন্তরিক ভাবে দুঃখপ্রকাশ করে বলে, তার পক্ষে আগেই হিল্ডাকে সতর্ক করা সম্ভব ছিল না। কর্নেলের খপ্পরে পড়ে ফ্রয়লাইন যখন ক্যাফেতে বসেন, তার পরে জানতে পারে সে কী ঘটতে যাচ্ছে।

শ্যালেতে ফিরে এলেন হিল্ডা, বুঝতে পারলেন না কী করবেন। সেদিনই ফোন এলো স্যালৎসবার্গ থেকে, তাঁর এক বান্ধবী করেছে। তাঁকে জানাল, আমেরিকানরা পলকে ব্যাড টোল্য্‌-এর ফিফটিনথ আর্মি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আরও ভাল ভাবে ইন্টারোগেশনের জন্য সেখান থেকে পলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নুরেমবার্গ ডিটেনশন সেন্টারে। বিচারের রায় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বন্দি করে রাখা হবে তাঁকে।

'তোমার ভাই চলে এসেছে,' হিল্ডাকে চমকে দিয়ে এবার বলল বান্ধবী। 'কথা বলো।'

অবাক হলেন হিল্ডা, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের সুযোগ পেলেন না। ফ্রাঞ্জ বললেন, 'হিল্ডা, আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে তোমাকে। আমেরিকায় চলে যাব আমরা। জার্মানিতে থাকা

তোমার জন্যে এখন ভীষণ বিপজ্জনক।'

'এখন আমার পক্ষে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়,' দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিলেন হিল্ডা। 'আগে পলকে উদ্ধার করতে হবে বিপদ থেকে। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব আমি।' বড় ভাইকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ফোন রেখে দিলেন তিনি।

ব্যক্তিগত ঝুঁকির তোয়াক্কা না করে সোজা নুরেমবার্গ চলে এলেন হিল্ডা। দেরি না করে, যেভাবে হোক পল হাইনরিখের সঙ্গে দেখা করবেন। মেডিকেল স্কুলে একসঙ্গে ক্লাস করেছিলেন এক মেয়ের সঙ্গে, বার্থা গ্রুয়েন নাম তার। নুরেমবার্গেই থাকে সে। তার ওখানে উঠলেন তিনি।

খোঁজ-খবর নিয়ে সন্ত্রস্ত হিল্ডা জানতে পারলেন, পলের হয়ে কেস লড়বেন আলবার্ট হিমেলস্টোস নামের এক খ্যাতিমান অ্যাটর্নি। নুরেমবার্গ কোর্টে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর ভদ্রলোকের দেখা পেলেন তিনি। তবে হতাশ হতে হলো তাঁকে। হিমেলস্টোস জানিয়ে দিলেন, কোনওভাবেই পল হাইনরিখের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না হিল্ডা। অভিযুক্তদের সঙ্গে তাদের নিজস্ব অ্যাটর্নি ছাড়া সাক্ষাতের অনুমতি নেই আর কারও।

ভদ্রলোক অবশ্য এ-ও বললেন, হিল্ডার যদি কিছু বলবার থাকে, তা হলে সেটা হাইনরিখকে অবশ্যই জানাবেন তিনি।

হিল্ডা শুধু পলকে জানাতে বললেন, তিনি অপেক্ষায় থাকবেন, যা-ই ঘটুক না কেন।

হের হিমেলস্টোস জানিয়ে দিলেন, রিবেনট্রপের মামলায় সাক্ষী হিসেবে পল হাইনরিখকে আনা হবে, তার পরে যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন হিল্ডা।

পলকে যেদিন আদালতে আনা হলো, সেদিন দর্শকদের সারিতে উপস্থিত থাকলেন হিল্ডা। ফ্যাকাসে, অসুস্থ দেখাচ্ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধাপুরুষটিকে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ভেঙে পড়েননি একটুও।

আদালতের কার্যদিবস শেষ হতেই আলবার্ট হিমেলস্টোসের সঙ্গে দেখা করলেন হিল্ডা। উকিল ভদ্রলোককে অসম্ভব গম্ভীর মনে হলো তাঁর।

হিমেলস্টোস শুকনো স্বরে জানিয়ে দেন, 'দুঃখিত, তবে আপনার জন্যে ভাল কোনও খবর আনতে পারিনি আমি। হের হাইনরিখ চান আপনি যেন আর কখনও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না করেন। কখনও না।'

হতবাক হয়ে গেলেন হিল্ডা, থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝলাম না, হের হিমেলস্টোস। এরকম একটা কথা ও বলবে কেন?'

সরাসরি হিল্ডার চোখে তাকিয়ে আলবার্ট হিমেলস্টোস বললেন, 'যেদিন হের হাইনরিখ বন্দি হলেন, সেদিন একটা ক্যাফেতে এক আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে আপনাকে গল্প করতে দেখেছিলেন তিনি।' এর পরের কথাটা বলতে অস্বস্তি বোধ করলেন উকিল ভদ্রলোক, তারপরও বললেন, 'শুনতে যতই খারাপ লাগুক, ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক, ওঁর ধারণা, আপনিই ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমেরিকান ইন্টারোগেটর তাঁকে জানিয়েছে, হের হাইনরিখকে গ্রেফতার করেছে তারা গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে। খবরটা তারা পায় ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক নামের এক লোকের কাছ থেকে। আর... ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক, আমার যদি কোনও ভুল না হয়, তো সে আপনার আপন বড় ভাই।'

'এ অসম্ভব!' বিস্ময় সামলে বললেন হিল্ডা। 'অসম্ভব! কক্ষনো ওরকম কোনও নোংরা কাজে নিজেকে জড়াব না আমি। ও ভুল বুঝেছে আমাকে। আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন, আমি এসবের কিছুই জানি না। আমার ভাই যদি কিছু করে থাকে, তা হলে সেটা সে নিজে থেকে করেছে। ও কি একবারও ভাবেনি পলের কী হবে? প্লিয, আপনি...'

মাথা নাড়লেন হের হিমেলস্টোস। 'আমি সত্যি দুঃখিত.

ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক, এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই আমার আপনার নাম উচ্চারণ করতেও আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন হের হাইনরিখ। আরেকটা কথা আপনাকে বলতে বলেছেন উনি, যদিও মানেটা আমি বুঝিনিঃ আরও কোনও ব্যাপারে যদি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তা হলে মৃত্যুর পরেও উনি ক্ষমা করবেন না আপনাকে।'

কথাগুলো শুনে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, তাঁর মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন এক্ষুনি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার ফাঁকে বেসুরো কণ্ঠে বললেন, 'পলকে আপনি বলবেন, ও কী বলতে চেয়েছে সেটা আমি বুঝেছি। আরও বলবেন, আমি ওর সঙ্গে কক্ষনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, করবও না কখনও।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন হিল্ডা।

আলবার্ট হিমেলস্টোস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'আমি সত্যি দুঃখিত যে এরকম খারাপ খবর দিতে হলো আপনাকে। কথা দিচ্ছি, আপনার বক্তব্য হের হাইনরিখকে জানাব আমি। ...ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক, ব্যক্তিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করছি, আপনি হের হাইনরিখের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।'

'আপনি ওকে বলবেন, আমি ওকে ভালবাসি, ভালবেসে যাব সারাজীবন—সবসময়,' কাঁদতে কাঁদতে বললেন হিল্ডা।

'বলব,' তাঁকে আশ্বস্ত করলেন হিমেলস্টোস, 'নিশ্চয়ই বলব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন উকিল ভদ্রলোক।

পরের সপ্তাহে আলবার্ট হিমেলস্টোসের সঙ্গে আবারও দেখা করলেন হিল্ডা, জানতে চাইলেন তাঁর কথা শুনে পলের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আলবার্ট হিমেলস্টোস জানালেন, হের হাইনরিখ শুনেছেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি।

হিল্ডার দিনগুলো কাটতে লাগল ভীষণ একাকীত্বে, ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণায়।

তারপর উনিশশো সাতচল্লিশ সালের তেরো জানুয়ারি

আদালতে উঠল পলের মামলা। এবং... আগস্টের এগারো তারিখে ইউএস মিলিটারি ট্রাইবুনাল পলকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিল।

এরপর পলকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ল্যান্ডসবার্গ জেলে। কোনওভাবেই পলের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে হতাশ হয়ে ভ্যাগিঙের হ্রদের তীরে সেই শ্যালেতে ফিরে এলেন হিল্ডা। আলবার্ট হিমেলস্টোসের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তাঁর, উকিল তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, আপিল করলে পলের শাস্তি কমিয়ে আনা যাবে অনেক। নতুন কিছু ঘটলেই হিল্ডাকে জানাবেন তিনি।

বই পড়ে আর জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হেঁটে সময় কাটান হিল্ডা। সর্বক্ষণ লড়াই করে চলেছেন তিনি একাকীত্বের সঙ্গে। এভাবে দুটো সপ্তাহ পেরিয়ে যাবার পর বুঝতে পারলেন, মানুষের সঙ্গ দরকার তাঁর, নইলে সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। স্যালৎসবার্গে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, ঠিক করলেন তিনি।

সকালটা কাটল তাঁর গোছগাছ করতে। লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়লেন তিনি শ্যালের কয়েকটা ছবি তুলতে। এখানেই পলের সঙ্গে কেটেছে তাঁর একান্ত অনেক সুখময় মুহূর্ত। স্মৃতিগুলো চিরস্মরণীয় হয়ে থাক। যেসব জায়গায় বসে তাঁরা দু'জন পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করতেন, সে-জায়গাগুলোর ছবি তুলতে তুলতে দুপুর গড়িয়ে গেল হিল্ডার।

ছবি তোলা শেষে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে শ্যালের দিকে এগোলেন তিনি, তখনই শুনতে পেলেন যানবাহনের শব্দ। ভারী কোনও যান আসছে শ্যালের দিকে। একটা বাঁক ঘুরে ট্রাকটাকে শ্যালের দিকে আসতে দেখলেন তিনি গাছের আড়াল থেকে। ট্রাকের পাশের মার্কিং দেখে চিনতে পারলেন: ইউএস আর্মির ট্রাক।

কেন তা বলতে পারবেন না, তবে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন হিল্ডা। গাছের আড়াল থেকে চোখ

রাখলেন তিনি ট্রাকের উপর।

শ্যালের পিছনে, পোর্টিকোর পাশে থামল ট্রাক। দু'জন লোক নামল ওটা থেকে। শ্যালের দিকে হাঁটতে শুরু করল তারা। পিছনের দরজায় টোকা দিল একজন, অন্যজন উঁকি দিল একতলার জানালাগুলো দিয়ে।

হিল্ডা যেখানে লুকিয়ে আছেন, সেখান থেকে মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য দেখতে পাচ্ছেন লোক দু'জনকে। দু'জনেরই পরনে সিভিলিয়ান পোশাক। একজন বেশ লম্বা, কাঁধদুটো চওড়া তার; অন্যজন দোহারা গড়নের, উচ্চতা মাঝারী।

বাড়িতে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে আবার ট্রাকের কাছে ফিরে গেল লোক দু'জন, কোদাল ও র‍্যাক নামাল ট্রাক থেকে। চারপাশে সতর্ক নজর বুলিয়ে এবার জঙ্গলের পথ ধরল, কী যেন খুঁজছে। তারপর বার্লিন থেকে আনা ক্রেটগুলো যে কালভার্টের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন পল ও হিল্ডা, সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন হিল্ডা, চিনতেও পারলেন। অপেক্ষাকৃত খাটো লোকটাকে নুরেমবার্গ কোর্টে গত আটমাস নিয়মিত দেখেছেন তিনি। এই উকিলই পলকে জেরা করত। লম্বা লোকটা আসত মাঝে মাঝে, পলকে জেরার আগে উকিলের টেবিলের সামনে গিয়ে নানান তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করত।

হিল্ডার চোখের সামনে ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়িটা সরাল দু'জন, ক্রেটগুলো আড়াল করে রাখা ডালপালাও সরিয়ে ফেলল। হিল্ডার মাথায় তখন শুধু একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে: পল না মনে করে বসে এসবের সঙ্গে তিনিও কোনওভাবে জড়িত। ক্যামেরার ফিল্ম ইন্ডিকেটর দেখলেন হিল্ডা, রোল-এ তখনও পনেরোটা এক্সপোযার রয়েছে। লোক দু'জনের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব হবে তিরিশ গজ, তবে ১৩৫এমএম জুম লেন্স দিয়ে এই দূরত্ব থেকে স্পষ্ট তোলা যাবে ছবি।

শেষ ক্রেট ট্রাকে তুলে তারা রওনা হয়ে যাবার পর তাড়াহুড়ো

করে প্যাকিং সারলেন হিল্ডা, রওনা হয়ে গেলেন স্যালৎসবার্গের উদ্দেশে। পরের সপ্তাহে ছবিগুলো প্রিন্ট করে এক সেট পৌঁছে দিলেন তিনি ফারস্টেনফেল্ডব্রাকে, আলবার্ট হিমেলস্টোসের কাছে। ভদ্রলোককে সিল করা এনভেলপটা দিয়ে জানালেন, ওটা যেন সিল করা অবস্থাতেই পলের কাছে পৌঁছায়। বারবার করে বললেন, এনভেলপটা পলের হাতে পড়া খুবই জরুরি। আলবার্ট হিমেলস্টোস কথা দিলেন, পরদিনই এনভেলপটা পলের কাছে পৌঁছে দেবেন তিনি।

এরপর ছয়টা মাস অস্থির সময় কাটালেন হিল্ডা স্যালৎসবার্গে। আলবার্ট হিমেলস্টোস এরমধ্যে একবারও যোগাযোগ করেননি, জানাননি আপিলের কী হলো। তারপর ধৈর্য হারিয়ে হিল্ডা নিজেই যোগাযোগ করলেন। হিমেলস্টোস তাঁকে জানালেন, খুব খারাপ খবরের জন্য যেন তৈরি থাকেন উনি, আপিল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, সম্ভবত চরম শাস্তি হয়ে যাবে পলের। ভেঙে পড়লেন হিল্ডা, অস্বাভাবিক হয়ে গেলেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব চিন্তিত হয়ে পড়ল, ঠিক করল, আমেরিকায় ফ্রাঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করবে তারা।

সেই তখন থেকে আমি জেনে এসেছি উনিশশো পঞ্চান্ন সালে মারা গেছে পল। ফ্রাঞ্জ প্রথমে অস্বীকার করেছিল যে ও-ই ধরিয়ে দিয়েছে পলকে, তারপর স্বীকার করে। নিরাপদে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে আসবার জন্যে জেনারেল টলবির সঙ্গে একটা চুক্তি করে ও বিরাট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধে আমার ভূমিকা রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হয়। সোজা কথায়, আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেয়া হয়। একটা জার্মান পত্রিকায় পড়েছিলাম পলের শাস্তি কমিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু ফ্রাঞ্জ আমাকে জানায়, এর কিছুদিন পরে ল্যান্ডসবার্গ জেলেই হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় পল।' ঘনঘন ঢোক

গিললেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, তারপর বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ফ্রাঞ্জ, আমার আপন বড়ভাই, শেষ করে দিয়েছে পল আর আমার জীবন!'

'আমি দুটো প্রশ্ন করতে চাই,' হিল্ডা ক্যান্টোরেক থেমে যাবার কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল লিমা। 'এক; ছবিগুলো কি এখনও আছে আপনার কাছে? দুই, আপনি কি জানতেন ওই ক্রেটগুলোয় কী আছে?'

তিক্ত হাসলেন হিল্ডা। 'শুধু ওই ছবিগুলোই নয়, আমার কাছে নেগেটিভগুলোও আছে। ক্রেটগুলোতে কী ছিল তার লিস্টও আমার কাছেই ছিল। এখনও আছে।'

'দেখাবেন ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

উঠে দাঁড়িয়ে রানা ও লিমাকে দেখলেন হিল্ডা। 'আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসুন, প্লিয।'

ছবিগুলো স্পষ্ট ভাবে উঠেছিল, যত্ন করে সংরক্ষণ করায় নষ্ট হয়নি। পরবর্তীকালের কংগ্রেসম্যান জর্জ গ্রুসাককে চিনতে পারল লিমা, চিনতে পারল হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলকেও। দু'জনের ছবি দেখেছে ও মিলিটারি আর্কাইভ ডিভিশনের মডার্ন মিলিটারি ব্রাঞ্চ ও মেরিল্যান্ডের সুইটল্যান্ড ন্যাশনাল রেকর্ডস সেন্টারের ফাইলে।

পল হাইনরিখের অফিশিয়াল সিল করা একটা কাগজ ড্রয়ার থেকে বের করে রানার দিকে এগিয়ে দিলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসএস-এর উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসার এগুলো এসএস ফান্ডে জমা না দিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিলেন। পলকে দেয়া হয়েছিল এর এক তৃতীয়াংশ। বাকি দুই ভাগ ছিল জেনারেল হার্মান অ্যাডলফাস ও জেনারেল ওয়াক্সমার ওয়েবেলিঙের।'

এই একটি কথায় পরিষ্কার বুঝল রানা ও লিমা, ঠিক কী চরিত্রের মানুষ ছিলেন পল হাইনরিখ।

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে ডলারে কত আসে সেটা মনে মনে

হিসেব কষতে শুরু করল রানা।

সুইস ফ্রাঁ-এ ৫২,০০,০০০ ডলার
ইংলিশ পাউন্ড-এ ৩৯,০০,০০০ ডলার
২৫,০০,০০০ ইউএস ডলার
সোনার কয়েন ৫,০০,০০০ ডলার
হীরা (আনুমানিক) ৩,০০,০০০ ডলার
সোনার বিস্কিট ১,৫০,০০০ ডলার
মোট ১,২৫,৫০,০০০ ডলার

কাগজটা থেকে চোখ তুলে লিমাকে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকতে দেখল রানা। চোখে চোখে কথা হলো দু'জনের।

এখন ওরা নিশ্চিত ভাবে জানে, জাজ লিউট হ্যামিলটন গেটসবি, প্রসিকিউটর হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল ও ইন্টেলিজেন্স অফিসার জর্জ গ্রুসাক কেন এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন পল হাইনরিখকে ফাঁসি দেবার জন্য।

'নেগেটিভ আর ম্যানিফেস্ট আমরা নিতে পারি?' ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল লিমা। 'কপি করে কালই ফেরত দেব আবার।'

চুপ করে থাকলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'এতবছর পর আর কী কাজে আসবে এগুলো?'

'এই প্রমাণগুলো সহ আর্টিকেল লিখতে পারব আমি,' বলল লিমা। 'হৈ-চৈ পড়ে যাবে চারপাশে। হের হাইনরিখের প্রতি যে চরম অবিচার করা হয়েছিল, খানিকটা হলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে তাতে।'

'তা ছাড়া, ষড়যন্ত্রকারীরা যে বিরাট ব্যবসা গড়ে তুলেছিল ওই টাকা দিয়ে, সেই ব্যবসা চালাচ্ছে এখন তাদের ছেলেরা,' বলল রানা। 'অতীতের এই ঘটনাগুলো চাপা দিতে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা নেই তাদের। লিমার আর্টিকেল ছাপা হলে মুখোশ খুলে যাবে লোকগুলোর।' একটু থেমে বলল ও, 'বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে ওদের প্রত্যেককে।'

'নিতে পারেন এগুলো, কপি করে ফেরত দেবেন যখন,' বললেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'আমাকে কোথায় পাবেন লিখে দিচ্ছি খামের ওপর। আজই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।' আরও কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল তাঁর। হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন বৃদ্ধা।

গাড়ির শব্দটা রানা ও লিমাও শুনতে পেয়েছে। ম্যানশনের দরজা খুলে গেল, 'হিল্ডা, হিল্ডা' বলে ডাকল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

'আপনারা দয়া করে চলে যান,' বেসুরো গলায় বললেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'চলে যাব আমিও, ফ্রাঞ্জের বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। ...তার আগে, আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ফ্রাঞ্জকে।'

রানা ও লিমাকে হল-এ পাশ কাটালেন এক বৃদ্ধ, হিল্ডা ক্যান্টোরেকের সঙ্গে চেহারায় বেশ মিল রয়েছে তাঁর। মনে হলো অপরিচিত দুই যুবক-যুবতীকে দেখে অত্যন্ত অবাক হয়েছেন তিনি, তবে জিজ্ঞেস করলেন না কিছু।

পিছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দেবার সময় রানা ও লিমা শুনতে পেল হিল্ডা ক্যান্টোরেকের কাঁপা, রাগী কণ্ঠস্বর: 'ফ্রাঞ্জ, কী করে এরকম নিষ্ঠুর একটা কাজ তুমি করতে...'

উনিশ

সন্ধের আগে সিনসিনাটি পৌঁছে গেলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলেন জাজ

গেটসবির বাড়িতে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বাড়ির পিছনে অপেক্ষা করতে বলে পা বাড়ালেন তিনি কিচেনের দরজার দিকে। কয়েক পা এগিয়ে লক্ষ করলেন, কোমর ছাড়ানো বাদামি চুল খুলে টিলার চুড়োয় বসে আছে এক তরুণী, উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের নদীটার দিকে, তাঁর উপস্থিতি টের পায়নি। এমা না এলিজাবেথ, বুঝতে পারলেন না ব্যারি ক্যাসল।

কিচেনের দরজায় টোকা দিতেই সাড়া দিলেন শার্লি গেটসবি, ব্যারি ক্যাসলকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঢুকতে দিলেন তাঁকে, তারপর বললেন, 'জানতাম, তুমি বা ফ্রেড আসবে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমাদের, স্যামুয়েলের জীবনের শেষ বোকামি সম্বন্ধে জানবে না কখনও কেউ। ওর মানসিক ডায়রিয়ার চিহ্নটা পুড়িয়ে ফেলেছি আমি।'

শার্লি গেটসবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, মৃদু হেসে ভাবলেন, ঘরে এরকম এক ডাইনী থাকলে বোধহয় দ্রুত মৃত্যুর উপায় বের করবার কথা চিন্তা করতেন তিনিও। একফোঁটা দুঃখের ছাপ নেই মহিলার লালচে চেহারায়। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। বোধহয় ভাবছে তার স্বামীর আত্মহত্যার ফলে সামাজিক ভাবে কতখানি কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার। আস্তে করে মাথা দোলালেন ব্যারি ক্যাসল, জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে কোনও চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল ও?'

'ওই যে বললাম, মানসিক ডায়রিয়া হয়েছিল ওর।' ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে হাসল শার্লি গেটসবি। 'উপরতলায় কাপড় ছাড়ছিলাম, তখনই গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। তারপর লাইব্রেরিতে এসে দেখি মুখের অর্ধেকটা নেই ওর। নিজের পাপ স্বীকার করে ডেস্কের ওপর তিন পৃষ্ঠার জবানবন্দি রেখে গেছে নির্বোধ উল্লুক। পুলিশে খবর দেবার আগে কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। ...সিনেটর আর তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার প্রতি।'

'আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, শার্লি,' কপট হেসে বললেন ক্যাসল, 'সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ।'

'সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারো তোমরা আমার স্বামীর সমস্ত শেয়ার কিনে নিয়ে। বর্তমান বাজার দরের ওপর পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ দিলেই চলবে।'

কত মিলিয়ন ডলার বেরিয়ে যাবে ভাবতেই হাসিটা মুছে গেল ব্যারি ক্যাসলের ঠোঁট থেকে, চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল শীতল। কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'ব্যবস্থা করা যাবে। কাল সকালে যেন তোমার উকিল যোগাযোগ করে আমার সঙ্গে। টাকাগুলো পৌঁছে যাবে তোমার অ্যাকাউন্টে কয়েকদিনের মধ্যেই।'

'খুব ভাল হয় তা হলে, ব্যারি,' স্বামীর অংশীদারের চেহারায় পরিবর্তনটা লক্ষ করল না উৎফুল্ল শার্লি গেটসবি, 'যা ঘটেছে তা নিয়ে আর একটা কথাও কখনও শুনবে না তোমরা।'

'না শুনলে সেটা তোমার জন্যেও ভাল হবে,' শীতল দৃষ্টি দিয়ে মহিলাকে বিদ্ধ করলেন ব্যারি ক্যাসল। 'নইলে হয়তো যা পাবে তার সবই হারাতে হবে তোমাকে।'

'এবার তুমি আসতে পারো, ব্যারি,' কর্কশ শোনাল অসহিষ্ণু শার্লি গেটসবির কণ্ঠ, যেন অতিথিকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। 'ফিউনারালের জোগাড়যন্ত্র করতে হবে আমাকে।'

ট্যাক্সির দিকে রওনা হয়ে সেই তরুণী মেয়েটিকে আবার দেখতে পেলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। আগের মতোই বসে আছে ও, কাঁদছে বোধহয়, ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।

নিউ ইয়র্কে ফিরে রানা ও লিমা সোরেনসনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় পুরো একটা দিন ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করল ব্রিম হার্টসেল ও জেসন ট্রটম্যান। মৃত্যুসংবাদ এল ঠিকই, তবে সেটা ওদের ভাড়া করা কিলারদের। গ্যাং লিডার ক্ষতিপূরণ চায়।

তারপরেই ঘটতে শুরু করল নানান ঘটনা। জাজ অলিভার

অরওয়েলের কথা শুনল, হিল্ডা ক্যান্টোরেকের কাহিনি শুনল। যেন একের পর এক বন্ধ দুয়ার খুলে যাচ্ছে ওদের সামনে, বিভোর হলো ওরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে।

অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছে হার্টসেল ক্যাসলকে কী বুঝ দেবে, রেখে-ঢেকে কতটুকু বলবে—তারপর ফোন করেছে।

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, ব্রিম,' খুশিমনে বললেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। হার্টসেলের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, সবকিছু সুন্দরভাবে সামলে নিতে অসুবিধে হবে না কোনও। সিনসিনাটি থেকে ফিরে এসে ক্লান্তি লাগছে, তারপরেও আজকের রাতটা বিশেষ রকম সম্ভাবনাময় মনে হলো তাঁর। 'মোটা বোনাস পাওনা হয়েছে তোমার।'

'অনেক ধন্যবাদ, সার,' নিঃশব্দে হাসল হার্টসেল, মনে মনে বলল, 'আরও বহুকিছু পাওনা হয়েছে, সার, যথা সময়ে চেয়ে নেব। জার্মানিতে মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসন খুন হয়ে গেলে দেরি না করে আজ থেকেই নিতে শুরু করতাম, সার।' বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী করতে বলেন আমাদের, সার?'

'খুবই দ্রুত সুতো গুটিয়ে আনছে মাসুদ রানা আর লিমা সোরেনসন,' বললেন ক্যাসল। 'হাতে আর বেশি সময় নেই আমাদের। তুমিই তো বললে, হিল্ডা ক্যান্টোরেকের কাছেও পৌঁছে গেছে ওরা। মহিলা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু জানে। জীবন্ত সাক্ষী। তার ভাইও হয়তো জানে সবকিছু। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, এবার আমাদের কী করা উচিত? কাজটা সেরে ফেলো। তারপর তুমি যেসব জিনিসের কথা বললে—ওই ছবি, নেগেটিভ আর ম্যানিফেস্ট ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে যে-করে হোক। একমাত্র তা হলেই শান্তি।'

'নেব, সার। রানা আর ওই মেয়েটা সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত?'

'হাতে প্রমাণগুলো না থাকলে ওরা আমাদের জন্যে আর

কোনও হুমকি নয়। তারপরেও, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।'

'সাধ্যমত করব আমরা, সার। কিন্তু যদি কোনও ঝামেলা হয়ে যায়...'

'যা করা দরকার, বুদ্ধি করে সেটাই করবে,' কড়া শোনাল ব্যারি ক্যাসলের কণ্ঠ। '...আমি চাই ক্যান্টোরেকদের প্রথমে ভালমত জেরা করা হোক। কিছু জানতে যেন বাকি না থাকে আমাদের। কাজটা সেরে মাসুদ রানার কাছ থেকে নেগেটিভ, ছবি আর ম্যানিফেস্ট সংগ্রহ করবে। ওগুলো হাতে এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে। তোমাদের টেপ রেকর্ডারটাও। আমি নিজের কানে শুনতে চাই সব।'

নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল হার্টসেলের মুখে। মনে মনে বলল, 'অর্থাৎ, আমাদের হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ তুমি বেঈমানের বাচ্চা!' মুখে সবিনয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সার। ট্রটি খুশি হয়েই করবে ইন্টারোগেশনের কাজটা। ওদের পেটে যদি আরও কোনও কথা থাকে, তা হলে সেটা আমরা জেনে নেব। ...আর মাসুদ রানা আমাদের জন্যে বড় কোনও সমস্যা হবে না।'

'সবকিছু গুছিয়ে আমাকে ফোন দেবে।'

লাইনটা কেটে গেছে, ক্লিক আওয়াজটা শুনে টের পেল ব্রিম হার্টসেল। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, চওড়া হাসি হাসছে জেসন ট্রটম্যান। আলাপের সারমর্মটা বুঝেছে সে, জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে যাচ্ছি আমরা এখন, হার্টি?'

মৃদু হাসল ব্রিম হার্টসেল। 'যাচ্ছি। নিজেদের স্বার্থেই সব ক'জন সাক্ষীর মুখ বন্ধ করতে হবে আমাদের।'

ঘড়ঘড় আওয়াজ করে হেসে উঠল জেসন ট্রটম্যান, এক চুমুকে শেষ করে ফেলল ক্যানের অবশিষ্ট বিয়ার।

টেরেসের সিঁড়ির কাছে পড়ে থাকা প্রিয় সেন্ট বার্নার্ড-এর মৃতদেহটা দেখলেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক, তারপর চোখ তুলে

আবারও লোক দু'জনের দিকে তাকালেন, কাঁপছেন থরথর করে। চেয়ারে বসে আছেন তিনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায়।

ছ'ইঞ্চি দীর্ঘ স্টিলের সুঁইটা নিয়ে তাঁর সামনে ঝুঁকল জেসন ট্রটম্যান, মৃদু মৃদু হাসছে। টিটকারির সুরে জার্মানদের অনুকরণে বলল, 'ইউ ভিল টেল মি ভাট আই ভান্ট টু নো!'

'তাড়াতাড়ি করো তো, ট্রটি,' তাগাদা দিল বিরক্ত হার্টসেল।

'মুখটা বাঁধো আগে,' সুঁইটা তর্জনী ও বুড়ো আঙুলে ধরে ঘোরাল ট্রটম্যান, 'কারও কান্না আমার সহ্য হয় না।'

হার্টসেলের কাজ শেষ হতেই ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত ওঠাল সে, আঙুলে টিপে খুঁজে বের করল হাঁটুর বাটির নির্দিষ্ট জায়গাটা। গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল আতঙ্কিত বৃদ্ধের হাঁটুতে সুঁইয়ের চার ভাগের এক ভাগ গেঁথে দিয়ে।

প্রচণ্ড ব্যথায় ঝটকা খেলেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক, মুখ বেঁধে রাখা কাপড়ের কারণে চিৎকার বের হলো না, আওয়াজটা হলো জোরে গড়গড়া করবার মতো।

'মিস্টার ক্যান্টোরেক,' নরম সুরে বলল হার্টসেল। 'ভাল হয় আপনি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বললে। ট্রটম্যান কিন্তু ওর কাজটা খুব উপভোগ করে।'

ঘাড় সোজা করে একদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক। প্রাথমিক শক চলে গেছে। একটানা একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা হাঁটুতে অনুভব করছেন তিনি। বড় করে দম নিলেন, তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়লেন। এরা অনেক কিছু জানে, কিন্তু হিল্ডা কোথায় গেছে জানে না। তিনি কিছুতেই বলবেন না। কিছুতেই না।

শক্ত করে ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের পা ধরল ট্রটম্যান, তারপর কাত করে উপরের দিকে ঠেলল স্টিলের সুঁই।

গোঙাতে শুরু করলেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক, ঝটকা খেলেন বারবার। অনিয়মিত হয়ে উঠল শ্বাস।

ব্রিম হার্টসেলের প্রশ্নের জবাবে আবারও মাথা নাড়লেন তিনি।

খুশিতে হেসে উঠল জেসন ট্রটম্যান। 'বুড়ো শালা শক্ত আছে। তবে এর পরের ঠেলাতেই হেগে ফেলবে।' দুই ইঞ্চি বাকি রেখে পুরো সুঁই ঢুকিয়ে দিল সে বাটির ভিতর দিয়ে।

এবারের গোঙানিটা আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হলো। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের চোখ দুটো। পল হাইনরিখের চেহারাটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন তিনি। স্মিত হাসছেন পল হাইনরিখ, কিন্তু দু'চোখে অব্যক্ত বেদনা। তারপর হিল্ডাকে দেখলেন। অভিযোগের দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে হিল্ডা।

'যন্ত্রণা বাড়তেই থাকবে আপনি মুখ না খুললে, মিস্টার ক্যান্টোরেক,' নরম সুরে বলল হার্টসেল। 'বলে ফেলুন আপনার বোন কোথায়।'

আবার মাথা নাড়লেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক।

দাঁতে দাঁত চাপল জেসন ট্রটম্যান। এবার সুঁইয়ের মাথা ধরে এদিক ওদিক নাড়তে শুরু করল সে।

ঘনঘন ঝাঁকি খেলেন ফ্রাঞ্জ, ঝটকা খেয়ে খুলে গেল তাঁর মুখের বাঁধন, মুখ থেকে একইসঙ্গে ছিটকে বের হলো হলুদ বমি ও বিকট চিৎকার। প্রলম্বিত চিৎকারটা চলতেই থাকল, তারপর আবারও শুরু হলো ঝাঁকুনি। বুকে ভীষণ ব্যথা, কথাটা বলতে চাইলেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক, কিন্তু পারলেন না। জ্ঞান হারালেন কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে, টের পেলেন না, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হচ্ছে তাঁর।

'কী হলো?' বিস্মিত স্বরে বলল জেসন ট্রটম্যান, চট্ করে পালস দেখল, তারপর হার্টসেলের দিকে মুখ তুলে তাকাল। রাগে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা। 'কুত্তার বাচ্চা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পটল তুলেছে। পালস নেই!'

'লাশের ব্যবস্থা করে চলে এসো,' ঘুরে দাঁড়াল হার্টসেল। 'আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।'

বিশ

নিউ ইয়র্ক। সকাল ন'টা বিশ। লিমার অ্যাপার্টমেন্ট।

রানার দিকে একবার তাকিয়ে ফোনের স্পিকারের দিকে ঝুঁকল লিমা। 'কী জানলে?'

ইন্টারনাল রেভিন্যু সার্ভিস বা আইআরএস-এ এক্সিকিউটিভ পদে কর্মরত আছে গিলবার্ট ম্যাসনের এক বন্ধু, তাকে কিছু প্রশ্ন ছিল ওদের, ম্যাসন কথা দিয়েছিল ওদের হয়ে জেনে নিয়ে জানাবে—তথ্যগুলো জানাতেই এখন ফোন করেছে ম্যাসন।

'উনিশশো ছিয়াত্তরের নতুন ব্যাঙ্কিং আইন অনুযায়ী তিন বছর আগের রেকর্ড নষ্ট করে ফেলে এখন ব্যাঙ্কগুলো,' ফোনের স্পিকারের কারণে কর্কশ শোনাল গিলবার্ট ম্যাসনের কণ্ঠ: 'উনিশশো সাতচল্লিশের রেকর্ড খুঁজছি জানানোয় লোন ডিপার্টমেন্টের ওরা রবার্টকে বলেছে, এর চেয়ে যিশুকে ক্রুসে চড়ানোর আসল ফটোগ্রাফ জোগাড়ও অনেক সহজ হবে।'

'কিন্তু কিছু তুমি জেনেছ, নইলে ফোন করতে না,' ভ্রূ কুঁচকে গেল লিমার।

'ঠিক। উনিশশো আটচল্লিশ সালে অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন ব্যবসা শুরু করে। তিন পার্টনারের প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট ছিল একেকজনের তিন মিলিয়ন ডলার করে।'

কথাটা ধরল লিমা। 'আইআরএস-এর জানা আছে কত ইনভেস্ট করা হয়েছিল, তা-ই না? তার মানে উনিশশো

আটচল্লিশের আগে অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্স-এর তিন পার্টনার তাদের ইনকাম আর অ্যাসেটের যে হিসেব দিয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে পরের হিসেব মেলালেই বৈসাদৃশ্য ধরা পড়বে, আইআরএস তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে তাদের এত টাকার উৎস কোথায়। আর... তার মানে, সম্পদের উৎস চোরাই অর্থ হওয়ায় বর্তমান হর্তাকর্তারা তাদের কর্তৃত্ব হারাবে।'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল ম্যাসন। 'আর কোনও কাজে আসব আমি?'

'আসবেন,' লিমা কিছু বলবার আগেই মুখ খুলল রানা। 'একটা কাগজে নাম আর নম্বরগুলো লিখে নিন, প্লিয।' ধীরে ধীরে বলে গেল ও: '**Jochen-038-193862**।'

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করল গিলবার্ট ম্যাসন।

রানার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল লিমা।

'এটা একটা কোডের অংশ,' বলল রানা। 'পল হাইনরিখের কোড। কেমিকেল টেস্টে দেখা গেছে, পরের লেখা। নামগুলো যখন লেখা হয় তার অনেক পরে লেখা হয়েছিল এগুলো। ধরে নিচ্ছি, মূল কোডের অংশ নয়। জচেন নামটা জার্মান পুরুষদের হয়। পরের নম্বরগুলো ডিকোড় করা যায়নি। যদি ধরে নিই ওগুলো কোড নয়, আসলেই নম্বর, তা হলে নাম ও নম্বর হতে পারে কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের। একটু আগে মনে পড়ল, সুইস ব্যাঙ্কে এরকম একটা অ্যাকাউন্ট আছে আমার।'

ওদিকের নীরবতা ভাঙল গিলবার্ট ম্যাসন। 'হতে পারে এটা লকারের নম্বর। ...কিন্তু এ থেকে কী পাচ্ছি আমরা?'

ভ্রূ নাচাল লিমা রানার দিকে চেয়ে।

'হের হেইঞ্জ বলেছিলেন প্রতি বছর একবার করে অ্যাসপেন ছেড়ে কোথাও যেতেন পল হাইনরিখ,' বলল রানা। 'এখন আমাদের ধারণা অনুযায়ী পল হাইনরিখ যদি সত্যিই ব্ল্যাকমেইলিং করে থাকেন, তা হলে এমন হতেই পারে যে, বছরে একবার টাকা

সংগ্রহ করতেন তিনি, আর সেজন্যে দেখা করতেন ব্যারি ক্যাসল ও তার পার্টনারদের সঙ্গে। হের অ্যাডলফাস আর ওয়েবলিং বছরের শুরুতে টাকা পেতেন পল হাইনরিখের কাছ থেকে। দুই মিলিয়ন ডলার। যদি ধরে নিই এরচেয়ে বেশি টাকা ব্ল্যাকমেইল করতেন পল হাইনরিখ, তা হলে রাখতেন নিশ্চয়ই কোনও ব্যাঙ্কে? স্বল্পদিনের পরিচয় অবশ্য, তবে কখনও সামান্যতম বিলাসিতা করতে দেখিনি আমি ওঁকে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' রানা থামতেই বলে উঠল গিলবার্ট ম্যাসন, 'আইআরএস-এ আমার বন্ধুর অফিস থেকেই ফোন করেছি, ওকে নম্বরগুলো দেখাচ্ছি। দেখি কিছু জানা যায় কি না।'

স্পিকারে অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল রানা ও লিমা। পেরিয়ে গেল চার মিনিট, তারপর আবার কথা বলে উঠল ম্যাসন: 'আমার বন্ধু বলছে **038** হচ্ছে সুইস ক্রেডিট ব্যাঙ্কের অটোয়া শাখার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। মোট নয়টা ডিজিট মিলে যাচ্ছে। প্রথম তিনটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, পরের ছ'টা অ্যাকাউন্ট নাম্বার। বিঙ্গো!'

'হের হেইঞ্জ বলেছিলেন মাঝে মাঝে মাছ ধরতে ক্যানাডা যেতেন পল হাইনরিখ,' রানার দিকে তাকাল লিমা, উত্তেজনায় চকচক করছে ওর দু'চোখ। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু জচেন? ওটা কী?'

চিকন একটা কণ্ঠস্বর কী যেন বলল, তারপর আবার শোনা গেল ম্যাসনের গলা: 'ওটা অ্যাকাউন্ট গ্রহিতার আইডেন্টিফিকেশন হতে পারে বলছে রবার্ট। ওর ধারণা, ওটা নাম্বার্ড অ্যাকাউন্ট। হতেই পারে। টাকার উৎস ছিল বে-আইনী। পল হাইনরিখ বিপদে জড়িয়ে পড়তে চাননি। ট্রেস করতে চাইলে তাঁকে ধরা কঠিন হবে বলেই নাম্বার্ড অ্যাকাউন্ট করেছিলেন হয়তো।'

লিমা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রবার্টকে জিজ্ঞেস করো, বর্তমানে অ্যাকাউন্টে কত আছে, বা কবে কত জমা দেয়া হয়েছে,

তোলা হয়েছে, সেসব জানা যাবে কোনওভাবে?'

একটু পর নীরবতা ভেঙে বলল ম্যাসন, 'ও বলছে, জানা যাবে কি না সেটা নির্ভর করে পল হাইনরিখ ব্যাঙ্কের সঙ্গে কী ধরনের চুক্তি করেছিলেন, তার ওপর।' খড়মড় আওয়াজ হলো, তারপর ম্যাসন বলল, 'রবার্টের সঙ্গে কথা বলো তোমরা, টেকনিকাল ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলতে পারবে ও।'

চিকন একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'মিস্টার রানা, মিস সোরেনসন, ব্যাঙ্কে ফোন করে ইনফর্মেশন পাওয়া যাবে এরকম কোনও ব্যবস্থা যদি রেখে থাকেন পল হাইনরিখ, তা হলে আমাদের একটা আশা আছে। অ্যাকাউন্ট নাম্বার জানি আমরা, কোড করা একটা নামও আছে আমাদের কাছে। চেষ্টা করে দেখা যায়। ...ব্যাঙ্কিং নিয়ম ভাঙতে হবে... চাকরি চলে যেতে পারে আমার।'

'কোনও ঝুঁকি নেবেন না, প্লিয,' বলল রানা। 'আমিই ফোন করব ওখানে, বলব অন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ট্র্যান্সফার করতে চাই। ...সুইস ক্রেডিটের অটোয়া শাখার ফোন নাম্বারটা দিতে পারেন?'

'ধরুন।' মিনিটখানেক পর চিকন কণ্ঠস্বর বলতে শুরু করল, '015...'

নম্বরটা লিখে নিয়ে লিমার দিকে তাকাল রানা, তারপর মিস্টার রবার্টসনকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দেবার আগে জানাল, সুইস ক্রেডিটের অটোয়া শাখায় যোগাযোগের পর যা-ই ঘটুক না কেন, সেটা গিলবার্ট ম্যাসনকে জানাবে ও।

একবার রিং হতেই ফোন ধরল অটোয়া শাখার সুইচবোর্ড অপারেটর। রানা একটা অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে খোঁজ করতে চায় শুনে সংশ্লিষ্ট অফিসে লাইন দিল মেয়েটা।

'আর্নেস্ট লিংগ্‌ল্ বলছি,' সুইস সুরে কাটা-কাটা ইংরেজিতে বলল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'কী করতে পারি আপনার জন্যে, প্লিয?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে মাসুদ রানা বলছি। একটা অ্যাকাউন্ট

সম্বন্ধে কিছু তথ্য দরকার আমার।'

'অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা বলুন, প্লিয, মিস্টার রানা।'

'038-193862।'

'কী জানতে চান, বলুন?'

'বর্তমান ব্যালান্স,' বলল রানা। 'সেইসঙ্গে গত তিনটে ডিপোযিট ও উইথড্রয়ালের পরিমাণ।'

'একটু ধরুন,' জবাব এলো।

ফোনের লাইনে একটা ক্লিক শব্দ শুনতে পেল রানা ও লিমা। কলটা হোল্ড করা হয়েছে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর রানার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল লিমা, 'কী মনে হয়?'

রানা কিছু বলবার আগেই স্পিকারে শোনা গেল মিস্টার লিংগলের কণ্ঠস্বর: 'আইডেন্টিফিকেশনের আরও কোনও উপায় আছে কি আপনার?'

লিমার গলার ভিতরটা শুকনো ঠেকল। রানা নির্বিকার চেহারায় বলল, 'জচেন।'

সংক্ষিপ্ত একটা নীরবতার পর কম্পিউটার থেকে তথ্যগুলো পড়ে গেলেন মিস্টার লিংগল: 'বর্তমানে অ্যাকাউন্টে ব্যালান্স আছে বায়ান্ন মিলিয়ন ইউএস ডলার। দু'হাজার পাঁচ সালের জানুয়ারির দুই তারিখে জমা দেয়া হয় এক মিলিয়ন, পরের দু'বছরে ওই একই তারিখে আরও এক মিলিয়ন করে। একবারই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হয়, উনিশশো একাত্তরে। পনেরো মিলিয়ন ডলার। তবে প্রতি বছর শেষে সুদের দুই পার্সেন্ট তুলে নেয়া হয়েছে। ...আপনার আর কোনও সাহায্যে আসতে পারি কি, মিস্টার রানা?'

তা হলে দুই জেনারেলের ছেলে-মেয়েদের এক মিলিয়ন করে প্রতিবছর মোট দুই মিলিয়ন পাঠাতেন পল হাইনরিখ, এক মিলিয়ন ব্যাঙ্কে জমা করতেন। কিন্তু ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেককে ধরলে

চারজনকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল—ধরা যাক চারজনের কাছ থেকে চার মিলিয়ন ডলার নেয়া হতো। কিন্তু হিসেব মেলে না তা হলে। মিস্টার লিংগলের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ব্ল্যাকমেইলিং করে তিন মিলিয়ন ডলার নিতেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে রানা বলল, 'না, ধন্যবাদ।'

'বেশ, দিনটা ভাল কাটুক আপনার, মিস্টার রানা।' লাইন কেটে দিলেন মিস্টার লিংগ্‌ল্‌।

নোট প্যাডে অঙ্কগুলো টুকে ফেলেছে লিমা, ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল ও। 'হিসেব তো মেলে না। ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেককে যদি ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার বলে ধরে নিই, তা হলে টাকার অঙ্ক আরও বেশি হবার কথা নয়? চারজনের কাছ থেকে প্রতিবছর চার মিলিয়ন ডলার। বায়ান্ন বছরে দুশো আট মিলিয়ন ডলার। তার থেকে জার্মানিতে ফেরত গেছে একশো চার মিলিয়ন। আরও তো একশো চার মিলিয়ন থাকার কথা। বায়ান্ন মিলিয়ন থাকবে কেন? উনিশশো একাত্তরে পনেরো মিলিয়নের কথা বাদ দিলে টাকা আর তোলাও হয়নি।' প্রসঙ্গ পাল্টাল লিমা, 'কী বলল লোকটা? বছরে দুই পার্সেন্ট সুদ? পার্সেন্টেজ এতো কম কেন?'

'ফরেন অ্যাকাউন্টের বেলায় সুইস ব্যাঙ্কের এরকম রীতি অনেক আগে থেকে চলে আসছে,' বলল রানা। 'কোথায় যেন পড়েছিলাম, বাংলাদেশী কিছু অসৎ নাগরিকের টাকা রাখবার বিনিময়ে উল্টে সুদ নিয়েছে সুইস ব্যাঙ্ক। কেউ গোপন অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলে তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে এরা, কোনও দুর্বলতা পেলে সেটার সুযোগ নেয়। পল হাইনরিখ নাৎসি আর্মি অফিসার ছিলেন, তাঁর টাকার উৎস বে-আইনী হতেই পারে, কাজেই কম সুদের শর্তে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল কর্তৃপক্ষ। পরে গ্রাহকের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, মামলায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে ব্যাঙ্কটাকে, সেজন্যে অগ্রিম ক্ষতিপূরণ।'

'অর্থপিশাচ!' বিড়বিড় করে বলল লিমা।

ঘড়ি দেখল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। 'দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। চলো, ফ্রয়লাইন হিল্ডার নেগেটিভ আর ম্যানিফেস্ট ফেরত দিয়ে আসি।'

টিভির দিকে পা বাড়িয়ে আপত্তি করল লিমা, 'একটু পরে। এক্ষুনি চ্যানেল ফিফটি ওয়ানের খবর শুরু হবে। ওটা দেখব।'

'...ওঁর আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি,' বলে চলেছে সংবাদ পাঠিকা, 'পুলিশ ধারণা করছে পারিবারিক কলহ থেকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন জাস্টিস স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মোটেই ভাল যাচ্ছিল না...'

ভলিউম কমিয়ে দিয়ে রানার দিকে তাকাল বিস্মিত লিমা। 'রানা, বুঝতে পারছ কার কথা বলছে?'

'ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল আর ফ্রেডারিক গ্রুসাকের পার্টনার ছিল লোকটা,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'বুদ্ধিমান মানুষ, বুঝতে পেরেছিল কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সেইসঙ্গে বিবেকের দংশনও ছিল হয়তো।' মনে মনে বলল, 'আমার তালিকা থেকে একজন কমল।'

'আত্মহত্যা?' দ্বিধা প্রকাশ পেল লিমার কণ্ঠে: 'কেন?' অন্য খবর শুরু হওয়ায় বন্ধ করে দিল ও টিভি।

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, 'চলো, যাওয়া যাক।'

গত সন্ধ্যায় অ্যাপার্টমেন্টে ফিরবার আগে লিমার পরিচিত ফটোকালার ল্যাবে নেগেটিভগুলো দিয়ে এসেছে ওরা, ওখান থেকে নেগেটিভ ও দু' সেট ফটো সংগ্রহ করে হোটেল শেরাটনের লবিতে পৌঁছাতে বিশ মিনিটের বেশি লাগল না রানা ও লিমার।

হিল্ডা ক্যান্টোরেকের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে ওদের অপেক্ষা করতে বলল রিসেপশনিস্ট, কাউন্টারে ঝুঁকে কী যেন দেখল কিছুক্ষণ, তারপর চোখের সামনে একটা কার্ড তুলে

একপাশে সরিয়ে রাখল। দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'উনি চেক-আউট করেছেন, মিস্টার রানা। আমাদের মাধ্যমেই লুফথানসায় বার্লিনের টিকেট কেটেছেন, দুপুর দুটোয় তাঁর ফ্লাইট। আপনারা আসতে পারেন সেটা ভেবেছিলেন, যে-কারণে আমাদের ইনফর্ম করতে বলেছেন, ওঁকে ওঁর ভাইয়ের বাড়িতে পাবেন। উনি অবশ্য ভুলে ঠিকানাটা দিয়ে যাননি আমাদের...'

'লাগবে না, আমরা চিনি,' রানার বাহুতে হাত রাখল লিমা, গলা নামিয়ে বলল, 'ওখানে আবার ফিরে গেলেন কেন উনি?'

বিপদের গন্ধ পেল রানা। 'চলো, যাওয়া যাক,' বলে এন্ট্রান্সের দিকে পা বাড়াল ও।

প্রাইভেট ড্রাইভওয়ে ধরে এগোনোর সময় পুলিশের দুটো গাড়ি উল্টোদিকে যাওয়ায় রানা নিশ্চিত হয়ে গেল, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেকের বাড়িতে।

আজকে কলিং বেল টিপবার আধমিনিটের মধ্যে খুলে গেল ম্যানশনের দরজা, খুললেন স্বয়ং হিল্ডা ক্যান্টোরেক। মুখটা শুকনো তাঁর, ফোলা চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায়, কাঁদছিলেন একটু আগে।

'আপনার নেগেটিভগুলো দিতে এসেছিলাম,' বলল লিমা। ভ্যানিটি ব্যাগে হাত ভরে যোগ করল, 'আসার সময় পুলিশের গাড়ি যেতে দেখলাম... খারাপ কিছু ঘটেনি তো?'

একবার ফুঁপিয়ে উঠলেন হিল্ডা। 'ফ্রাঞ্জ। মারা গেছে আমার ভাই। আজ সকালে হোটেলে ফোন পেয়ে এসে দেখি ও আর নেই।'

'কীভাবে মারা গেছেন উনি?' সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিশ বলছে দুর্ঘটনা। পড়ে গিয়েছিল টিলার ওপর থেকে।'

'একটু খুলে বলবেন?' মহিলাকে বিব্রতকর প্রশ্ন করতে হচ্ছে বলে নিজেই বিব্রত বোধ করল রানা, তবে জানতেই হবে ওকে,

'যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে।'

'আসুন আমার সঙ্গে,' ধীর পায়ে সিঁড়ির ধাপ দুটো বেয়ে নামলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, রানা ও লিমাকে পাশে নিয়ে টেরেস পেরিয়ে চলে এলেন বাগানে। সরু পথ ধরে হেঁটে চলেছেন, কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে উপসাগরের দিকে ঝুঁকে থাকা টিলার চূড়ায় উঠলেন অমসৃণ, সংকীর্ণ, পিছলা সিঁড়ি বেয়ে। ওদিকেও একইরকম বিপজ্জনক সিঁড়ি আছে, এঁকেবেঁকে নেমে গেছে পঞ্চাশ ফুট নীচের পাথুরে সৈকতে। ওই সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পা ফস্কালে সরাসরি আছড়ে পড়তে হবে নীচের পাথরগুলোর উপর।

'এখানেই পিছলে গিয়েছিল ও,' পিছল সিঁড়ি দেখালেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'পুলিশের লোকরা বলেছে, মাথা নীচের দিকে দিয়ে একটা পাথরের ওপর পড়েছিল ফ্রাঞ্জ। শেষরাতে সৈকতে হাঁটতে এসে ওর লাশ দেখে এক দম্পতি। তারাই পুলিশে খবর দেয়।'

কী যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছিল না রানার, হঠাৎ মনে পড়ল। 'ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক, আপনার সঙ্গে একটা কুকুর ছিল গতকাল, ওটা কোথায়?'

'ডয়েল কোথায়?' বিস্ময়ে চুপ করে গেলেন হিল্ডা, তারপর বললেন, 'তা-ই তো! ওকে তো দেখিনি একবারও! ফ্রাঞ্জ থাকলে ওকে ছেড়ে একটুও নড়ত না ডয়েল।'

লিমা জিজ্ঞেস করল, 'কুকুরটা কোথায়, তা বলেছে পুলিশ?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা। কাঁপা স্বরে বললেন, 'ফ্রাঞ্জের কাছ থেকে সরানোর জন্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াতে পারে হয়তো। ...কিন্তু, তা হলে বলল না কেন ওর কথা?' রানা ও লিমার দিকে অপলক তাকালেন তিনি, যেন জবাবটা ওদের কাছ থেকে আশা করছেন।

চুপ করে থাকল রানা, মনে মনে বলল, 'পুলিশের লোক ডয়েলকে দেখেনি। কেউ দেখবে না আর।' এরপর কার খুন হবার পালা? হিল্ডা ক্যান্টোরেকের? লিমার? ওর নিজের? বৃদ্ধা

মহিলাকে নিজে উপস্থিত থেকে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, ঠিক করল ও।

আরেকটা সিদ্ধান্ত নিল, ব্রিম হার্টসেল বা জেসন ট্রটম্যানকে যেখানে সেখানে যখন তখন আক্রমণের সুযোগ দেয়া ভুল হবে। জার্মানি নিজেদের দেশ নয় বলে অন্য লোক ভাড়া করে খুন করাতে চেয়েছিল ওদের, কিন্তু এটা আমেরিকা, পরিচিত দেশ, এদেশের ঘাই-ঘাপলা ভাল জানা থাকবার কথা তাদের—নিউ ইয়র্কের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমনিতেই নাজুক, দুটো বাড়তি খুন হলে মাথা ঘামাবে না পুলিশ।

নিজের পরিচিত জায়গায় হার্টসেল আর ট্রটম্যানের মুখোমুখি হলে বাড়তি সুবিধা পাবে ও। ওর উচিত লিমাকে নিয়ে অ্যাসপেনে ফিরে যাওয়া। ওখানে আসবে ট্রটম্যান আর হার্টসেল। ও জানে, ওরা আসবেই। ওখানে ওদের জন্য তৈরি থাকবে ও। ...তারপরও, বেঁচে থাকবে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল আর ফ্রেডারিক গ্রুসাক। এবং... গত দু'দিন ধরে নিজেকে ওর যা মনে হচ্ছে, ওর পরিচয় যদি তা-ই হয়, তা হলে বেঁচে থাকবে সম্ভবত ও নিজেও।

'চলুন, ফিরে যাই,' মৃদু স্বরে বলল লিমা।

'আর কেউ রইল না আমার,' ফিসফিস করলেন আনমনা বৃদ্ধা।

শক্ত করে তাঁর হাত ধরে টিলা থেকে নামতে শুরু করল লিমা। পিছু নিল চিন্তিত রানা।

ম্যানশনের দরজায় এসে মৃদু স্বরে বললেন ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক, 'মেইড ছুটিতে গেছে, আমিও চলে যাচ্ছি একটু পর। আপনাদের আপ্যায়ন করতে পারছি না বলে দুঃখিত। ...তবে একটু যদি বসেন, তা হলে পলের একটা চিঠি দেখাতে পারি—আপনাদের আর্টিকেল লিখতে কাজে আসবে হয়তো।'

লাইব্রেরিতে বসল রানা ও লিমা, সোফার ধারে রাখা

লাগেজের পাশে বসলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। চামড়ার বড়সড় ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে কফি টেবিলের উপর রাখলেন তিনি।

কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল লিমা, চিঠিটা জার্মান ভাষায় লেখা দেখে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। রানা পড়ল:

হিল্ডা,

যে ভুল আমি করেছি, তার কোনও ক্ষমা নেই। নিজের জীবন নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারতাম আমি, কিন্তু তোমার জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবার কোনও অধিকার ছিল না আমার। একটা সময় ছিল, যখন ভাবতেও পারিনি, এভাবে আমারই অপেক্ষায় জীবনের সোনালী দিনগুলো একাকী কাটিয়ে দেবে তুমি।

বিশ্বাস করে তোমার যেসব কাগজপত্র আমার কাছে রেখেছিলে, সেগুলো ব্যবহার করে তোমার ভাই ফ্রাঞ্জকে হুমকি দিয়েছি আমি পনেরোটা বছর, চাপ সৃষ্টি করেছি—প্রতি বছর জানুয়ারির দুই তারিখে এক মিলিয়ন ডলার না দিলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব তুমি টি-ফোর প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলে, তোমার বিরুদ্ধে উস্কে দেব কর্তৃপক্ষকে।

ফ্রাঞ্জ আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, আমার জীবন থেকে অনেকগুলো বছর কেড়ে নিয়েছে ও—ওর প্রতি আমার আক্রোশ ছিল, আমি ওর ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু তুমি? তুমি তো কোনও অপরাধ করোনি! ধ্বংস করে দিয়েছি আমি তোমার জীবনটা! বিশ্বাস করো, হিল্ডা, এমনটা আমি চাইনি। অনেক পরে জেনেছি, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করেছ, আজও অপেক্ষা করছ। কিন্তু এতগুলো বছর যার ভুল বুঝে পেরিয়ে গেছে, এখন আর তোমার সামনে দাঁড়াবে সে কোন্ মুখে, সে-যোগ্যতা তার নেই। অনেকগুলো বসন্ত বৃথা চলে গেল, হিল্ডা। যদি পারো, ক্ষমা কোরো আমাকে। জেনো, হৃদয়ে তুমি ছাড়া অন্য কোনও নারীকে স্থান দিইনি আমি কখনও।

চিঠির সঙ্গে একটা পে অর্ডার দিচ্ছি, এই পনেরো মিলিয়ন ডলার আমাকে ধরিয়ে দেবার শাস্তি হিসেবে নিয়েছিলাম ফ্রাঞ্জের কাছ থেকে—এর পুরোটা তুমি নেবে। মনে কোরো না তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি আমি, সে-সাধ্য নেই আমার।

এই চিঠি যখন ফ্রাঞ্জ তোমার হাতে দিয়েছে, তখন আমি চলে গেছি অন্য দুনিয়ায়, যেখান থেকে ফেরে না কখনও কেউ। আমাকে ক্ষমা কোরো, হিল্ডা। প্লিজ।

—তোমারই পল

রানা মুখ তুলে তাকানোয় হিল্ডা ক্যান্টোরেক বললেন, 'কালকে আমার সঙ্গে ঝগড়ার সময় পল্ মারা গেছে শুনে চিঠিটা দেয় ফ্রাঞ্জ। পে-অর্ডারটাও। ওই টাকা ও আর ফেরত নিতে চায়নি।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'যে-কোনও সময় এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি চলে আসবে। চলে যাচ্ছি আমি। জীবনের বাকি কটা দিন জার্মানিতে কাটাতে চাই।'

'এজেন্সিতে ফোন করে বলে দিন, ট্যাক্সি লাগবে না,' বলল রানা। 'আমরা আপনাকে এয়াপোর্টে পৌঁছে দেব। এদেশে যতক্ষণ আছেন, মস্ত বিপদের মধ্যে আছেন আপনি। আমরা ধারণা করছি, খুন করা হয়েছে আপনার ভাইকে। আপনাকেও খুন করবার চেষ্টা হতে পারে।'

চমকে গেলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক। 'বলছেন, খুন করা হয়েছে আমার ভাইকে? আপনারা জানেন? তা হলে তো পুলিশে জানানো...'

'কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে, ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক,' নরম সুরে বলল রানা। 'প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করলে সামান্য গুরুত্বও দেবে না পুলিশ।'

'ও...' কেমন যেন মিইয়ে গিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন বৃদ্ধা।

'এজেন্সির ফোন নাম্বারটা, ফ্রয়লাইন ক্যান্টোরেক?' মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ?' রানা ও লিমাকে দেখলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, মনে হলো ওদের উপস্থিতি ভুলে গিয়েছিলেন। 'ও, ফোন নাম্বার? ঠিক আছে, ফোন করে আসছি আমি।' ধীর পায়ে চলে গেলেন তিনি ঘর ছেড়ে, ফিরলেন কয়েক মিনিট পর। 'মানা করেছি ওদের।'

'চলুন, যাওয়া যাক?' সুটকেস ও হ্যাভারস্যাক তুলে নিল রানা।

নীরবে বেরিয়ে এলো তিনজন ক্যান্টোরেক ম্যানশন থেকে, দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা মেইলবক্সে রেখে দিলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, তারপর নীরবেই বসলেন প্যাসেঞ্জার সিটে, লিমার পাশে।

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পিছনের রাস্তায় সতর্ক নজর রাখল রানা, ওর মনে হলো না কেউ অনুসরণ করছে।

কাস্টমস এরিয়ায় ঢুকে যাবার আগে ঘুরে তাকিয়ে রানার হাতে একটা কাগজ দিলেন হিল্ডা ক্যান্টোরেক, বললেন, 'জার্মানিতে আমার ঠিকানা। যদি আমার ভাইয়ের খুনি ধরা পড়ে, পলের উপর যারা অন্যায় করেছে, বিচারের মুখোমুখি যদি দাঁড় করাতে পারেন তাদের, তা হলে আমাকে জানাবেন দয়া করে। তা হলে হয়তো ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ফিরে আসবে আমার।'

'জানাব,' কথা দিল লিমা।

হিল্ডা ক্যান্টোরেক কাস্টমসে ঢুকে যাওয়ায় গাড়ির কাছে ফিরে এলো ওরা, লিমা ড্রাইভিং সিটে উঠবার পর রানা বলল, 'ওরা আমাদের খুন করতে পাগল হয়ে উঠেছে, লিমা।'

'ওরা? ...ব্রিম হার্টসেল আর জেসন ট্রেটম্যান?' গাড়ি ছেড়ে দিল লিমা।

'হ্যাঁ। জানি না ক্যান্টোরেকদের কথা ওরা জানল কী করে, তবে জেনেছে কোনওভাবে। আমি জানি ওরা আমাদের অনুসরণ করছে না, কিন্তু যেখানেই আমরা যাচ্ছি, সেখানেই পৌঁছে যাচ্ছে ওরাও। হার্টসেল বা ট্রেটম্যান যে-ধরনের মানুষ, তাতে ফ্রাঞ্জ

ক্যান্টোরেকের পেট থেকে কথা বের করতে অসুবিধে হয়নি বোধহয় ওদের। যা জানা ছিল, তার সবই নিশ্চয়ই বলেছেন ফ্রাঞ্জ ক্যান্টোরেক। হিল্ডা ক্যান্টোরেকের কাছে নেগেটিভ আর ম্যানিফেস্ট ছিল সেটা যদি উনি জেনে থাকেন, তা হলে ওগুলোর অস্তিত্ব এখন ওই দু'জনের কাছেও অজানা নেই। এবার আরও মরিয়া হয়ে উঠবে লোকগুলো। ...আমি ভেবে দেখেছি, অ্যাসপেনে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। ওখানেও আর্টিকেলটা শেষ করতে পারবে তুমি।'

'তুমি কি মনে করছ অ্যাসপেনে আমাদের খুন করতে পারবে না ওরা?' আপত্তির সুরে বলল লিমা, 'চার্লস রবিনসনকে কিন্তু ঠিকই খুন করেছে। এখানে থাকলে এতো লোকের ভিড়ে কিছু করতে সাহস পাবে না হয়তো। ...জার্মানিতে এ-কথা তুমিই বলেছিলে।'

'বলেছিলাম,' স্বীকার করল রানা। 'তখন পাল্টা কিছু করবার উপায় ছিল না আমার। কিন্তু অ্যাসপেনে হাত গুটিয়ে বসে থাকব না আমি।'

'তুমি চাইছ ওরা আমাদের পিছু নিয়ে অ্যাসপেনে যাক, তা-ই না, রানা?'

দ্বিধা কাটিয়ে জবাব দিল রানা, 'চাইছি বললে মিথ্যে বলা হবে না। সাক্ষীদের সবাইকে খুন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা, কাজেই অ্যাসপেনে আমাদের পিছু নিয়ে আসতেই হবে ওদের। আর এবার আমি জানি, ওরা আসছে।'

রানার গম্ভীর চেহারার দিকে তাকাল লিমা, বুঝতে পারল, রানা আন্তরিক ভাবে চাইছে ও অ্যাসপেনে যাক।

নিচু স্বরে বলল লিমা, 'অ্যাসপেনে যেতে আপত্তি নেই আমার। ওখানে আর্টিকেল লেখাটা বরং সহজ হবে। বাইরের কোনও ঝুটঝামেলা থাকবে না।'

ঘড়ি দেখল রানা। 'তা হলে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই

লাগেজ গুছিয়ে ফেলব আমরা। আড়াই ঘণ্টা পর ডেনভারের ফ্লাইট আছে। ওটা ধরতে পারলে আজ বিকেলের শেষ ফ্লাইটে অ্যাসপেনে চলে যেতে পারব।'

একুশ

ডেনভারে পৌঁছাতে দেরি করে ফেলল নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট, ফলে রাতটা ডেনভারের হোটেল রিটয-এ কাটাল রানা ও লিমা।

পরদিন সকালের ফ্লাইটে অ্যাসপেন পৌঁছাল ওরা। এয়ারপোর্ট পার্কিং এরিয়ায় রেখে গিয়েছিল রানা ওর পিকআপ, ওটা নিয়ে ঘুরপথে শহরের দিকে রওনা হলো দু'জন।

কেউ পিছু নিয়েছে কি না বুঝবার জন্য বারবার রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা, ওর মনে হলো না অনুসরণ করা হচ্ছে। শনিবার। ছুটির দিন। রাস্তা প্রায় যানবাহন শূন্য। ভুল হবার কথা নয় ওর।

বাংলোর দিকে না গিয়ে আগে হের হেইঞ্জের বাড়িতে থামল রানা।

দোকান খুলতে রওনা হবেন ডেযমন্ড হেইঞ্জ, এমন সময় রানা ও লিমার সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। ডেন-এ ওদের বসালেন তিনি।

ওদের তদন্তের কতদূর কী অগ্রগতি হলো জানতে ব্যগ্র হয়ে আছেন হের হেইঞ্জ, কিন্তু দুর্লভ বইয়ের এক ডিলারের সঙ্গে একটু পরে মিটিং আছে তাঁর, না গেলেই নয়। রানা ও লিমাকে দাওয়াত দিলেন তিনি রাতে একসঙ্গে ডিনারের, তখন শুনবেন সব।

জানালেন, প্রফেসর ক্লস্টারবার্গকেও আসতে বলবেন।

খুশিমনে তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল রানা ও লিমা।

রানার অনুরোধের জবাবে হের হেইঞ্জ বললেন, 'নিশ্চয়ই রাখতে পারো, রানা। পুরনো আমলের জিনিস তো, আমার সেফটা ভারী মজবুত।'

'কালকে ব্যাঙ্ক খুললেই ওগুলো সেফ ডিপোযিট বক্সে রেখে দেব,' লিমাকে আশ্বস্ত করতে বলল রানা।

কম্বিনেশন লক খুলে নেগেটিভ, ছবি ও ম্যানিফেস্টের কপি তাঁর সিন্দুকে তুলে রাখলেন হের হেইঞ্জ। তাঁকে তাঁর দোকান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ডাক্তার জেঙ্কিন্সের চেম্বারে গেল রানা ও লিমা, ওখান থেকে হান্টারকে নিয়ে ফিরল বাংলোয়।

নিজের বাড়ি ফিরে এসে খুশিতে যেন আত্মহারা হয়ে গেল হান্টার, থপথপ করে হেঁটে প্রতিটা ঘরে গেল, শুঁকে দেখল পরিচিত আসবাবপত্রগুলো। পায়ের প্লাস্টারের কারণে হাঁটতে এখন আর অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ভাব দেখে মনে হলো, প্লাস্টার ও জন্মের সময় সঙ্গে নিয়েই এসেছে। ঘরগুলো রেকি করা হয়ে যাবার পর কিচেন থেকে চামড়ার হাড়টা নিয়ে লিভিংরুমে লিমার পাশে সোফার কোনায় বসল হান্টার, হাড় কামড়ানোর ফাঁকে গরগর করে সন্তুষ্টির আওয়াজ ছাড়ল।

দিনটা কেমন যেন ভেজা ভেজা, এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আনছে শীতের আগমনী বার্তা। আকাশটা ধূসর মেঘে ছেয়ে গেছে, তুষারঝড় হতে পারে বলে মনে হলো ওদের।

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালল রানা। একটু পরে আরামদায়ক হয়ে উঠল ঘরটা। লিগাল প্যাডে আর্টিকেলের খসড়া লিখতে শুরু করল লিমা।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। এরমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে হাওয়ার গতিবেগ। দমকা বাতাসের ধাওয়া খেয়ে উত্তর থেকে ছুটে আসছে কালচে মেঘ, জমছে শহরের মাথার

উপর। তারপর যেন আকাশে ঝর্নার বাঁধ খুলে দিল কেউ, বড় বড় ফোঁটায় শুরু হলো বৃষ্টি, সেইসঙ্গে মাঝারী তুষারপাত। তুষারে ঢেকে সাদা হয়ে গেল জমিন, গাছগুলোর মাথায় জমল তুষার।

বিকেলটা কাটল রানার গল্পের বই পড়ে। সন্ধ্যার দিকে বইটা শেষ হয়ে যাওয়ায় মনোযোগ দিল ও স্কি মেরামত করতে। পছন্দের স্কি জোড়ার পাশগুলো চেঁছে মসৃণ করল, তারপর অ্যাডজাস্ট করল একটার রিলিয বাইন্ডিঙের টেনশন। কাজ শেষ করে লিভিংরুমের দেয়ালে ওটা ঠেস দিয়ে রাখল রানা, অন্যটা তুলে নিতে পাশ ফিরতেই পিছলে পড়ে গেল এইমাত্র দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা স্কিটা। পড়বার সময় বাড়ি খেল সোফার উপর দেয়ালে ঝুলন্ত একটা পেইন্টিঙের গায়ে। ঘুমন্ত হান্টারকে চমকে জাগিয়ে দিয়ে সোফার পিছনে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল ছবিটার কাঁচের ফ্রেম। ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে আওয়াজের উৎস খুঁজল হান্টার, গা শিউরানো কয়েকটা গর্জন ছাড়ল।

'ওফ্, রানা!' বড় করে শ্বাস ছাড়ল লিমা লেখা থেকে চোখ তুলে। 'আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত আমার!'

'দুঃখিত,' বলল লজ্জিত রানা। ঝুঁকে সোফার পিছনে হাত দিয়ে ফ্রেমটা তুলতে চেষ্টা করল ও, তারপর থমকে গেল হঠাৎ। ফ্রেমের তারের পিছনে ছোট্ট কম্প্যাক্ট ডিস্কের মতো চ্যাপ্টা জিনিসটা চিনতে দেরি হলো না ওর। এ জিনিসের ছবি দেখেছে ও কোথাও না কোথাও। অস্ফুট একটা গালি বেরিয়ে গেল রানার মুখ থেকে।

'হাত কেটে ফেলেছ?' প্যাড থেকে চোখ তুলে উদ্বিগ্ন চোখে রানার দিকে তাকাল লিমা।

ডিস্কটা ফ্রেম থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'আঙুলে ধরে লিমাকে দেখাল রানা। মুখটা থমথম করছে ওর। 'ট্র্যান্সমিটার! ট্র্যান্সমিটার প্ল্যান্ট করে রেখে গিয়েছিল ওরা আমার বাংলোয়! হয়তো প্রথম থেকেই! তোমার অ্যাপার্টমেন্ট, মিউনিখের সেই হোটেলের

সুইটে...' দ্রুত পায়ে লিমার বেডরুমে চলে গেল ও, ফিরে এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ওর হাতে লিমার ভ্যানিটি ব্যাগ। চেইন খুলে ব্যাগের ভিতরটা ঘাঁটতে শুরু করল রানা লিমার অনুমতির তোয়াক্কা না করে।

'কী খুঁজছ, রানা?' রানা কী খুঁজছে উপলব্ধি করে চোখ বড় বড় হয়ে গেল লিমার। কাঁপা স্বরে বলল, 'রানা! ওরা তা হলে আমাদের সমস্ত কথা শুনেছে! ...আর, তারপর খুন করেছে...'

জবাব দিল না রানা, লিমার ব্যাগের তলার দিকে টেপ দিয়ে আঁটা ডিস্কটা পাবার পর আরও গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ। ব্যাগটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে টেলিফোনের কাছে চলে গেল রানা দ্রুত পায়ে, ঘড়ি দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বিকেল পাঁচটা বাজে। হের হেইঞ্জ এখনও দোকানেই থাকবেন। দোকানের নম্বরে ডায়াল করে অপেক্ষায় থাকল ও, অজান্তেই শ্বাস আটকে ফেলেছে।

'অ্যাসপেন বুকস্টোর,' একটা নারীকণ্ঠ বলে উঠল।

জ্যানেটের গলা চিনতে পারল রানা, মেয়েটা হের হেইঞ্জের বইয়ের দোকানে পার্ট-টাইম চাকরি করে।

'আমি মাসুদ রানা; হের হেইঞ্জকে দরকার—জরুরি,' তাগাদার সুরে বলল রানা।

'উনি তো এইমাত্র বেরিয়ে...

আর শুনল না রানা, ফোনটা খটাস করে রেখে দিয়ে বেডরুমে ছিটকে ঢুকে খাটের পাশে বসল, খাটের স্প্রিঙের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো পিস্তলটা হ্যাঁচকা টানে খুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে সাত সেকেন্ড পেরোনোর আগেই চলে গেল লিভিংরুমের দরজায়।

এক ঝটকায় দরজা খুলে দৌড়ে গিয়ে উঠল ও পিকআপের ড্রাইভিং সিটে, মেঝেতে অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে রওনা হয়ে গেল ঢালু ড্রাইভওয়ে ধরে। দরজা আপনাআপনি বন্ধ হবার আগেই ছুটে বেরিয়ে এসে পিকআপের পিছনে লাফিয়ে উঠে বসল হান্টার।

ইতিমধ্যে চার ইঞ্চির বেশি তুষারপাত হয়েছে। মাথা গরম করে টপ স্পিডে শহর পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে দু'বার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েও একটুর জন্য দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচল রানা।

ও জানে, সবসময় দোকান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরেন হের হেইঞ্জ। ওর যদি দেরি না হয়ে যায়, তা হলে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে পথেই ধরতে পারবে ও। তা-ই দরকার। হের হেইঞ্জের বাড়ি এখন মরণ-ফাঁদ। নেগেটিভ, ছবি আর ম্যানিফেস্টের খোঁজে যে-কোনও সময় ওখানে হাজির হবে জেসন ট্রটম্যান আর ব্রিম হার্টসেল। হের হেইঞ্জ যদি তাদের সামনে পড়ে যান...

দু'চাকার উপর ভর দিয়ে পোস্ট অফিসের কোনা ঘুরল রানার পিকআপ।

আরেকটা চিন্তা মনে আসায় বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল রানার: লিমা একা রয়ে গেছে বাংলোয়! ব্রিম হার্টসেল আর জেসন ট্রটম্যান যদি একসঙ্গে অপারেট না করে? যদি দু'জন আলাদা ভাবে হের হেইঞ্জ আর ওর বাংলোয় যায়?

একটা একটা করে কাজ করতে হবে, নিজেকে শান্ত করতে চাইল রানা। হের হেইঞ্জের বাড়ি কাছে। তাঁকে সরিয়ে নেয়া দরকার আগে।

পিকআপের গতি না কমিয়েই শহরের পশ্চিম দিকে ছুটে চলল রানা। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করেও রেখে দিল আবার। তুষার-ঝড় আর বৃষ্টির কারণে নেটওয়ার্ক নেই একটুও।

লাইব্রেরির পাশ দিয়ে একাকী একটা ছায়ামূর্তিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে বুঝল, হের হেইঞ্জ ছাড়া আর কেউ নন উনি। ছায়ামূর্তির পাশে কড়া ব্রেক কষে পিকআপ থামাল ও, পথ আটকে দাঁড়াল লাফ দিয়ে নেমে।

চমকে গেলেন ডেযমন্ড হেইঞ্জ, হয়তো ভেবেছিলেন ছিনতাই বা ওধরনের কিছু ঘটবে, তারপর রানাকে চিনতে পেরে মৃদু হাসলেন। 'একা যে, রানা? মিস সোরেনসন কোথায়? এতো

তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আপনার এখন বাড়ি ফেরা চলবে না,' সরাসরি বলল রানা। 'ব্যাখ্যা করে বলবার সময় নেই। আপনার বাড়ির চাবিটা দিন। দোকানে অপেক্ষা করবেন। ওখানে ফোন দেব আমি পরে।'

'কিন্তু...' কোটের পকেটে হাত ভরে চাবি হাতড়ালেন হের হেইঞ্জ, বুঝতে পারছেন, কারণ ছাড়া এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করবে না রানার মতো দায়িত্বশীল যুবক। চাবিটা বের করে বাড়িয়ে দিলেন। '...কী ব্যাপার, রানা?'

'পরে জানাব,' চাবিটা হের হেইঞ্জের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে লাফ দিয়ে পিকআপে উঠল রানা।

বিস্মিত ডেযমন্ড হেইঞ্জকে পিছনে ফেলে পশ্চিমদিকে ছুটল পিকআপ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন হের হেইঞ্জ, 'আশ্চর্য!' ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে ফিরে চললেন তাঁর দোকানের দিকে, তারপর থেমে দাঁড়ালেন কী ভেবে।

বাইশ

ডেযমন্ড হেইঞ্জের শখের উইংব্যাক লেদার চেয়ারে হেলান দিয়ে ডেন-এর কোনায় বসে আছে ব্রিম হার্টসেল, প্যানেল ঘেরা চমৎকার ঘরটায় কেউ ঢুকলে হঠাৎ করে দেখতে পাবে না তাকে। .৩৮ অটোমেটিকটা রেখেছে কোলের উপর। বেশ কিছুক্ষণ হলো অপেক্ষা করছে সে, তবে বিরক্তি বোধ করছে না—আসবে, শিকার নিজেই আসবে, জানে সে। এন্ট্রান্স হল থেকে দরজা খুলবার

অতিমৃদু শব্দটা কানে আসতেই নিঃশব্দে চওড়া হেসে অস্ত্রটা তুলে নিল হাতে।

হঠাৎ করেই যেন গতি কমে গেল সময়ের। দেয়াল-ঘড়ি টিকটিক আওয়াজ করছে, কিন্তু মিনিট পার হচ্ছে না।

বাড়ির কোথাও আর কোনও শব্দ নেই।

রানাকে ওয়ালথার হাতে ধীর পায়ে ডেনে ঢুকতে দেখল হার্টসেল, পিস্তলটা সঙ্গে সঙ্গে তাক করল মাথা বরাবর।

চোখের কোণে নড়াচড়া দেখেও পিছিয়ে যেতে পারল না রানা। আগেও এ-ঘরে অনেকবার এসেছে বলে বুঝতে পারছে, অস্ত্রটার লাইন অভ ফায়ার থেকে এখন আর সরে যাওয়া সম্ভব নয়, হাত ঘুরিয়ে ডেনের কোনায় গুলি করতে চাইলেও লাভ হবে না। এতো কাছ থেকে গুলি ফস্কাবে না চেয়ারে বসা লোকটার।

'এসো, মিস্টার রানা, এসো,' নরম গলায় ডাকল হার্টসেল। 'পিস্তলটা মেঝেতে ফেলে মাথার উপর হাত দুটো তুলে ফেলো তো, প্লিয।'

মেঝের পুরু কার্পেটে পড়ে ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে ঘরের মাঝখানে স্থির হলো রানার ওয়ালথার।

'...বাহ্, লক্ষ্মী ছেলে দেখছি! ...এবার ঘরের ওদিকের ওই চেয়ারটায় বসো দেখি! জানতাম তুমি আসবে।' চট্ করে ঘড়ি দেখল সে। পনেরো মিনিট হলো ট্রেটি তাকে সাবধান করে দিয়েছে, বাংলোর লিভিংরুমে প্লান্ট করা ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজে পেয়ে গেছে মাসুদ রানা। 'মনে হয় বুড়োটার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছে তোমার?'

পিস্তলটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ারে বসল রানা, প্রশ্নটার জবাব দিল না।

'ভুলেও ভেবো না ওখান থেকে লাফ দিয়ে পিস্তল তুলে নিতে পারবে,' টিটকারির হাসি হাসল হার্টসেল। 'যখন টপ পারফর্মেন্স ছিল তোমার, তখনও পারতে না। ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার

দু'চোখের মাঝখানে গুলি বিঁধবে।' মাথা সামান্য ঘুরিয়ে চোখের ইশারা করল হার্টসেল। 'ওটা একটা সেফ হলো?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল রানা। হের হেইঞ্জের সিন্দুক ঢেকে রাখা অয়েল পেইন্টিংটা মেঝেতে পড়ে আছে। ওয়াল সেফের লোহার ডালাটা এখন খোলা। ভিতরে কিছু নেই।

'কী লাভ হলো, মাসুদ রানা? সমস্ত প্রমাণ এখন আমার কাছে। এত দৌড়ঝাঁপ করে তুমি কী পেলে? ফক্কা! মাঝখান থেকে তোমার খাটাখাটনি তো সার হলোই, একটু পর আবার জানটাও যাবে।'

হার্টসেলের চোখে তাকাল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'প্রমাণ সংগ্রহ করা কখনোই আমার প্রায়োরিটি ছিল না।'

ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ল হার্টসেল, চুকচুক আওয়াজ করল জিভ দিয়ে। 'তোমার ওই হিপ্পি দোস্ত? ওটাই তোমার প্রায়োরিটি? সত্যিই দুঃখিত, রানা, আমাদের সামনে আর কোনও উপায় ছিল না। ...ঠিক যেমন লিমা সোরেনসন আর তোমার ব্যাপারেও করার কিছুই নেই আমাদের।'

'জার্মানির ফারস্টেনব্রাকফেল্ডে বৃদ্ধা ফ্রাউ হিমেলস্টোস আর অয়েস্টার বে'তে হের ক্যান্টোরেকের বেলাতেও ওই একই কথা বলবে নিশ্চয়ই?' চেয়ারে একটু কাত হয়ে বসল রানা, পায়ের পাতা দুটো ঢুকিয়ে দিল চেয়ারের সামনে পা রাখবার অটোম্যান টুলের নীচে।

'যা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি আমরা, মাসুদ রানা,' গম্ভীর হয়ে গেল ব্রিম হার্টসেল। 'সাক্ষীদের শেষ করতে হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার খাতিরে। পল হাইনরিখের জায়গাটা আমরাই নেব ঠিক করেছি।'

টুলের নীচে আরেকটু সেঁধিয়ে দিল রানা ওর পা দুটো। টুল ছুঁড়েই সরে যেতে হবে ওকে, যদি হার্টসেলকে চমকে দিতে পারে,

বাঁচবার একটা সুযোগ পাবে হয়তো, নইলে—এমনিতেই শেষ হয়ে আসছে ওর সময়।

ডেনের দরজায় হঠাৎ করে ডেয়মন্ড হেইঞ্জকে দেখে ব্রিম হার্টসেলের চেয়ে কম চমকাল না রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দরজায় থমকে দাঁড়ালেন হের হেইঞ্জ, ভয়ে মুখটা ফ্যাকাসে, কিন্তু লম্বা নলওয়ালা লুগারটা তুলতে শুরু করলেন হার্টসেলের দিকে।

বিদ্যুৎ-গতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাল হার্টসেল ও মাসুদ রানা। রানার দিক থেকে পিস্তলটা সরিয়েই হার্টসেল গুলি করল হের হেইঞ্জের বুক লক্ষ্য করে। তার আগেই দুই পায়ের সাহায্যে টুলটা ছুঁড়ল রানা হার্টসেলের দিকে। টুলটাকে উড়ে আসতে দেখে সামান্য হলেও মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো হার্টসেলের, কিন্তু তার পরেও গুলি লাগল হের হেইঞ্জের গায়ে। হের হেইঞ্জ মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত টুল এড়িয়ে রানার দিকে পিস্তলটা তাক করতে চেষ্টা করল আততায়ী।

রানা ততক্ষণে ঝাঁপ দিয়েছে কার্পেটে পড়ে থাকা ওয়ালথার লক্ষ্য করে। তাড়াহুড়ো করে গুলি করল হার্টসেল। তার প্রথম গুলিটা চেয়ার ফুটো করে দেয়ালে গাঁথল, দ্বিতীয়টা বিঁধল কার্পেটে।

কার্পেট থেকে ছোঁ দিয়ে ওয়ালথার তুলে নিয়ে এক গড়ান দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ওর হাতে ওয়ালথারটাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল হার্টসেলের, ছোট ঘরটায় শুনতে পেল ওয়ালথারের ভরাট হুঙ্কার, তারপর ঝটকা খেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ল খুনি।

হার্টসেলের বাম চোখ দিয়ে ঢুকেছে .৩৮ বুলেট, মগজ ছিন্নভিন্ন করে খুলির পিছনে পিরিচের মতো একটা করোটির টুকরো নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালে বিঁধেছে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে হার্টসেল। তার অক্ষত ডান চোখটা নিষ্পলক তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

লাশটা দ্বিতীয়বার না দেখে হের হেইঞ্জের পাশে পৌঁছে গেল রানা।

বামহাতে ডান কাঁধ শক্ত করে ধরে রেখেছেন হের হেইঞ্জ, রক্ত গড়াচ্ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। ককাচ্ছেন, কতটা ব্যথায় আর কতটা ভয়ে, তা বলা মুশকিল।

সাবধানে, কিন্তু দ্রুত হাতে তাঁর কোট খুলে ফেলল রানা, শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতটা দেখল।

'আমি কি মারা যাচ্ছি?' কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন হের হেইঞ্জ।

'কিচ্ছু হয়নি আপনার, মাংসে সিকি ইঞ্চি আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট,' ভদ্রলোককে টেনে বসিয়ে চেরা জায়গা রুমাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধল রানা, তারপর তাঁর পিস্তলটা তুলে নিয়ে দেখল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিনটেজ মডেলের লুগার, চেম্বারে গুলি নেই, তার চেয়েও বড় কথা, ওটাতে ম্যাগাযিনও নেই!

'গুলি ছিল না?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইলেন হের হেইঞ্জ।

'না!'

'ওই লোক তো আর তা জানত না!' হাসতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ।

'ভাগ্যিস!' উইংব্যাক চেয়ারের সামনে চলে গেল রানা, সার্চ করল মৃতদেহটা। নেগেটিভ, ছবি ও ম্যানিফেস্ট বের করে নিল হার্টসেলের জ্যাকেটের পকেট থেকে, রেখে দিল নিজের জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে। দ্রুত হেঁটে গেল ফোনের দিকে।

হের হেইঞ্জ বললেন, 'দোকানে ফিরে যেতে গিয়েও মনে হলো বিপদে পড়তে পারো তুমি, তা-ই সিদ্ধান্ত বদলে চলে এলাম। তারপর এসে গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তোষকের তলা থেকে পিস্তলটা নিয়ে ডেনে ঢুকে দেখি...' ব্যথায় মুখ কুঁচকালেন হের হেইঞ্জ।

'বাংলোয় একটা কল দিয়েই হাসপাতালে ফোন করে

অ্যাম্বুলেন্স আনতে বলছি, ওরা নিয়ে যাবে আপনাকে,' রিসিভার তুলে বাংলোর নম্বরে ডায়াল করল রানা। 'একটা অনুরোধ, পুলিশকে বলবেন আপনার বাড়িতে ডাকাতি করতে এসে আমার সঙ্গে গোলাগুলিতে মরেছে লোকটা।'

'বলব, চিন্তা কোরো না।'

রানা টের পেল, পাঁজরে ধুপধাপ বাড়ি খাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। শুকিয়ে গেছে গলার ভিতরটা। বাংলোর লাইনটা ডেড! হের হেইঞ্জের দিকে তাকাল রানা। 'হের হেইঞ্জ, আমার বাংলোয় যখন তখন হামলা হতে পারে লিমার ওপর। অ্যাম্বুলেন্স আসা পর্যন্ত...'

'তোমার থাকার কোনও দরকার নেই, মাই ডিয়ার সান,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিলেন হের হেইঞ্জ। 'দেরি না করে এক্ষুনি ছুট দাও তুমি। এরা লোক ভাল না। বিরাট বিপদে আছে মিস সোরেনসন!'

হাসপাতালে ফোন করল রানা, হের হেইঞ্জের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেই দৌড়ে বের হলো বাড়িটা থেকে, পিকআপ নিয়ে বাংলোর দিকে রওনা হয়ে গেল আর এক মুহূর্ত দেরি না করে। শহরে আসবার সময় বাঁকগুলোতে পিকআপের গতি কমায়নি ও, ফিরে যাবার সময়েও কমাল না।

গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে পড়ায় কুঁইকুঁই শব্দে প্রতিবাদ জানাল হান্টার।

ফায়ারপ্লেসের আগুনটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে, আগুনে আরেকটা লগ দিয়ে আবার জানালার কাছে ফিরে গেল লিমা। বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে তুষারের কণা, মিহি তুলোর মতো ভেসে যাচ্ছে স্প্রুস ও পাইনের মাঝ দিয়ে।

কখন পিছনে কিচেনের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল, টের পেল না ও।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটানা হেঁটে আসায় হাঁপাচ্ছে জেসন

ট্রটম্যান, ওই হাঁপানির আওয়াজ পেয়ে চমকে ঘুরে তাকাল লিমা, তুষার জড়ানো বেঁটে লোকটাকে দেখে রাগ হওয়ায় বিরক্ত স্বরে বলল, 'আপনি কি সবসময় নক না করেই অন্যের বাড়িতে ঢোকেন? মিস্টার রানা বাইরে গেছেন, বাড়িতে আমি একা। আপনি পরে আসুন।'

'আমি জানি মাসুদ রানা বাইরে গেছে, আর... তুমি একা!' পার্কার হুড থেকে তুষার ঝাড়ল ট্রটম্যান।

'...কী চাই আপনার?' অজানা আশঙ্কায় গলাটা কেঁপে গেল লিমার। লোকটা কথা বলার সময় দেখে নিয়েছে, উপরের সারির দুটো দাঁত নেই ওর। এ নিশ্চয়ই সেই লোকটা, রানার লাথি খেয়ে যে খুইয়েছিল দুটো দাঁত।

'কী চাই?' খলখল করে হেসে উঠল খুনি বামন, 'বলছি। তার আগে আমার নামটা বলি? ...আমার নাম জেসন ট্রটম্যান।'

আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। রানা বা হান্টার, কেউ নেই যে সাহায্য করবে। একা অসহায় অবস্থায় ও কী ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি হতে চলেছে বুঝতে পেরে ধক করে উঠল লিমার বুক, মনে হলো মাথাটা ঘুরছে বনবন করে। ভয়ের কাঁপন শুরু হয়ে গেল দেহে। মন চাইল, ফায়ারপ্লেসের কাছে ছুটে গিয়ে পোকারটা তুলে নেয়, কিন্তু সাড়া দিল না শরীর।

পার্কার ভিতরের পকেট থেকে নাককোঁচা রিভলভারটা বের করল জেসন ট্রটম্যান, ওটার ব্যারেল নেড়ে নির্দেশ দিল, 'সোজা বেডরুমে চলো তো, ডার্লিং! খেলব আমরা!'

লিমার মনে হলো, এক্ষুনি জ্ঞান হারাবে। টলে উঠল ও, ফিসফিস করে বলল, 'না! না!'

চওড়া হাসল ট্রটম্যান, নিচু স্বরে টেনে টেনে বলল, 'কাজটা সহজে সারতে দাও, নইলে কিন্তু... রেগে গেলে আবার ভাল-মন্দের হুঁশ থাকে না আমার। ...বেডরুম!'

ঝড়ো হাওয়ায় শিহরিত বাঁশ পাতার মতো থরথর করে

কাঁপতে শুরু করল লিমা ভয়ে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ। বিড়বিড় করে বলল, 'প্লিয! প্লিয!'

নোংরা, বিকৃত হাসি খেলে গেল জেসন ট্রটম্যানের ঠোঁটে। 'গুড! তুমি যখন কাতর হয়ে পড়ো, তখন দারুণ লাগে আমার! আবারও *প্লিয* বলো তো, ডার্লিং!' *প্লিয, ট্রটি* বলো!'

চুপ করে থাকল লিমা।

কর্কশ স্বরে ধমক দিল ট্রটম্যান এবার, 'বেডরুমে, শালী! জলদি!'

ট্রটম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখেও পিছু হটতে পারল না লিমা। ওর হাত খামচে ধরে হ্যাঁচকা কয়েক টানে হল-এ নিয়ে গেল ট্রটম্যান, ঠেলে ঢোকাল গেস্টরুমের দরজা দিয়ে। আরেকটা ধাক্কা খেয়ে বিছানার সাদা ধবধবে চাদরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লিমা।

দরজার পাশে চেয়ারে বসল ট্রটম্যান, রিভলভারটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়ে হিসহিস করে বলল, 'যা করতে বলব তা যদি করো, কথা দিচ্ছি, কম কষ্টে তাড়াতাড়ি মরবে। কিন্তু কথা না শুনলে আমার খেলা শেষ হবার আগে হাজারবার ভাববে, মরতে পারলে না কেন। ...কাপড় খোলো!'

হাঁটুমুড়ে উঠে বসল লিমা, শেষ চেষ্টা হিসেবে কাঁপা গলায় বলল, 'রানা এক্ষুনি চলে আসবে। তোমাকে পেলে খুন করে ফেলবে ও।'

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল ট্রটম্যান। 'ওই পিলেয়ার আর কোনদিন আসবে না, ডার্লিং। আমিই তোমার নতুন পিলেয়ার। সময়ের অভাব নেই আমার। তিরিশ সেকেন্ড সময় দিলাম, কাপড় খোলো!'

'না!' রানা মারা গেছে ভেবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল লিমা। সামান্য আশার আলোও দেখতে পেল না আর। 'না!'

'চুপ!' ধমকে উঠল ট্রটম্যান। ঠোঁটের দু'কোণ বেয়ে লালা

গড়াল তার। 'রানা যা পেয়েছিল, আমিও তা-ই চাই। ওই একই আওয়াজ বেরোতে হবে গলা দিয়ে। বারবার বাজিয়ে শুনেছি আমি টেপগুলো, আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেডরুমের খোলা দরজাটার দিকে একবার তাকাল লিমা, তারপর লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমেই তীরের মতো ছুটল দরজা লক্ষ্য করে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল না ট্রটম্যান, শিকার পাশ কাটাচ্ছে দেখে বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে ডান কব্জিটা ধরে ফেলল, উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে লিমাকে ঘুরিয়েই টেনে চড় মারল গালে। বেঁটে, মোটা পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেল লিমার কোমল ত্বকে।

নারীকণ্ঠের অস্ফুট কাতরোক্তি উত্তেজিত করে তুলল ট্রটম্যানকে, আরও কয়েকটা চড় মারল সে আওয়াজটা শুনতে, তারপর শিকার এলিয়ে পড়েছে দেখে হুঁশ হলো তার। শিথিল দেহটা দু'হাতে ধরে ঝাঁকি দিল বার কয়েক। জিভ দিয়ে পুরু দু'ঠোঁট চেটে বিড়বিড় করে বলল, 'পালাবি? তা হবে না!'

অচেতন লিমাকে বিছানায় নিয়ে চিত করে শুইয়ে দিল সে, টেনে ছিঁড়ে ফেলল ম্যাক্সি, তারপর মনোযোগ দিল ব্রেসিয়ার ও প্যান্টির দিকে। গলা দিয়ে বের হচ্ছে সন্তুষ্টির ঘড়ঘড়ে আওয়াজ।

পাইনের আড়ালে আড়ালে বাংলোটা এক চক্কর ঘুরল রানা। ওর বেডরুমে আলো জ্বলছে না, কিন্তু লিমার বেডরুম আলোকিত। জানালার পর্দাগুলো টেনে দেয়া। লিভিংরুম বা কিচেনে নেই কেউ। ঠোঁটে আঙুল রেখে হান্টারকে চুপ থাকবার ইশারা করল রানা, তারপর ছায়ার মতো নিঃশব্দে, চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় চলে এলো কিচেনের দরজার কাছে। তালা মারা নেই দরজায়। নিঃশব্দে গাল বকল রানা। কিচেনের দরজা লক করে রাখে ও।

ওয়ালথার হাতে দরজা খুলল রানা, পা রাখল কিচেনে। ওর পিছু নিয়ে ঢুকল হান্টার, নাকটা উঁচু করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে, শ্বাস

নিল ফোঁস ফোঁস করে। গন্ধ পেয়েছে পরিচিত শত্রুর। ওর মাথায় হাত রেখে শান্ত থাকার নির্দেশ দিল রানা।

হল পেরিয়ে লিমার বেডরুমের দরজার পাশে দাঁড়াল রানা, ভিতরের দৃশ্যটা দেখে পিস্তল তাক করেও সিদ্ধান্ত পাল্টে গুঁজে রাখল ওটা কোমরে।

উলঙ্গ করে বেডস্ট্যান্ডের সঙ্গে লিমার হাত-পা বেঁধে সন্তুষ্টির হাসি হাসছে জেসন ট্রেটম্যান। জ্ঞান ফিরে এসেছে লিমার—ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কামোন্মত্ত দানবের দিকে। খাটের পাশে বসে একহাত বুলাচ্ছে গরিলা লিমার শরীরে, মাঝে মাঝে খামচে ধরছে যেখানে-সেখানে। অপর হাতে পোশাক খুলছে নিজের। নগ্ন নারীদেহ পাগল করে তুলেছে ওকে। জ্যাকেট খুলে রেখেছে আগেই, হ্যাঁচকা টানে এবার প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে নামাল ওটা হাঁটু পর্যন্ত, তারপর লাথি দিয়ে ট্রাউযারটা ঘরের কোণে পাঠিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে কামড় দিতে গেল লিমার বুকে।

ঝড়ের গতিতে ঢুকল রানা ঘরে। ছুটন্ত পদশব্দ পেয়েই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ট্রেটম্যান, এক লাফে সিধে হয়ে দাঁড়াল উলঙ্গ গরিলা। রানাকে দেখেই জান্তব গর্জন বেরিয়ে এল ওর গলার ভিতর থেকে। চেয়ারের পিঠে ঝোলানো জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল রিভলভারের জন্য।

ঝাপ্টা মেরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে ট্রেটম্যানের পাঁজরে ঘুসি মারল রানা। পিছিয়ে ঘুসিটা এড়িয়ে গেল ট্রেটম্যান, পরক্ষণেই লাফিয়ে এসে দু'হাতে চেপে ধরল রানার গলা। হাসি-হাসি হয়ে গেল তার চেহারা, সাঁড়াশির মতো আঙুলের চাপ বাড়াল আরও। প্রায় ঝুলছে সে রানার গলা আঁকড়ে ধরে। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'তোকে খালিহাতে খুন করব আমি, শালা!'

শ্বাস আটকে গেল রানার, ওজন সামলাতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল ও। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ভেঙে বসে যাবে ওর শ্বাসনালী!

দু'হাতে ট্রটম্যানের কনুই দুটো ধরে চাপ দিল রানা ভিতর দিকে, একইসঙ্গে ডান হাঁটু তুলে গুঁতো মারল ওর পেটে। মনে হলো রাবারের প্যাডে লেগে ফিরে এলো হাঁটু। কিন্তু কনুই দুটো বেকায়দা ভঙ্গিতে উল্টোদিকে বেঁকে যেতেই প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরে উঠল গরিলা। আর একটু জোরে চাপ দিতেই মট্ করে ভাঙল কনুইয়ের হাড়। এবার এক ঝটকা দিয়ে গলা থেকে হাত সরিয়ে পিছিয়ে গেল রানা একপা।

পিছাল ট্রটম্যানও, হাতের ব্যথা তুচ্ছ করে হাসছে পৈশাচিক হাসি। নিজের উপর পুরো বিশ্বাস আছে, মাসুদ রানাকে তার হাতেই মরতে হবে আজ।

দু'পাও সরতে পারল না শয়তানটা, রানার নিখুঁত লাথি এসে তার চোয়ালের হাড়ের জয়েন্টে লাগল। জোরাল খটাস্ আওয়াজ করে দু'জায়গায় ভেঙে গেল চোয়ালের হাড়। তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল বেঁটে পিশাচ। অশ্রাব্য ভাষায় গাল বকে লাথি মারতে চাইল রানার হাঁটুর বাটি লক্ষ্য করে।

সরে গিয়ে পাশ থেকে ঊরুতে লাথি দিয়ে ট্রটম্যানকে এক পাক ঘুরিয়ে দিল রানা, পরমুহূর্তে ওর পাঁজর বরাবর সর্ব শক্তি দিয়ে মারল ডানহাতী নক-আউট পাঞ্চ। মুটমুট আওয়াজটা শুনতে পেল স্পষ্ট। চিড় ধরেছে বামনের পাঁজরের হাড়ে।

হাঁ হয়ে গেছে লিমা। বিস্ফারিত চোখে দেখছে প্রয়োজনে তার প্রিয় মানুষটা কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

ঘুসির ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ঘাড়ের পাশে কারাতের কোপ খেয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল ট্রটম্যান। উঠবার সময় পেল না, বিদ্যুৎ-গতিতে তার বুকের উপর চড়াও হলো মাসুদ রানা, দুই হাত পিস্টনের মতো চলছে চৌকো মুখটা লক্ষ্য করে। নাকটা থ্যাচ করে গর্তে বসে গেল ট্রটম্যানের, ফিনকি দিয়ে উঠল রক্ত, অন্ধ করে দিল তাকে। বিরাট হাঁ করল সে চিৎকার করতে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারল না, বিষম

খেল রানার বাঁ-হাতি ঘুসিতে ভাঙা আট-দশটা দাঁত গিলতে গিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে তার পেটে কয়েকটা লাথি মারল রানা। প্রতিটা লাথিতে ছিটকে সরে যাচ্ছে লোকটা দু-হাত দূরে। অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে গোল হয়ে গেল ট্রেটম্যান। লোকটার হাতে কুকুরের কামড়ের দাগ দেখতে পেল রানা। পেটে আরেকটা লাথি দিয়ে চেয়ারে ঝোলানো জ্যাকেট থেকে নাকবোঁচা রিভলভারটা বের করে নিল ও, সরে দাঁড়িয়ে ইশারা করল হান্টারকে। ধীর পায়ে ঢুকল হান্টার ঘরের ভিতর।

দেখল, প্রভুর বাঁ হাতের তর্জনী তাক করা রয়েছে কামুক নরপিশাচটার দিকে। ও জানে, এটা খুনের নির্দেশ। এই নির্দেশটা ছোটবেলায় ওকে শিখিয়েছিল হাসি-খুশি সেই মজার মানুষটা। মাঝে মাঝে আসত সে এই বাংলোয়, খেলত ওর সঙ্গে; তবে কখনও কোনও মানুষকে লক্ষ্য করে ওরকম কোনও নির্দেশ দেয়নি। ওর মনিবও দেয়নি কখনও। ...এবার দিয়েছে তো? বুঝতে ভুল হলো কি না সেটা আঙুলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে নিশ্চিত হলো হান্টার, তারপর সন্তুষ্টির একটা গর্জন ছেড়ে পা বাড়াল সামনে। লালচে মাড়ি দেখা গেল ওর, ভয়ঙ্কর দর্শন ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে।

কুকুরটার কথা মনে আছে জেসন ট্রেটম্যানের, ছেঁচড়ে সরে ড্রেসারে পিঠ ঠেকিয়ে বসল সে, দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে দেখল হান্টারকে। ঘৃণা দূর হয়ে হঠাৎ আতঙ্ক ভর করল তার চোখে। বুঝতে পেরেছে কী ঘটতে যাচ্ছে। ভয় জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'মিস্টার রানা! মিস্টার রানা, প্লিয! না!' দাঁত না থাকায় শোনাল: 'মিসা আনা! মিসা আনা, পিয! না!'

'ওয়াচ, হান্টার!' ফিরেও তাকাল না রানা ট্রেটম্যানের দিকে, ঝুঁকে দেখল লিমার মার খাওয়া ফোলা মুখটা, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর চেহারা। রিভলভারটা ওয়ালথারের উল্টোদিকে কোমরে গুঁজে নিয়ে লিমার বাঁধন খুলল রানা, পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিয়ে

পা বাড়াল দরজার দিকে।

'মিসা আনা!' ভাঙা গলায় ডাকল ট্রটম্যান। তীব্র আতঙ্কে ভুলেই গেছে একটু আগে তার আচরণ কী ছিল।

লিমাকে নিজের বেডরুমে শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল রানা। ওর কপালে হালকা একটা চুমো দিয়ে বলল, 'আর কোনও ভয় নেই, লিমা। চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে গেস্ট বেডরুমে ফিরতে দু'মিনিটও সময় নিল না রানা। প্রলম্বিত গর্জন ছাড়ছে হান্টার ঘড়ঘড় করে, ট্রটম্যানের দু'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচাচ্ছে হিংস্র ভঙ্গিতে।

'হান্টার! কিল!' চাবুকের মতো হিসহিস করে উঠল রানার কণ্ঠ।

'মিসা আনা!' দু'হাত জোড় করল ট্রটম্যান, তারপর গালে হান্টারের কামড় বসতেই বিকট এক আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। গালের মাংসে কামড় বসিয়ে দিয়ে শক্তিশালী ঘাড়টা ঝাঁকি দিল হান্টার, ছিঁড়ে আনল একপাশের বেশিরভাগ মাংস।

দু'হাতে মুখ চেপে ধরে গলা-কাটা মুরগির মতো মেঝেতে লাফাতে শুরু করল ট্রটম্যান, বোবা প্রাণীর মতো গোঙাচ্ছে। তার হাতের দিকে মনোযোগ দিল না হান্টার, চোয়াল বসাল ট্রটম্যানের বুকের মাংসে, ঝাঁকি দিয়ে পড়পড় করে ছিঁড়ে আনল পাঁজরের উপরের পেশী। রক্তাক্ত কয়েকটা হাড় দেখতে পেল রানা, কোনও বিকার হলো না ওর ভিতর।

এবার ট্রটম্যানের তলপেটের নরম মাংসে বসে গেল হান্টারের শ্বদন্ত, পাকস্থলীর দেয়াল ছিঁড়ে পেটের ভিতরে নাক ডুবিয়ে দিল হান্টার, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে আনল কয়েক কামড়ে। একই জায়গায় আবার কামড় দিয়ে ইনটেস্টাইনের বড় একটা অংশ টেনে বের করে আনল।

দু'হাতে পেট চেপে ধরল ট্রটম্যান, গলাটা উন্মুক্ত হয়ে গেল

তার। এবার কণ্ঠনালী কামড়ে ধরে এক ঝটকায় মোটা রগটা ছিঁড়ে ফেলল হান্টার।

'স্টপ!' নির্দেশ দিল রানা।

বসে পড়ল হান্টার, রক্তমাখা নাকের উপর দিয়ে তাকাল ওর শিকারের দিকে।

গা গুলানো আওয়াজে রক্ত আর বাতাস বের হচ্ছে ট্রটম্যানের ছেঁড়া কণ্ঠনালী থেকে। রক্তাক্ত শরীরটা ধড়ফড় করল কিছুক্ষণ, তারপর একসময় নিথর হয়ে গেল।

একবারও লাশটার দিকে আর না তাকিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলো রানা। লিমা চোখ মেলতেই ওর পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল। পালস্ দেখল ও। দুর্বল।

লিমার কপালে হাত বুলিয়ে দিল ও, নরম সুরে বলল, 'শুয়ে থাকো, আর কোনও চিন্তা নেই। কোনদিন আর আসবে না ও।'

'কো-কোথায় ও?' অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল লিমা।

'পাশের ঘরে,' লিমার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠতে দেখল রানা, 'ওকে কবর দিতে হবে।'

চোখ বুজল লিমা, বড় করে শ্বাস ফেলল। ফোঁপাল কয়েকবার।

বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা, গ্যারাজ থেকে তারপুলিন, কোদাল নিয়ে গেস্টরুমে ঢুকল আবার। বসে বসে মৃত শত্রুকে পাহারা দিচ্ছে হান্টার। মেঝে পরিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। বড়জোর একঘণ্টা সময় পাবে ও শেরিফ ব্রিকার চলে আসবার আগে।

তুষার পড়ে মাটি ভিজে গেছে আজ সন্ধ্যায়, বাংলোর পিছনের জঙ্গলে কবরের গর্ত খুঁড়তে পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না ওর। তারপর পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে হবে। দেখা করতে হবে বাম হাত কাটা পড়া ওই অপরিচিত যুবকটির সঙ্গে। তবে তার আগে বাকি রয়ে যাওয়া আরও কয়েকটা কাজ সারতে হবে ওকে।

তেইশ

এফবিআই হেডকোয়ার্টার।

চিফ ফ্র্যাঙ্ক ডানহিল-এর অফিসের সামনে সুন্দর করে সাজানো রিসেপশনের আরামদায়ক সোফায় বসে আবারও ব্রিফকেসে টোকা দিয়ে তবলা বাজাতে শুরু করলেন সুইস ক্রেডিট ব্যাঙ্কের অটোয়া শাখার ম্যানেজার আর্নেস্ট লিংগ্‌ল্। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবার পরেও পনেরো মিনিট হলো বসিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে। বিরক্ত বোধ করছেন তিনি, কারণ ছাড়াই রাগ হচ্ছে তাঁর পল হাইনরিখের উপর। লোকটা এধরনের উদ্ভট অনুরোধ করেছে কেন, কে জানে! সকাল থেকে খাটতে হচ্ছে তাঁকে। প্রথমে অতগুলো টাকা ট্র্যান্সফার করে দিতে হলো আমেরিকান চার্টার্ড ব্যাঙ্কে, কোন্ এক হিল্ডা ক্যান্টোরেকের অ্যাকাউন্টে, তারপর এই ঝামেলা। করবারও কিছু নেই, ক্লায়েন্টের সঙ্গে চুক্তি করলে চুক্তির শর্ত পালন করতেই হবে।

'মিস্টার লিংগ্‌ল্,' রিসেপশনিস্টের ডাকে চটকা ভাঙল ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের। 'আপনি ভেতরে যেতে পারেন।'

দরজা খুলে তাঁর অফিসের চেয়ে অনেক দামি আসবাপত্রে সাজানো বিলাসবহুল অফিসটায় ঢুকে মনটা ছোট হয়ে গেল আর্নেস্ট লিংগলের। আড়ষ্ট পায়ে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

ডেস্কের ওপারে কালো সুইভেল চেয়ারে বসা লোকটাকে

বাচ্চা হাতির মতো লাগল তাঁর। শুধু শুঁড়টা নেই। লেজ যদি থাকেও, দেখা যাচ্ছে না।

'গুড ইভনিং, মিস্টার লিংগল,' ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের দিকে চেয়ে মিষ্টি কুমড়োর বিচির মতো হলদেটে দাঁত বের করে হাসলেন এফবিআই চিফ। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে থলথলে হাতে পুরে নিলেন আর্নেস্ট লিংগলের হাত, বারকয়েক ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিয়ে সামনের চেয়ার দেখালেন। 'বসুন, প্লিয।'

'গুড ইভনিং,' গদিমোড়া চামড়ার চেয়ারে বসলেন আর্নেস্ট লিংগল। কাজের মানুষ তিনি, কথা পারতপক্ষে বলেন না, তবে চারপাশে কী ঘটছে খেয়াল করে দেখেন। বসবার পর এফবিআই চিফকে ফোনের পাশে ছোট একটা সুইচ টিপতে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, কথাবার্তা রেকর্ড করা হবে। তাতে কিছু এসে যায় না তাঁর। বে-আইনী কিছু করছেন না তিনি।

'বলুন?' সামনে ঝুঁকে এলেন ফ্র্যাঙ্ক ডানহিল। আশা করছেন বিরাট কোনও আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা জানাবেন সুইস ক্রেডিটের অটোয়া শাখার ম্যানেজার।

'আমাদের একজন ক্লায়েন্ট একটা প্যাকেট রেখেছিলেন আমাদের কাছে,' শুরু করলেন মিস্টার লিংগল, 'তাঁর নির্দেশ ছিল, প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দুই তারিখে তিনি যদি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ না করেন, তা হলে তাঁর সিল করা ওই প্যাকেট এফবিআই চিফের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।' ব্রিফকেস থেকে পেটমোটা পার্সেলটা বের করে টেবিলের উপর রাখলেন আর্নেস্ট লিংগল। 'এবছর অক্টোবরের দুই তারিখে যোগাযোগ করেননি আমাদের ক্লায়েন্ট, কাজেই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পার্সেলটা আপনার হাতে পৌঁছে দিলাম। ...দেখতেই পাচ্ছেন, পার্সেলের সিল ভাঙা হয়নি।'

প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ফ্র্যাঙ্ক ডানহিল। না, ভাঙা হয়নি, সিলগুলো আস্তই আছে। চোখ

তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ক্লায়েন্টটি কে?'

এফবিআই চিফের চোখ থেকে চোখ সরালেন না মিস্টার লিংগল। 'দুঃখিত, তাঁর পরিচয় দেয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। পার্সেল পৌঁছে দিয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ।' চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'অটোয়ায় ফিরে যাচ্ছি আমি পরের ফ্লাইটে, মিস্টার ডানহিল, এতক্ষণ আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার চলে যাবার পর আবার বসলেন ফ্র্যাঙ্ক ডানহিল, প্যাকেট খুলে টেবিলের উপর রাখলেন ভিতরের জিনিস। দু' সেট ছবি দেখে ছবিগুলোর দিকেই মনোযোগ দিলেন আগে। ইউএস আর্মির মার্কিং করা ট্রাকে ক্রেট তুলছে দু'জন লোক। ক্রেটগুলোয় নাৎসি জার্মানির স্বস্তিকা। তিনজনের আলাদা ছবি, বাসস্ট্যান্ডে লকারে রাখছে একটা প্যাকেট। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা অবস্থাতেও তিনজনের আলাদা ছবি আছে। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বেঞ্চের তলায় টেপ দিয়ে কী যেন আটকাচ্ছে একজন। দ্বিতীয় সেট ছবি দেখে চোখ দুটো সামান্য বিস্ফারিত হলো এফবিআই চিফের। এই তিনজনকে ভাল করেই চেনেন তিনি। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। বিশেষ করে ভাল চেনেন লম্বা, অভিজাত চেহারার সিনেটর গ্রুসাককে।

ক্যাসেটগুলো এবার একে একে নেড়েচেড়ে দেখলেন তিনি। ওগুলোর লেবেলে লেখা: জর্জ গ্রুসাকের সঙ্গে আলাপ, জুলাই তিন, উনিশশো পঞ্চান্ন। হ্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের সঙ্গে আলাপ, জুলাই দশ, উনিশশো পঞ্চান্ন। লিউট হ্যামিলটন গেটসবির সঙ্গে আলাপ, জুলাই চোদ্দো, উনিশশো পঞ্চান্ন। অন্য তিনটে ক্যাসেটের লেবেলে লেখা: ফ্রেডারিক গ্রুসাক ও ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলের সঙ্গে আর্থিক বিষয়ে কথোপকথন।

ক্যাসেট সরিয়ে রেখে প্যাকেটে কী আছে তার তিরিশ পৃষ্ঠা

ব্যাপী বর্ণনাটা পড়তে শুরু করলেন এফবিআই চিফ, রীতিমত আগ্রহ বোধ করছেন। যাদের ছবি আছে, তাদের সবার ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পড়তে পড়তে হাসি-হাসি হয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক ডানহিলের চেহারা। দেখতে দেখতে তিরিশ পৃষ্ঠা পড়ে ফেললেন তিনি। এখন তিনি জানেন, অ্যালাইড ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশনের প্রধান তিন পার্টনারের সম্পদের উৎস কী। তারা অস্বীকার করতে পারবে না যে নিজেদের সম্পদের বে-আইনী উৎসের কথা জানে না। ব্ল্যাকমেইলারকে টাকা তারা এমনি এমনি দেয়নি। পুরোটা স্টেটমেন্ট পড়া শেষ করে ভাবলেন, ভারি মজা তো, জাস্টিস স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবি মরে বাঁচলেও সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল চলে এসেছে তাঁর হাতের মুঠোয়। সিনেটর গ্রুসাক তাঁর গদীতে থাকা তো নিশ্চিত করবেই, সেইসঙ্গে দেবে গাদা গাদা টাকা। টাকা দেবে ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসলও। স্যামুয়েল হ্যামিলটন গেটসবির বিধবা স্ত্রীও কি দেবে না?

সবকিছু গুছিয়ে নিজের ব্রিফকেসে ভরলেন তিনি, তারপর তুলে নিলেন ফোনের রিসিভার। সিনেটর গ্রুসাকের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয় না তাঁর... আর, আজকে যে সুরে কথা বলবেন তিনি সিনেটরের সঙ্গে, সে সুরে আগে কখনও কথা বলেননি।

'...ব্রিম হার্টসেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা জানে পুলিশ,' সাবধান করবার সুরে বললেন সিনেটর ফ্রেডারিক গ্রুসাক। 'ওদিকটা সামলাও।'

'পুলিশ কোনও গোলমাল করতে পারবে না,' গ্রুসাকের মাতব্বরী ভঙ্গিতে বিরক্ত হলেও শান্ত স্বরে বললেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, কণ্ঠে দৃঢ়তা থাকল। 'কলোরাডো ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন তদন্ত করছে। অ্যারিযোনার অ্যাটর্নি জেনারেলের

অফিস থেকে ফোন করেছিল আমাকে, জানিয়ে দিয়েছি চরম বেয়াড়াপনা আর বিনা অনুমতিতে ব্যক্তিগত কাজে কর্পোরেশনের এয়ারক্রাফট ব্যবহারের কারণে তিন সপ্তাহ আগেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি হার্টসেলকে। ...পল হাইনরিখ মারা যাবার পর হার্টসেল যে ক'বার আমার অফিসে এসেছে, প্রতিবারই এসেছে অফিস আওয়ারের পর, কাজেই কেউ দেখেনি তাকে। বুঝতেই পারছ, আমার কথার সত্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না।'

বোমা ফাটালেন এবার ফ্রেডারিক গ্রুসাক, 'এফবিআই চিফ ফ্র্যাঙ্ক ডানহিল কিছুক্ষণ আগে ফোন করে হুমকি দিল আমাকে, বলল, পল হাইনরিখের লিখিত স্বীকারোক্তি আছে তার কাছে। সেইসঙ্গে ব্ল্যাকমেইলিঙের টাকা পৌঁছে দেবার সময় তোলা আমাদের ছবি।'

আঁৎকে উঠলেন ব্যারি ক্যাসল, তারপর বললেন, 'কী চায় ও? তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না, এফবিআই এর কুত্তাটাকে কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে বলেছ তুমি?'

একটু কেশে খসখসে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করলেন সিনেটর গ্রুসাক। 'দিইনি কিছু। তুমি কি একাই বুদ্ধি রাখো মনে করো, ব্যারি? ভুলে যাচ্ছ কেন, আমার মাথাতেও সামান্য হলেও ঘিলু আছে, হ্যাঁ?'

'ফ্র্যাঙ্ক ডানহিলের ছবি আছে তোমার কাছে?'

'নিশ্চয়ই!' হাসলেন সিনেটর। 'আমার জর্জ টাউনের বাড়িতে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেছে, অথচ তার ফুর্তি-ফার্তার ফিল্ম থাকবে না? সেরকম মানুষ মাত্র দু'জন আছে, ব্যারি—তুমি আর আমি।'

'কুকুরটা হুমকি দেবার আগে, না পরে জানিয়েছ ওকে ছবির কথা?'

'অবশ্যই পরে। ওর আচরণের পরিবর্তনটা যদি দেখতে! মনে হলো ফোঁস করে জ্বলে ওঠা ম্যাচের কাঠি ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল পানিতে পড়ে।'

'গুড।' একটু থেমে বললেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল, 'তা হলে স্টেলমেট। এই মুহূর্তে ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। তবে ওই স্বীকারোক্তি কপি হওয়ার আগে দখল করতে পারলে কাজ হতো। ...ব্রিম হার্টসেল মারা গেছে। জেসন ট্রটম্যান নিখোঁজ। হার্টসেলকে ছেড়ে নড়ত না বামনটা, কাজেই ধরে নেয়া যায় হার্টসেলের মতো একই পরিণতি হয়েছে তারও।'

ব্যারি ক্যাসল থেমে যাওয়ায় সিনেটর গ্রুসাক বললেন, 'তার মানে, মাসুদ রানা বহাল তবিয়তে আছে। সাংবাদিক মেয়েটাও।'

'কোনও প্রমাণ নেই ওদের হাতে। তোমাকে তো বলেছি, মরবার কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল ব্রিম হার্টসেল, জানিয়েছিল, বুড়ো হাবড়াটার সিন্দুক থেকে সমস্ত প্রমাণ বের করে ফায়ারপ্লেসের আগুনে পুড়িয়েছে সে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ছবি, নেগেটিভ আর ম্যানিফেস্টের কপি। নিজেব কাজ ভাল বুঝত হার্টসেল, কোনও খুঁত রাখত না। ওকে আমি মিস্ করব।

'ওর ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক,' গলায় উদাস একটা সুর ফোটালেন সিনেটর গ্রুসাক। 'কিন্তু কাউকে না কাউকে ঝুঁকি তো নিতেই হবে।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'তুমি ভাবছ মাসুদ রানা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে? আমি বলার পরেও অ্যাসপেনের শেরিফ আটকে রাখেনি কালুয়া হারামজাদাকে। ছেড়ে দিয়েছে নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের ফোন পেয়ে।'

'আমাদের সিআইএ কন্ট্যাক্ট জানিয়েছে স্মৃতি না ফিরলে মাসুদ রানা একটা অচল মাল,' বললেন ব্যারি ক্যাসল। 'সতর্ক থাকা উচিত আমাদের তারপরেও। তোমার লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে পনেরোজন গার্ড পাঠিয়েছি, পৌঁছেছে ওরা?'

বিরক্তি প্রকাশ পেল সিনেটরের কণ্ঠে: 'হ্যাঁ। দু'ঘণ্টা আগে এসেছে। ...তুমি তো জানো আশপাশে লোকজন ঘুরঘুর করলে ভাল লাগে না আমার।'

'সহ্য করো কয়েকটা দিন,' স্কচের গ্লাসে চুমুক দিলেন ব্যারি

ক্যাসল। 'মাসুদ রানার উপর চোখ রাখতে সিআইএ এজেন্ট রোনাভানকে লাগানো হয়েছে। সর্বক্ষণ অনুসরণ করবে ও মাসুদ রানাকে, কী করে, কোথায় যায়, তার রিপোর্ট দেবে আমাদের। মাসুদ রানার হাবভাব দেখি আগে, যদি বুঝি ঢোঁড়া সাপ, তা হলে ভাল, নইলে চিরস্থায়ী কোনও বন্দোবস্ত করে ফেলব।'

'দু'দিন 'পর কেবিন-ক্রুযারটা পাচ্ছি,' প্রসঙ্গ পাল্টালেন সিনেটর। 'যাবে নাকি একচক্কর সাগর-ভ্রমণে?'

হাসলেন ব্যারি উইলহ্যাম ক্যাসল। 'তার মানে ম্যাযাটলানে মাছ ধরব আমরা দু'জন, তারপর আকাপুকোয় তোমার দুর্গে বিশ্রাম?'

'যদি চাও। সাগরে মেয়ে নিয়ে মজা করতে চাইলে পালা করে কেবিন-ক্রুযারটা ব্যবহার করতে পারব আমরা। যা দুটো মেয়ে এনে রেখেছি না ওখানে, দেখলে জিভ দিয়ে পানি ঝরবে তোমার।'

'তা হলে বুধবার পাচ্ছ তোমার নৌকা। আগামী শুক্রবার রওনা হওয়া যাক, কি বলো? ...নাকি বুধবারই রওনা না হলে চলছে না তোমার?'

'তোমার জন্যে না হয় ক'টা দিন দাঁতে দাঁত চেপে পার করলাম।'

'শুক্রবার তা হলে।'

'ঠিক আছে, বিকেলে রওনা দেব।'

শুক্রবার বিকেল। রিচমন্ড বিচ। লস অ্যাঞ্জেলেস।

সোনালী সূর্যটা ঝুলে আছে সাগরের খানিকটা উপরে। ঝিলমিল করছে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি।

সৈকতের এদিকটা ক্রমেই সরু হয়ে গেছে বলে লোকজন তেমন একটা নেই। যারা সার্ফিং করতে করতে এদিকে চলে এসেছিল, তারাও সরে যাচ্ছে সৈকতের মূল অংশে। তবে মায়াবী

চোখের ওই বাঙালি যুবকের মধ্যে নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সুন্দরী সঙ্গিনীর কাঁধে হাত রেখে সাগরের দিকে চেয়ে আছে সে। মাঝে মাঝে দেখছে বামদিকে। ওদিকে রয়েছে বিরাট কোনও বড়লোকের শখের এস্টেট, দুর্গের মতো উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে গত কয়েকদিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে যুবকের। গতরাতে সঙ্গিনী ঘুমিয়ে পড়বার পর মোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে গোপনে, ফিরেছে ঘণ্টা দুয়েক পর। আজকের দিনটা ছুটি কাটাবে বলে ঠিক করেছে, তবে বিকেলের অবসর কাটাতে সঙ্গিনীকে নিয়ে রিচমন্ড বিচে আসেনি সে, অন্য উদ্দেশ্যও আছে তার।

কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল তরুণী, 'চলো, যাওয়া যাক।'

ঘড়ি দেখল যুবক। 'আর একটু থাকি।'

সাগরে ডুবছে রক্তিম সূর্য। দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর।

আট মিনিট পর রাজহংসীর মতো সাদা কেবিন-ক্রুযারটাকে সুনীল সাগরের বুক চিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে দেখল যুবক-যুবতী। সূর্যের দিকে চলেছে যেন রাজকীয় জলযান, ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে চলে গেল আধমাইল দূরে।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা ধাতব বাক্স বের করল যুবক, ওটার মাঝখানের খুদে লাল বোতামটায় চাপ দিল সাগরের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই।

সন্ধ্যার লালচে আলো ছাপিয়ে কেবিন-ক্রুযারের ভিতর থেকে হঠাৎই ঝিলিক দিয়ে উঠল উজ্জ্বল সাদা রশ্মি, তারপর লাফ দিল কেবিন-ক্রুযার, ছিটকে শূন্যে উঠল হাজারো টুকরো হয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর ভোঁতা একটা গর্জন ভেসে এলো তীর পর্যন্ত। ধাতব বাক্সটা সাগরের পানিতে ফেলে দিল যুবক।

ঘুরে তার মায়াবী চোখের দিকে তাকাল সঙ্গিনী, হঠাৎ কী করে যেন বুঝে ফেলেছে—এসে গেছে বিদায়ের ক্ষণ। কাঁপা কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করল, 'আসলে কে তুমি, রানা?'

'আমি জেনেছি, আমি কে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'কিন্তু নিজের পরিচয় জানানোর অধিকার হারিয়েছি আবার। চলো, যাওয়া যাক, লিমা।'

লিমার হাত ধরে গাড়ির দিকে ফিরে চলল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল আত্মভোলা এক তরুণের চেহারা, যে ওকে একাকী দেখে সঙ্গ দেয়া কর্তব্য বলে মনে করত; সঙ্গ পছন্দ করত ওর, প্রয়োজন না থাকলেও টাকা ধার নিত—ফিরিয়ে দেয়ার ছুতোয় আবার ওর কাছে আসতে পারবে বলে। মনে মনে বলল ও, 'চার্লি, এবার হয়তো শান্তি পাবে তোমার আত্মা।'

***

মাসুদ রানা

অখণ্ড অবসর

কাজী আনোয়ার হোসেন

রকি পর্বতমালার কোলে ছোট্ট শহর অ্যাসপেন। ওখানে গত চারমাস ধরে একাকী বাস করছে মায়াবী চোখের এক যুবক, জানে না ও কে। কারা যেন ইঞ্জেকশন দিয়ে স্মৃতি নষ্ট করে দিয়েছে ওর। কে দিল ইঞ্জেকশন? কাঁচাপাকা ভ্রূওয়ালা যে-লোকটা ওর স্বপ্নে দেখা দেয়, সে-ই? নাকি ওই হাতকাটা লোকটা, যে ওর দিকে চেয়ে হাসে, চোখ টেপে? তরুণী সাংবাদিক লিমা সোরেনসনের সঙ্গে পাহাড়ে ক্যাম্পিং করতে গিয়ে একটা লাশ পেল ও। মৃত মানুষটার ক্যামেরা কেস-এ লুকানো কোডটাই যেন কাল হলো ওদের। কোন্ গোক্ষুরের লেজে পা দিয়েছে, জানে না যুবক। নিষ্ঠুর ভাবে পিটিয়ে আহত করা হলো ওকে, খুন হলো ওর বন্ধু পাগলাটে চার্লস রবিনসন, মারাত্মক জখম করা হলো ওর প্রিয় কুকুর হান্টারকে। কেন? কারা করছে এসব? সহ্যের সীমা অতিক্রম করতেই রুখে দাঁড়াল দুঃসাহসী বাঙালি যুবক।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০